শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
সিন্দুক খুললেই চল্লিশ
হারিয়ে যাওয়া ১ নভেলেট ও ৩৯ টাটকা গল্প

সিন্দুক খুললেই চল্লিশ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সিন্দুক খুললেই চল্লিশ

হারিয়ে যাওয়া ১ নভেলেট ও ৩৯ টাটকা গল্প

www.bookspatrabharati.com

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

সংগ্রাহক রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ অরিজিৎ ঘোষ

SINDUK KHULLEI CHOLLISH
1 Novel + 39 Stories
by Shirshendu Mukhopadhyay
Published by PATRA BHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
E-mail patrabharati@gmail.com
visit at www.facebook.com/PatraBharati

ISBN 978-81-8374-537-6

" রা-স্বা "
বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

শ্রী রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
শ্রীমতী শ্রাবন্তী মুখোপাধ্যায়
করকমলেষু

সিন্দুক খুললেই চল্লিশ নামে যে সংকলনটি নিবেদিত হল সেটাও বকলমে হারিয়ে যাওয়া লেখারই কয়েকটি। ছাপা হওয়ার পর নিরুদ্দেশ হয়। নিরুদ্দিষ্টদের ফিরিয়ে আনতে যিনি বদ্ধপরিকর, তিনি বর্ধমানের রঞ্জন মুখুজ্জে। সাধুবাদ তাঁরই প্রাপ্য। উপন্যাসটি আনন্দমেলায় প্রকাশ পেয়েছিল বটে, কিন্তু লেখাটা আমার পছন্দ হয়নি। কী আর করা, সেটাকেও পাঠকের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলাম। গল্পগুলোর মধ্যে অনেকগুলো আমার মনেও ছিলনা। দেখে মনে পড়ল। এত পুরোনো সব লেখা উদ্ধার হওয়ায় আমার তো স্বস্তি হল, কিন্তু পাঠকদের প্রতিক্রিয়া কী হবে, সেটাই ভাবনার বিষয়।

১ ডিসেম্বর ২০১৮

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পত্রভারতী প্রকাশিত বই

হারিয়ে যাওয়া লেখা ১
হারিয়ে যাওয়া লেখা ২
শীর্ষেন্দু ৭৫
এককুড়ি একডজন
মনের অসুখ
ঈগলের চোখ
ভ্রমণ সমগ্র। ভবকুঁড়ের বাইরে-দূরে
ঝুড়ি কুড়ি গল্প
শীর্ষেন্দু। বিন্দু থেকে সিন্ধু
শীর্ষেন্দুর সেরা ১০১
পাঁচটি উপন্যাস
ময়নাগড়ের বৃত্তান্ত
রূপ মারীচ রহস্য
ভৌতিক গল্পসমগ্র

সূচিপত্র

সম্পূর্ণ উপন্যাস

ঘোরপ্যাঁচে প্রাণগোবিন্দ

গল্প

রাজা

বিদ্যে

কথার দাম

কোট

বাজি ও কুকুর

কিছুক্ষণ

পায়রাডাঙায় রাতে

দেখা হবে

আকাশ গঙ্গা

নতুন গ্রহ

পড়শি

বিপিনবাবুর কাণ্ড

বীরেনবাবুর প্রত্যাবর্তন

ওর হবে

সংবর্ধনা

নীল গ্রহের বেঁটে লোকটা

গঙ্গারামের রাগ

গোপেনবাবু

রামলাল আর শ্যামলাল

ভূতনাথের বাড়ি

তরকারির নাম

গোপীনাথ ও চতুর চোর

বলাইবাবু

খেলা

পটলবাবু ও উড়ন্ত চাকি

ফটিকবাবু ও লালমোহন

সেই বুড়ো লোকটা

নবজীবনের আঁচিল

সোনার তাল

জাম্বোর নামডাক

সেয়ানে সেয়ানে

একটি দিন

দুগ্গা

ভগবানের সঙ্গে দেখা

অঙ্ক

দু'নম্বর পুরুত

'সাতপুরার হাট'

গোকুলবাবু

সহজ সরকার

সম্পূর্ণ উপন্যাস

ঘোরপ্যাঁচে প্রাণগোবিন্দ

নমস্কার প্রাণগোবিন্দবাবু। এই অধমের নাম প্রভঞ্জন সূত্রধর। সেই ময়না-মুগবেড়ে থেকে আসছি।'' প্রাণগোবিন্দবাবু তটস্থ হয়ে বললেন, ''তা আসুন, আসুন।''

শীতকালের সকাল সাতটা। ভোরবেলা জম্পেশ কুয়াশা ছিল, এখন কুয়াশা কেটে দক্ষিণের বারান্দায় নরম রোদ এসে পড়েছে। সামনে একটু ছোট বাগানমতো। তাতে শীতকালের গাঁদা, পপি, মোরগ ফুল ফুটে আছে। পোকামাকড়রাও যে যার কাজে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বাগানে ওড়াওড়ি করছে। প্রাণগোবিন্দ-র কুকুর নেই, দু'টো নধর বিড়াল আছে। তারা দু'জন প্রাণগোবিন্দর পায়ের কাছে দিব্যি বসে আলসেমি করছে। এ সময় প্রাণগোবিন্দবাবু চা খান। চায়ের সঙ্গে নোনতা বিস্কুট থাকে। গাঁয়ে খবরের কাগজ আসতে বেশ দেরি হয়। কাগজ আসেনি বলে প্রাণগোবিন্দ বসে-বসে পঞ্জিকা পড়ছিলেন। পঞ্জিকা তাঁর অতি প্রিয় গ্রন্থ। সারা বছর তিনি ফাঁক পেলেই পঞ্জিকা পড়েন। আর পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন দেখে-দেখে জাদু রুমাল বা অত্যাশ্চর্য আতর বা অতি বৃহৎ লাল মুলার কথা ভেবে খুবই অবাক হন। প্রাণগোবিন্দবাবু অবাক হতে খুবই ভালোবাসেন।

প্রভঞ্জন সূত্রধর মধ্যবয়সি। মোটাসোটা মানুষ। গায়ের রং কালোর দিকেই। বাবরি চুল, ভুঁড়ো গোঁফ আর লম্বা জুলপি আছে। পায়ে কেডস আর ফুল মোজা, পরনে খাটো করে পরা ধুতি আর গায়ে একটা সাদা শার্টের উপর কালো আর কুটকুটে চেহারার কোট। বারান্দায় উঠে প্রভঞ্জন একটা বেতের চেয়ার টেনে প্রাণগোবিন্দবাবুর মুখোমুখি বসে বললেন, ''বিচক্ষণ মানুষ দেখলে আমি বড় খুশি হই। কিন্তু মুশকিল কী জানেন, আজকাল বিচক্ষণ মানুষ বিশেষ দেখাই যায় না।''

প্রাণগোবিন্দ কথাটা শুনে খুশিই হলেন। কারণ, তাঁর পরিবারের কেউই তাঁকে বিচক্ষণ বলে মনে করেন না। এমনকী, তাঁর সন্দেহ, তাঁর পোষা দুটো বিড়ালেরও প্রাণগোবিন্দর বুদ্ধিশুদ্ধির উপর বিশেষ আস্থা নেই। তিনি একটু খুশির হাসি হেসে বললেন, ''তা তো বটেই। কিন্তু বিচক্ষণ লোকগুলো কোথায় গেল বলুন তো!''

''আহা, যাবে আর কোথায়? যাওয়ার আগে তো আসাটা দরকার। তাই না? না এলে যাবেই বা কী করে? কথাটা বুঝলেন না? আসলে বিচক্ষণ মানুষ আজকাল আর জন্মাচ্ছেই না। সাতটা গ্রাম ঘুরে হয়তো এক-

আধজন পাবেন।''

প্রাণগোবিন্দবাবু এ কথাতেও বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করে বললেন, ''তা বটে। বিচক্ষণ মানুষের বেশ অভাবই দেখছি। তা একটু চা খাবেন নাকি?''

প্রভঞ্জন মাথা নেড়ে বললেন, ''না মশাই, এখন চা খেয়ে আর খিদেটা নষ্ট করব না। বরং একেবারে জলখাবারের সঙ্গেই চা খাওয়া যাবে।''

প্রাণগোবিন্দর মুখটা একটু শুকিয়ে গেল। কারণ হল, গাঁয়ে এসে বসবাস শুরু করার পর প্রায়ই গাঁয়ের মাতব্বর আর উটকো লোকেরা এসে জুটছে। তাদের আপ্যায়ন করতে গিয়ে প্রাণগোবিন্দর গিন্নি জেরবার। আর লোকেরাও যেন তক্কেতক্কে থাকে। সকাল-বিকেলে প্রাণগোবিন্দের চা বা জলখাবারের সময়ই ''হেঁ: হেঃ'' করতে-করতে এসে হাজির হয়। প্রাণগোবিন্দর গিন্নির ধারণা হয়েছে যে, গাঁয়ের লোকগুলো খুবই ছোঁচা এবং বেহায়া। তাই তিনি এখন কড়া হাতে অতিথি-আপ্যায়ন বন্ধ করেছেন। এক-আধ কাপ চায়ে তেমন আপত্তি করেন না, কিন্তু খাবারের প্লেট সাজিয়ে দেওয়ার পাট তুলে দিয়েছেন।

তাই প্রাণগোন্দিবাবু কাঁচুমাচু হয়ে মাথাটাথা চুলকে খুব লজ্জিত মুখে বললেন, ''ব্যাপারটা কী জানেন, আমি আজকাল জলখাবারটাবার খাই না। ওই কী বলে, একটু ডায়েট কন্ট্রোল করছি আর কী!''

প্রভঞ্জন সূত্রধর এ কথায় একটুও দমে গেলেন না। বরং বেশ প্রসন্ন মুখেই বললেন, ''এই তো বিচক্ষণ লোকের লক্ষণ। মিতাহার মিতাচার না থাকলে কি বুদ্ধি বিবেচনা খোলে? পেট ভার হলে বুদ্ধি নিম্নগামী হয়। প্রাতরাশের দরকারও নেই তেমন। একটু আগে ঘোষপাড়ায় সাতকড়ির বাড়িতে দই-চিঁড়ে, মর্তমান কলা আর পাটালি গুড় দিয়ে ফলার করে এসেছি। বরং একটু বসে কথাবার্তা কই। তারপর একেবারে মধ্যাহ্নভোজনটাই সারা যাবে, কী বলেন?''

মধ্যাহ্নভোজন শুনে প্রাণগোবিন্দবাবুর প্রাণ উড়ে যাওয়ার উপক্রম। স্খলিত হাত থেকে পঞ্জিকাখানা খসে পড়ে গেল। প্রভঞ্জন তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে পঞ্জিকাখানা তুলে ধুলো ঝেড়ে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, ''ওই সাতকড়ির কথাই ধরুন। দিব্যি চোখা-চালাক বিচক্ষণ মানুষ ছিল। বিষয়-সম্পত্তিও করেছে মেলা। কিন্তু এই মাঝবয়সে হঠাৎ নোলা হয়েছে খুব। কেবল খাই-খাই ভাব। সারাদিন কলাটা-মুলোটা তো খাচ্ছেই, তার উপর সকালে চিঁড়ে-দই সাপটে দুপুরে কালিয়া-কোর্মা উড়িয়ে রাতে ফের পোলাও-পায়েস। এখন দেখবেন বেশি খেয়ে-খেয়ে দিন-দিন কেমন ভ্যাবা-গঙ্গারাম হয়ে যাচ্ছে। পেটকে যত বিশ্রাম দেবেন, মাথা তত খোলতাই হবে।''

প্রাণগোবিন্দ জলখাবারের ব্যাপারটা পাশ কাটানোর পর এখন এই মধ্যাহ্নভোজনটা কী করে এড়ানো যায়, সেটা দ্রুত ভাবতে-ভাবতে বললেন, ''তা বটে, তা বটে। বেশি খাওয়া মোটেই ঠিক নয় মশাই। এই তো আজকেই সেই নন্দীগ্রামে আমাদের মধ্যাহ্নভোজনের নেমন্তন্ন। তা তারা বেশ ফলাও আয়োজনও করে রেখেছে। কিন্তু আমি সাফ বলে দিয়েছি, না বাপু, গুরুপাক চলবে না। স্রেফ মাছের ঝোল আর ভাত।''

প্রভঞ্জন যেন ভারি আহ্লাদিত হয়ে উঠলেন এ কথায়। বললেন, ''আমি যত আপনার বিচক্ষণতার পরিচয় পাচ্ছি, ততই মুগ্ধ হচ্ছি। আপনি খুবই আটঘাট বেঁধে কাজ করেন। তবে এও বলি, যখন অন্যের পয়সাতেই ভোজ খাচ্ছেন, তখন একটু সেঁটে না খেলে কি জুত হবে? নন্দীগ্রাম তো আর এক দৌড়ের রাস্তা নয়। পাক্কা সাড়ে তিন ক্রোশ। পথের ধকলেই সব হজম হয়ে যাবে যে! তা সে যাক, আপনার নির্লোভ স্বভাব দেখে ভারি ভালো লাগল। তাহলে এবার কাজের কথাটা বলে ফেলি।''

প্রাণগোবিন্দ উৎসাহিত হয়ে বললেন, ''হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাজের কথাটাই হোক। আমাকে সপরিবার বেলাবেলি সেই নন্দীগ্রামে রওনা হতে হবে তো!''

প্রভঞ্জন মাথা নেড়ে বললেন, ''তা তো বটেই, তবে কিনা সকালবেলায় এতক্ষণ খালি পেটে থাকাটাও আপনার ঠিক হচ্ছে না। উপোস দেওয়ার ফলে আপনার বুদ্ধিতে শান পড়ছে বটে, কিন্তু মাথা ছাড়া অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এতে খুব-একটা খুশি হবে কি? তাদেরও তো কিছু প্রত্যাশা থাকে। নন্দীগ্রাম পৌঁছতে, তা ধরুন,

বেলা একটা-দেড়টা তো হবেই। একটু বেশিই লাগতে পারে। মাঝখানে আবার সরস্বতী নদীর খেয়া পারের ব্যাপার আছে কিনা।''

প্রাণগোবিন্দ যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছেন। কারণ, ভিতরবাড়ি থেকে লুচি ভাজার গন্ধ আসছে, একটু আগে বেগুন ভাজার গন্ধও আসছিল। এখন যদি গিন্নি হুট করে মোক্ষদাকে দিয়ে লুচির থালা পাঠিয়ে দেন, তাহলে প্রভঞ্জনের সামনে ভারি লজ্জায় পড়তে হবে। তাই উদ্বেগের গলায় বললেন, ''তাহলে বরং কিছু একটু মুখে দিয়ে নেবখন। এবার কাজের কথাটা...?''

''হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই যে!'' বলে প্রভঞ্জন সূত্রধর তাঁর কোটের ভিতর দিককার কোনও গুপ্ত পকেটে বেশ গভীরে ডান হাতটা ঢুকিয়ে অতি সাবধানে এক বান্ডিল নোট বের করে এনে সামনের খুদে টেবিলটার উপর রেখে একগাল হেসে বললেন, 'এই হল গৌরীর মুক্তিপণ। পুরো পঞ্চাশ হাজার আছে। গুনে নিন।'

প্রাণগোবিন্দ গোল-গোল চোখে অপার বিস্ময়ে নোটের বান্ডিলটা দেখছিলেন। পাঁচশো-টাকার নোট তিনি ভালোই চেনেন। না গুনেই আন্দাজ করা যায়, বান্ডিলে শতখানেক নোট আছেই। এই সাতসকালে অযাচিত এত টাকা তাঁর বাড়িতে এসে হাজির হওয়ায় প্রথমে কিছুটা অবাক এবং কয়েক সেকেন্ড বাদে বেশ খুশি হয়ে বলে উঠলেন, ''বাঃ বাঃ, এ তো বেশ মোটা টাকাই।''

প্রভঞ্জনও একমত হয়ে বললেন, ''আজ্ঞে, আমারও তাই মত। আমার মক্কেল চরণডাঙার গোকুল বিশ্বাসকেও আমি কথাটা বলেছিলাম। বলেছিলাম, 'গোকুলবাবু, একটা গোরুর জন্য ফস করে পঞ্চাশ হাজার টাকা বের করে দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে? দরাদরি করে দশ-বিশ হাজার টাকা কমানোর চেষ্টা করলে হত না?' শুনে উনি আঁতকে উঠে বললেন, 'বলো কী প্রভঞ্জন! যারা আমার গৌরীকে নিয়ে গিয়েছে তারা কি আর ভালো লোক! দশ-বিশ হাজার কম দিলে তারা হয়তো গাঁইগুঁই করে রাজি হবে, কিন্তু শোধ তোলার জন্য গৌরীকে হয়তো পাঁচন দিয়ে ঘা-কতক বসিয়ে দেবে। কিংবা লেজ মুচড়ে দেবে বা কান মলে দেবে। ও বাবা, গৌরীর কষ্ট আমার মোটেই সহ্য হবে না। সে আমার মেয়ের মতো। তার কষ্টের কাছে পঞ্চাশ হাজার কিছু নয়।''

শুনে প্রাণগোবিন্দরও চোখ ছলছল করে উঠল। বললেন, ''আহা, গোরুকে তো বড় ভালোবাসেন ভদ্রলোক!''

''খুব, খুব। পরিবারের আর কারও সঙ্গেই গোকুল বিশ্বাসের বনে না। শুধু এই গৌরীর সঙ্গেই তাঁর যত ভাব।''

''আহা, শুনে বড় ভালো লাগল। অবলা জীবের প্রতি মানুষের মায়া-মমতা যত বাড়ে, ততই পৃথিবীর মঙ্গল।''

''আজ্ঞে, সে কথাও ঠিক। আর সেই জন্যই গোকুল বিশ্বাস দরাদরি না করে পুরো মুক্তিপণের টাকাটাই পাঠিয়ে দিয়েছেন। টাকাটা প্রকাশ্যে রাখাটা ঠিক হচ্ছে না মশাই। নোটগুলো পরীক্ষা করে গুনে নিন। তারপর একটু ঢাকাঢুকি দিয়ে রাখুন।''

টাকা গুনতে খুব একটা খারাপ লাগে না প্রাণগোবিন্দবাবুর। সময়টাও ভালোই কাটে। তিনি টাকাগুলো গুনে বললেন, ''নোটগুলো জাল নয় এবং নোট একশোখানাই আছে।'' টাকার বান্ডিলটা র‍্যাপারের তলায় ঢুকিয়ে ফেলে বললেন, ''নাঃ, পঞ্চাশ হাজারই আছে।''

প্রভঞ্জন মাথা নেড়ে বললেন, ''তা আর থাকবে না? গোকুল বিশ্বাস খাঁটি লোক, কথার নড়চড় নেই। তাহলে বরং গোরুটা আনতে বলে দিন। আমাকে গোরু নিয়ে গোকুল বিশ্বাসের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তবে বিষয়কর্মে বেরোতে হবে। সেই রকমই কথা হয়ে আছে কিনা।''

প্রাণগোবিন্দ এবার একটু চিন্তায় পড়ে গেলেন। যতদূর মনে পড়ছে, তাঁদের মোটে দুটো গোরু আছে। একটা কালো আর একটা বাদামি, একটা দুধেল, একটা গাভিন। গোরু বিষয়ে তাঁর জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ।

ওসব তাঁর গিন্নি আর কাজের লোকেরাই সামলায়। গোরুর দাম পঞ্চাশ হাজার কিনা এ বিষয়েও তিনি খুব নিশ্চিত নন।

ঠিক এই সময়ে মোক্ষদা পরদা সরিয়ে লুচি আর বেগুন ভাজার রেকাবিটা নিয়ে বারান্দায় প্রবেশ করায় প্রাণগোবিন্দের মাথায় একটা চমৎকার আইডিয়া খেলে গেল। তিনি ভারি আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন, "নিন, আপনার জলখাবার এসে গিয়েছে।"

প্রভঞ্জন ভারি খুশি হয়ে বললেন, "তাই নাকি? বাঃ, বেশ!" বলেই মোক্ষদার হাত থেকে একরকম কেড়েই নিলেন।

প্রাণগোবিন্দ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললেন, "আপনি বরং খেতে থাকুন, আমি গোরুর ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করে আসছি।"

"যে আজ্ঞে। গোরু না নিয়ে যাচ্ছি না। আপনি ঘুরে আসুন।"

শশব্যস্তে ভিতরবাড়িতে এসে প্রাণগোবিন্দ তাঁর গিন্নি সুরবালাকে জিগ্যেস করলেন, "আমাদের কোন গোরুটার নাম গৌরী বলো তো?"

সুরবালা কুটনো কুটতে বসেছেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, "গৌরী। গৌরী তো আমাদের বড় মেয়ের নাম। ও নাম গোরুকে দিতে যাব কেন?"

"আহা, গৌরী নামে কি আমাদের কোনও গোরু নেই! ওই যে গো, যে গোরুটাকে চরণডাঙার গোকুল বিশ্বাস খুব ভালোবাসে!"

"তোমার কি বুড়ো বয়সে মাথার দোষ হল? কে চরণডাঙার গোকুল বিশ্বাস? সে আমাদের গোরুকে ভালোবাসতে যাবে কোন দুঃখে?"

"আহা, ওসব তুমি বুঝবে না। আমাদের গোরুগুলোর নাম কী সেটা আগে শুনি!"

"একটার নাম রাঙি, আর-একটার নাম কালী। তুমি কেমন লোক বাপু যে, নিজের গোরুর নাম জানো না!"

ঠিক এই সময় মোক্ষদা এসে চোখ বড়-বড় করে বলল, "কর্তামা, দ্যাখোগে, একটা ভালুকের মতো লোক এসে কর্তাবাবার জলখাবারের প্লেট কেড়ে নিয়ে গবগব করে লুচি-বেগুন ভাজা খাচ্ছে। আরও চাইছে।"

"অ্যাঁ!" বলে একটা আর্তনাদ করে বঁটি কাত করে রেখে সুরবালা তেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু জোঁকের মুখে নুন ফেলার কায়দায় প্রাণগোবিন্দ ফস করে র‍্যাপারের তলা থেকে টাকার বান্ডিলটা বের করে গিন্নির নাকের ডগায় ধরে একগাল হেসে বললেন, "বিনি মাগনা খাচ্ছে না গো, বিনি মাগনা খাচ্ছে না, নগদ পঞ্চাশ হাজারটি টাকা গুনে দিয়েছেন।"

সুরবালা হাঁ করে কিছুক্ষণ প্রাণগোবিন্দর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "লুচি-বেগুন ভাজার দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা! তুমি কী সব আবোলতাবোল বকছ বলো তো! এর চেয়ে তো কাবলিওয়ালার ভাষা বোঝা সহজ। কী হয়েছে, একটু গুছিয়ে বলবে?"

প্রাণগোবিন্দর নিজেরও কেমন যেন একটু ধন্দ লাগছে। তিনি ঠিক ব্যাপারগুলো মেলাতে পারছেন না। তাই আমতা-আমতা করে বললেন, "আসলে একজন লোক আমাদের একটা গোরু কিনতে চায়। সে নাকি গোরুটাকে খুব ভালোবাসে। তাই পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে।"

সুরবালা আরও হাঁ! অনেকক্ষণ বাক্যিই বের করতে পারলেন না। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "গোরুর দাম পঞ্চাশ হাজার? ওতে তো হাতি কেনা যায়। কোন চক্করে পড়েছ বলো তো। সাতসকালে গোরু কিনতেই বা লোক এসেছে কেন? আমরা কি গোরু বেচব বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছি! তোমার মতো আহাম্মককে নিয়ে চলা যে কী ঝঞ্ঝাটের কাজ, তা কেবল আমিই জানি। চলো দেখি, কোন মুখপোড়া এসে তোমাকে আগড়মবাগড়ম বোঝাচ্ছে!"

সুরবালা রাগে গরগর করতে-করতে বারান্দায় এসে দেখেন, একটা মোটাসোটা কোট-পরা লোক ভারি তারিয়ে-তারিয়ে শেষ লুচিটা দিয়ে শেষ বেগুন ভাজাটা বাগিয়ে ধরে খাচ্ছে। আরামে চোখ দু'টি নিমীলিত।

সুরবালা বললেন, "আচ্ছা, কী ব্যাপার বলুন তো! আপনি নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে আমাদের একটা গোরু কিনতে চান?"

প্রভঞ্জন স্বপ্নাতুর চোখে সুরবালার দিকে চেয়ে খুব নির্বিকার গলায় বললেন, "মা ঠাকরোন, বাড়তি লুচি আছে কি?"

সুরবালা একটু অবাক হয়ে থতমত খেয়ে বললেন, "আছে। পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

আরও লুচি-বেগুন ভাজা এল। সঙ্গে সুরবালা আর প্রাণগোবিন্দও।

সুরবালা বললেন, "এবার আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন কি? উনি তো কিছুই গুছিয়ে বলতে পারছেন না। আমরা তো গোরু বেচতে চাই না!"

প্রভঞ্জন খেতে-খেতে বললেন, "বিকিকিনির কথা উঠছে কেন মা? গোরু আমার মক্কেলও কিনতে চান না। ওটা হল গোরুর মুক্তিপণ।"

"মুক্তিপণ! আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন, কিছুই যে বুঝতে পারছি না!"

প্রভঞ্জন হাত-মুখ গ্লাসের জলে ধুয়ে রুমালে মুখ মুছে ভারি তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, "এ বাড়ির খাওয়াদাওয়া বেশ উঁচুদরের, কী বলেন মা? তা না হবেই বা কেন? রোজগারটাও উঁচু, নজরও উঁচু। ভারি খুশি হলাম। বিচক্ষণ মানুষ দেখলেই মনটা ভারি নেচে ওঠে। তা মা, কী যেন জানতে চাইছিলেন?"

"বলছি, ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

"আহা, স্বয়ং প্রাণগোবিন্দবাবু থাকতে আমার কাছে শুনবেন কেন? উনিই ব্যাপারটা আরও খোলসা করে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। তবে মা, ওঁর মতো পরিষ্কার মাথা আর দূরদৃষ্টি আমি খুব বেশি দেখিনি।"

সুরবালা অবাক হয়ে বললেন, "ওঁর পরিষ্কার মাথা? দূরদৃষ্টি? বলি আপনার কী ভীমরতি হয়েছে? ওঁর তো ডান-বাঁ জ্ঞানই নেই। এই আহাম্মক মানুষকে নিয়ে জ্বলে-পুড়ে যে খাক হয়ে গেলুম।"

মৃদু হেসে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে প্রভঞ্জন বললেন, "তাহলে মা, বলতেই হবে যে, আপনি ঘর করেও ওঁকে ঠিক চিনতে পারেননি। বড় মাপের প্রতিভাবানদের চট করে চেনাও যায় না কিনা। যাঁকে আপনি আহাম্মক ভাবছেন, তিনি শুধু বিচক্ষণই নন, আটঘাট বেঁধে ঠান্ডা মাথায় এমন পরিপাটি আর নিখুঁত কাজ করেন, যা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এই আমার মক্কেল গোকুল বিশ্বাসের ঘটনাটাই দেখুন না। দিনচারেক আগে তার আদরের গোরু গৌরী মাঠে চরতে গিয়ে উধাও হয়ে যায়। রাখাল ছেলেটা নাকি খোঁটা বেঁধে গাছতলায় ঘুমোচ্ছিল, কিছু টেরই পায়নি। গৌরী নিরুদ্দেশ হওয়ায় গোকুল বিশ্বাস সারা তল্লাট তোলপাড় করে তাকে খুঁজলেন। না পেয়ে রাত্রিবেলা কেঁদে-কেটে শয্যা নিলেন। রাত বারোটায় তাঁর জানালায় টোকা পড়ল। তিনি উঠে জানালা খুল দেখেন, মুখে গামছা বাঁধা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। চাপা গলায় বলল, 'গৌরীকে যদি ফেরত চাও, তাহলে নসিগঞ্জের প্রাণগোবিন্দ রায়ের কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা পৌঁছে দাও। তিন দিন সময় দিচ্ছি।' ব্যস, ওটুকু বলেই লোকটা হাওয়া হয়ে গেল।"

সুরবালা এবং প্রাণগোবিন্দ একসঙ্গেই আর্তনাদ করে উঠলেন, "সর্বনাশ!"

প্রভঞ্জন অবাক হয়ে বললেন, "আচ্ছা, আপনাদের সর্বনাশ হতে যাবে কেন? সর্বনাশ তো হল গোকুল বিশ্বাসের। তা এই ঘটনার পর গোকুল বিশ্বাস আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি হলুম গে তাঁর বাঁধা উকিল। গিয়ে দেখলুম, তিনি খুবই ভেঙে পড়েছেন।"

সুরবালা আর্তনাদ করে উঠলেন, "আপনারা পুলিশে গেলেন না কেন?"

প্রভঞ্জন মৃদু হেসে বললেন, "তাতে লাভ কী বলুন। ওই যে বললুম, বিচক্ষণ মানুষের নিখুঁত পরিকল্পনা থাকে। প্রথম কথা হল, আমাদের পাঁচটা গ্রাম নিয়ে হল নয়নজোড় থানা। থানার বড়বাবু হলেন গিয়ে প্রাণগোবিন্দবাবুর সাক্ষাৎ ভাগনিজামাই। নিজের মামাশ্বশুরের নামে নালিশ কোন দারোগা সহ্য করবে বলুন?

তার উপর কথা হল, প্রমাণ কোথায়? চিরকুট নেই, লিখিত-পড়িত কিছু চুক্তি হয়নি, যে লোকটা খবর দিতে এসেছিল, তার মুখ দেখতে পাওয়া যায়নি। তাই তো বলছি, এরকম বুদ্ধিমান মানুষের কাছে অনেক কিছু শেখার আছে।"

সুরবালা খুবই রেগে গিয়ে বললেন, "কার সম্পর্কে কী বলছেন তা জানেন? উনি আহাম্মক হতে পারেন, বোকাও আছেন একটু, কিন্তু জীবনে কখনও কোনও অসৎ কাজ করেননি। চিরকাল কলেজে সুনামের সঙ্গে পড়িয়েছেন। উনি সকলেরই অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র।"

প্রভঞ্জন ঘনঘন মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, "জানি মা ঠাকরোন, সব জানি। ওঁর সম্পর্কে সব খোঁজখবর নিয়েই এসেছি কিনা। উনি কলেজে দর্শনশাস্ত্র পড়াতেন, ভুলো মনের মানুষ, অতি সজ্জন, এসব সবাই জানে। আমাদের কাছেও উনি খুবই শ্রদ্ধার পাত্র। রিটায়ার করার পর গাঁয়ে এসে নিজের পূর্বপুরুষদের ভিটেতে বসবাস করছেন এতেও আমরা গৌরবই বোধ করি। রিটায়ারের পর যে নিজের মাথাটিকে নানারকম উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় খাটিয়ে যাচ্ছেন, এতেও আমরা বড় খুশি হয়েছি।"

"শুনুন, আপনি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করছেন না। তাহলে আপনি নিজের চোখেই দেখে যান, উনি অন্য কারও গোরু ধরে এনেছেন কিনা! আমি আমাদের রাখাল হলধরকে ডাকছি।"

খবর পেয়ে হলধর তাড়াতাড়ি এসে হাজির হল।

"যাও তো হলধর, এই ভদ্রলোককে নিয়ে গিয়ে আমাদের গোয়ালঘরটা দেখিয়ে নিয়ে এসো। উনি নিজের চোখেই দেখুন, আমাদের গোয়ালে দু'টোর বেশি গোরু আছে কিনা।"

হলধর একটু কাঁচুমাচু হয়ে ঘ্যাঁস-ঘ্যাঁস করে মাথা চুলকোতে-চুলকোতে আমতা-আমতা করে বলল, "মা-ঠান, একটা বড় মুশকিল হয়েছে যে!"

"মুশকিল! মুশকিল আবার কী হল?"

"কাল রাতে যখন গোয়াল বন্ধ করি তখন দুটো গোরুই ছিল বটে। কিন্তু আজ সকালে গোয়াল পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখি, কোথা থেকে একটা তিন নম্বর গোরু এসে গোয়ালে ঢুকে বসে-বসে জাবর কাটছে।"

প্রভঞ্জন সোৎসাহে বলে উঠলেন, "দুধের মতো সাদা ধবধবে গাই তো, বাঁ-দিকের দাবনায় একটা ত্রিশূলের মতো ছোপ আছে!"

হলধর কাহিল মুখ করে বলল, "আজ্ঞে তাই বটে।"

প্রভঞ্জন খুব গ্যালগ্যালে হাসি হেসে সুরবালার দিকে চেয়ে বললেন, "বলেছিলুম কিনা মা ঠাকরোন, আপনার স্বামীর এলেম আপনি জানেন না, জানি এই আমরা বাইরের লোকেরা। উনি নমস্য ব্যক্তি মা, নমস্য ব্যক্তি, কী বুদ্ধি! কী মেধা! কী সাংগঠনিক শক্তি! কী সাহস! এমন সুন্দর সুচারুভাবে কাজ করলেন যে, ওঁর টিকিটিও কেউ ছুঁতে পারবে না। ছাত্র পড়াতেন, নিশ্চয়ই ভালোই পড়াতেন। কিন্তু এই মেধা তো কেবল ছাত্রসমাজে আটকে রাখলে চলে না। এখন জনশিক্ষার কাজেও একে লাগাতে হবে। যাও তো বাপু হলধর, গোরুটা নিয়ে এসো। বেলাবেলি রওনা হয়ে পড়ি।"

সুরবালার মুখে কথা নেই। ধপ করে চেয়ারে বসে চোখ বুঝে রইলেন। ভারি বেকুবের মতো নিজের মাথায় ঘনঘন হাত বুলিয়ে যাচ্ছিলেন প্রাণগোবিন্দ। ঘটনাটা ঠিক তাঁর মাথায় সেঁধোচ্ছে না এখনও।

২

নসিগঞ্জে আজ হাটবার। সরস্বতী নদীর ধারে বিশাল মাঠ জুড়ে হাটখোলা। ভোরবেলা থেকে ভ্যানগাড়ি, গো-গাড়ি, ম্যাটাডোর, নৌকোয় চেপে মাল আর ব্যাপারিরা এসে জড়ো হয়। হইহই ব্যাপার। নসিগঞ্জের হাট খুব বিখ্যাত। পাওয়া যায় না হেন জিনিস নেই। ভালো-মন্দ কিছু কিনতে হলে এই হাটবারের জন্য বসে থাকতে হয়।

হাটবারে ভারি আনন্দ হয় প্রাণগোবিন্দর। প্রথম কথা ভালো-মন্দ জিনিস কিনতে পারেন। গাঁয়ের পাঁচজনের সঙ্গে দেখা হয়। আর শনিবার অর্থাৎ হাটের দিনই বিশমাইল দূরের মহকুমা শহর থেকে তাঁর খুদে দু'টো নাতি-নাতনি দাদু-ঠাকুরমার কাছে দু'দিনের জন্য বেড়াতে আসে। নাতনি পিউয়ের বয়স আট বছর, নাতি পিয়ালের পাঁচ। তাদের মা আর বাবা, অর্থাৎ প্রাণগোবিন্দর বউমা এবং ছেলে দু'জনেই সেখানকার হাসপাতালের ব্যস্ত ডাক্তার। বাচ্চা দু'টো তাই মা-বাবার সঙ্গ পায় না, আয়ার কাছে মানুষ হয়। কাজেই সপ্তাহের এই দুটি ছুটির দিনে দাদু-ঠাকুমার কাছে আসার জন্য তারা ছটফট করে। প্রাণগোবিন্দ আর সুরবালাও তাদের জন্য সারা সপ্তাহ অপেক্ষা করে থাকেন।

অন্য শনিবারের মতোই আজও প্রাণগোবিন্দ হাটে বেরিয়েছেন। সঙ্গে ধামা আর ব্যাগট্যাগ নিয়ে হলধর। কিন্তু আজ প্রাণগোবিন্দর প্রাণে কোনও আনন্দ নেই। থাকার কথাও নয়। সকালবেলার অত্যাশ্চর্য ঘটনাটা এখনও তিনি পরিষ্কার বুঝে উঠতে পারছেন না। প্রভঞ্জন সূত্রধর, গোকুল বিশ্বাস, গৌরী এইসব ব্যাপারগুলো ভারি তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে মাথার মধ্যে। আরও দুশ্চিন্তা হল, পঞ্চাশ হাজার টাকার বান্ডিলটা নিয়ে। প্রভঞ্জনকে যাওয়ার সময় তিনি টাকাটা ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। প্রভঞ্জন হাতজোড় করে বললেন, ''ওটি, পারব না, গোকুল বিশ্বাস একবার যাকে যা দেন, তা কস্মিনকালেও ফেরত নেন না। খুব নীতিবাগীশ মানুষ।''

প্রভঞ্জন চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ চোখ বুজে ঘাড় এলিয়ে চেয়ারে বসেছিলেন সুরবালা। একটাও কথা কননি প্রাণগোবিন্দর সঙ্গে। সুরবালা মূর্ছা গিয়েছেন কিনা তাও বুঝতে পারছিলেন না প্রাণগোবিন্দ। নিজেই যে কেন মূর্ছা যাননি তাও অবাক হয়ে ভাবছিলেন। হঠাৎ সুরবালা চোখ খুলে তাঁর দিকে চেয়ে খুব শান্ত গলায় জিগ্যেস করলেন, ''আচ্ছা, কোন পাপে আমার একজন গোরুচোরের সঙ্গে বিয়ে হল, তা বলতে পার?''

প্রাণগোবিন্দর কানটান অপমানে লাল হয়ে উঠল। কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরোল না।

সুরবালা গলা আরও একটা পরদা নামিয়ে বললেন, ''মানুষকে চেনা যে কী কঠিন, তা আজ ভালো করে বুঝলাম।'' বলে শান্তভাবেই উঠে ভিতরে চলে গেলেন।

মরমে মরে গিয়ে প্রাণগোবিন্দ উঠে ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে রইলেন। শরীরটা বড্ড কাহিল লাগছে। বিছানার পাশেই জানালা। জানালার ওপাশে বারান্দায় বসে ঠিকে কাজের মেয়ে লক্ষ্মী বাটনা বাটছিল। মোক্ষদা এসে তাকে চাপা গলায় বলল, ''ওলো লক্ষ্মী, কর্তাবাবুর কীর্তির কথা শুনেছিস তো!''

লক্ষ্মী আহ্লাদের গলায় বলল, ''ও মা, তা আর শুনিনি। বড় ঘরের বড় কেচ্ছা কাকের মুখে রটে যায়। তবে ভাই, এ কথাও বলি, কর্তাবাবুর যে এত ক্ষ্যামতা তা কখনও বুঝতে পারিনি। দেখে তো মনে হয়, ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না। কিন্তু কী কেরদানিটাই না দেখালেন। ঘরে বসে লাখ টাকা কামাই! আমার কর্তাটি তো সারারাত সিঁধকাঠি নিয়ে ঘুরে দশ-বিশ টাকার বেশি রোজগার করতে পারে না।''

''আর বলিসনি। আমার বাড়ির মানুষটি তো দু'বছর ধরে জেলে ঘানি ঘোরাচ্ছে। আর কর্তাবাবুকে দ্যাখ, এত বড় কাজটা করলেন, গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগল না।''

প্রাণগোবিন্দ রায় কানে হাত চাপা দিয়ে উঠে পড়লেন। এ তো আর সহ্য করা যাচ্ছে না! এসব হচ্ছেটা কী? তিনি জীবনেও কারও সাতে-পাঁচে থাকেননি। চিরকাল বইয়ে মুখ গুঁজে কাটিয়ে দিলেন। অথচ এই বেশ পরিণত বয়সে কোথাকার কে এক প্রভঞ্জন সূত্রধর এসে তাঁকে একেবারে গোরুচোর বানিয়ে ছাড়ল! ঘটনাটা রটে গেলে যে কী বিষম কাণ্ড হবে, তা ভেবে তাঁর হাত-পা হিম হয়ে আসছিল। উত্তেজিতভাবে কিছুক্ষণ ঘরে পায়চারি করলেন। হাত-পা নিশপিশ করছে।

এমন সময় হলধর এসে ভারি বিনীতভাবে বলল, ''কত্তাবাবু, গিন্নিমা তাড়াতাড়ি হাটে যেতে বললেন। এই যে ফর্দ।''

প্রাণগোবিন্দ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। যাক, হাটে গেলে হয়তো পাঁচটা মানুষ দেখে একটু ভালো লাগবে। তাই দেরি না করে বেরিয়ে পড়লেন।

কিন্তু হাটে ঢুকতে যেতেই বিপত্তি। বটতলায় হরকাকার সঙ্গে দেখা। বললেন, "কী হে প্রাণগোবিন্দ, মুখখানা আজ এত ব্যাজার কেন?"

প্রাণগোবিন্দ দুঃখের সঙ্গে বললেন, "মনটা ভালো নেই কাকা।"

"দ্যাখো কাণ্ড! মন ভালো নেই কেন হে। আজ তো তোমারই দিন। ওরে বাপু, ট্যাঁকে টাকা থাকলে মন ভালো না থেকে পারে? যাও তো, বেশ ভালো করে বাজার করো, ভালো-ভালো জিনিস কিনতে থাকো, দেখবে মন ভালো হয়ে যাবে। ফেরার সময় স্যাকরার দোকানে বরং বউমার জন্য একটা গয়নার বায়না করে যেও।"

প্রাণগোবিন্দ সিঁটিয়ে গেলেন। সর্বনাশ! হরকাকাও শুনেছেন নাকি?

ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হয়ে উঠল যখন মাছওয়ালা হরিপদ বলল, "কর্তা, পাঁচশো টাকা কিলোর দেড় কিলো বাগদা চিংড়ি আজ আপনার জন্যই আলাদা করে রেখে দিয়েছি। আর কার ট্যাঁকের এত জোর আছে যে, ওই কুলীন মাছ কিনবে?"

প্রাণগোবিন্দর হাত-পা শিথিল হতে লাগল। মাথা ঝিমঝিম। অপমানে, গ্লানিতে তাঁর ভিতরটা খাক হয়ে যাচ্ছে। চোখে জল আসছে, ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস পড়ছে, গলা ধরে গিয়েছে। এভাবে কি বেঁচে থাকা যায়!

যাই হোক, কোনওক্রমে বাজারটা করলেন। তারপর হলধরকে দিয়ে বাজারের জিনিস রওনা করে দিয়ে বলে দিলেন, "আমার ফিরতে একটু দেরি হবে, বুঝলি! মিষ্টির দোকানটা ঘুরে যাচ্ছি।"

হলধর চলে যাওয়ার পর তিনি একটা দোকানে গিয়ে মজবুত দেখে নাইলনের দড়ি কিনলেন। দোকানদার অবশ্য বেশ হাসিমুখেই গদগদ হয়ে বলল, "একটু বেশি করেই নিয়ে যান। অনেক গোরু বাঁধতে হবে তো!"

প্রাণগোবিন্দ কথাটায় তেমন কান দিলেন না। দড়ির গুছি র‍্যাপারের তলায় আড়াল করে নিয়ে তিনি হাট থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

ময়নার জঙ্গল মাইল দুই তফাতে। একটা জলাজমি পেরিয়ে তারপর জঙ্গল। সেখানে চিতাবাঘ এবং অজগর সাপ আছে বলে শুনেছেন প্রাণগোবিন্দ। জঙ্গলটার আরও কিছু বদনাম আছে। কিন্তু প্রাণগোবিন্দ মনস্থির করে ফেলেছেন, লোকালয় থেকে দূরে, সকলের চোখের আড়ালে আজ তিনি গলায় দড়ি দেবেন। এই বয়সে এই কলঙ্কের বোঝা বয়ে বেঁচে থাকার মানেই হয় না। তাঁর নিজের স্ত্রীই যখন তাঁকে বিশ্বাস করে না, তখন এই অসাড় জীবন রাখার কোনও মানেই হয় না।

শীতকাল বলে হাঁটাহাঁটিতে তেমন কষ্টও হল না। দু'মাইল রাস্তা পেরোতে মিনিট চল্লিশ লাগল। জলাটা শীতকালে শুকিয়ে যায় বলে সেটাও অনায়াসে পেরিয়ে তিনি জঙ্গলে ঢুকে পড়লেন।

ময়নার জঙ্গল বেশ নিবিড় এবং নির্জন। অপদেবতার বাস আছে বলে লোকজন বিশেষ এই জঙ্গলে ঢোকে না। ফলে শুভকাজে বাধা দেওয়ারও কেউ নেই। একটা সুইসাইড নোট লিখে পকেটে রেখে দিলে ভালো হত। কিন্তু এখন কাগজ-কলম জোগাড় করতে গিয়ে সময় নষ্ট করলে মরার ঝোঁকটা ঘুরে যেতে পারে।

জঙ্গলটা প্রাণগোবিন্দর বেশ পছন্দ হয়ে গেল। শীতকালে গাছপালা একটু শুকিয়ে যায়। কিন্তু এই জঙ্গলটায় তেমন হয়নি। কাছে জলাজমি থাকাতেই বোধহয় মাটি বেশ সরস। প্রাণগোবিন্দ জঙ্গলের ভিতরবাগে এগিয়ে যেতে লাগলেন। আগাছা, কাঁটাঝোপ, লতানে গাছ ইত্যাদিতে একটু বাধা পেলেও তিনি দমলেন না। পছন্দমতো একটা গাছ খুঁজে পেলেই হয়। আসলে প্রাণগোবিন্দ জীবনে কখনও গাছেটাছে চড়েননি। কাজেই এমন গাছ চাই যেটাতে অনেক ডালপালা আছে আর সহজেই চড়া যায়। খুব বেশি উঁচু ডালে তিনি উঠতে পারবেন না। ঝুলে পড়ার পক্ষে যতটা দরকার ততটাই উঠবেন। তাই খুব সতর্ক চোখে তিনি তেমন একটা গাছ খুঁজতে লাগলেন।

প্রাণগোবিন্দর কপালটা ভালোই। খুব বেশি খুঁজতেও হল না। জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে মিনিটদশেক এদিক-ওদিক হাঁটার পরই তিনি একেবারে মনের মতো গাছ পেয়ে গেলেন। গাছটার একেবারে নীচু থেকেই শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আছে। হাতের নাগালেই। প্রাণগোবিন্দ র‍্যাপারটা খুলে কোমরে জড়িয়ে নিলেন। দড়ির গুছিটাও ভালো করে কোমরে বেঁধে চটিজোড়া গাছতলায় ছেড়ে গাছটার একটা নিচু ডালে বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই উঠে পড়লেন। ঘোড়সওয়ারের মতো দু'দিকে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে ঊর্ধ্বপানে চেয়ে দেখলেন, ডালপালার ফাঁক দিয়ে গাছটা অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছে। দ্বিতীয় ধাপটা উঠতে তাঁর একটু মেহনত হল। হাত এবং পা দু'টোই হড়কে যাওয়ায় পড়েই যাচ্ছিলেন প্রায়। অতি কষ্টে সামলে নিলেন।

দ্বিতীয় ধাপটায় বসে ঠান্ডা মাথায় একটু চিন্তা করলেন তিনি। এখন খুব তাড়াহুড়ো করার কি দরকার আছে? বরং ধীরে-সুস্থে সাবধানে উঠবার চেষ্টা করাই উচিত। সুতরাং একটু জিরিয়ে নিয়ে তিনি সাবধানে উঠতে লাগলেন। জীবনে এই প্রথম গাছে উঠছেন বলে প্রাণগোবিন্দ বেশ উত্তেজনা বোধ করছেন। মনটায়, এত দুঃখের মধ্যেও, একটা ফুর্তির ভাব হচ্ছে। জীবনে কত অভিজ্ঞতাই বাকি রয়ে গিয়েছে। কেবল বইয়ে মুখ গুঁজেই এতকাল বেঁচে ছিলেন তিনি। জীবনে কোনও অ্যাডভেঞ্চারই করা হয়নি।

উৎসাহের চোটে বেশ অনেকটাই উপরে উঠে পড়লেন প্রাণগোবিন্দ। কতটা উঠেছেন, এতক্ষণ খেয়াল করেননি। হঠাৎ নীচের দিকে চেয়ে মাথাটা বোঁ করে চক্কর দিল তাঁর। বাপ রে! তা প্রায় তিন-চার তলার সমান উঁচুতে উঠে পড়েছেন যে! মাথা ঘুরে ফের হাত ফসকে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি দু'হাতে একটা মোটা ডাল জাপটে ধরে সামলে নিলেন। এখান থেকে পড়লেও হয়তো মৃত্যু হবে, তবে ফিফটি-ফিফটি চান্স। হয়তো মরলেন না, কিন্তু হাত-পা ভেঙে খানিক যন্ত্রণা পেলেন।

আর উপরে না উঠে প্রাণগোবিন্দ কোমরে গোঁজা-দড়িটা একটা মোটা ডালে বেশ ভালো করে বাঁধলেন। অন্য প্রান্তে একটা ফাঁসও তৈরি করে ফেললেন বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায়। আসলে এসব কাজের তো অভ্যেস নেই। জীবনে কখনও দড়ি নিয়ে কসরত করতে হয়নি। ফাঁসটা তৈরি করে যখন টেনেটুনে দেখছেন, তখন কাছেপিঠে হঠাৎ খুকখুক করে যেন একটা চাপা হাসির শব্দ হল।

চমকে উঠে প্রাণগোবিন্দ চারদিকে চাইলেন। এই গহন বনে, গাছের উপরে হাসে কে?

হঠাৎ কে যেন বলে উঠল, ''হয়নি হে, হয়নি। ও কি একটা ফাঁস হল বাপু? ঝুলতে গেলেই যে ফসকা গেরো আলগা হয়ে যাবে।''

প্রাণগোবিন্দ শিউরে উঠে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। দর্শনশাস্ত্রে ভূত বা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। তিনিও মানেন না। কিন্তু না মানলেও ভয় করেন। শব্দটা উপর দিক থেকেই আসছে মনে হল। প্রাণগোবিন্দ খুব ঠাহর করে দেখলেন। ডালপালার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় দেখতে পেলেন, আরও আট-দশ ফুট উপরে গাছের ডালে একজন বুড়ো মানুষ বসে-বসে তাঁকে জুলজুল করে দেখছে। প্রাণগোবিন্দ ভয়ে মূর্ছাই যাচ্ছিলেন, কিন্তু পড়ে যাবেন বলে ভয়ে সেটা সামলে নিলেন। তবে শরীরে রীতিমতো হিমশীতল স্রোত বয়ে যাচ্ছে, হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছে।

কোনওক্রমে কাঁপা গলায় তিনি বললেন, ''আ-আপনি কে? ভূ-ভূত নাকি?''

লোকটা বলল, ''তা ভূতও বলতে পার। এক হিসেবে ভূত ছাড়া আর কী? ভূতপূর্ব তো বটেই। তবে এখনও মরিনি, এটুকুই তফাত।''

''মরেননি! তাহলে কি আপনি জ্যান্ত মানুষ?''

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, ''জ্যান্তই কি আর বলা যায়! তবে আধমরা বলতে পার।''

ঘাবড়ে গেলেও প্রাণগোবিন্দর মনে হচ্ছিল, লোকটা পাগলটাগল হলেও ভূতটুত নয় বোধ হয়। গলাটা এখনও কাঁপছে। তিনি জিগ্যেস করলেন, ''আপনি এখানে কী করছেন?''

''বসে-বসে তোমার কীর্তি দেখছি। তুমি তো নিতান্তই আনাড়ি দেখছি হে। একটা সোজা গাছে উঠতে তিনবার হাত-পা হড়কে পড়ে যাচ্ছিলে! তারপর ফাঁসের দড়িটা যা বাঁধলে, দেখে হেসে বাঁচি না। ওই ফাঁস

গলায় দিয়ে ঝুলবে তো! ঝুললেই গেরো খুলে সোজা নীচে গিয়ে পড়বে ধপাস করে। তাতে অক্কা পেতেও পার, আবার না-ও পেতে পার।''

প্রাণগোবিন্দ এবার একটু ধাতস্থ হলেন। নাঃ, লোকটা আর যাই হোক, প্রেতাত্মাটাত্মা নয়। তিনি গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, ''আহা, এসব কি আর কখনও করেছি নাকি মশাই? অভ্যেস করতে-করতে শিখে যাব।''

লোকটা একটু খিঁচিয়ে উঠে বলল, ''আর শিখছে! শিখে-পড়ে আটঘাট বেঁধে তবে এসব কাজে নামতে হয়। হুট বললেই কি মরা যায় নাকি? দিনক্ষণ দেখতে হয়। তারপর নিজের শ্রাদ্ধশান্তি সব আগাম সেরে নিতে হয়। তারপর শুভদিন দেখে স্নানটান করে ভালো-মন্দ বেশ পেটপুরে খেয়ে পান চিবোতে চিবোতে পট্টবস্ত্র পরে এসে শান্তমনে হাসতে-হাসতে তবে মরে সুখ। বুঝলে?''

প্রাণগোবিন্দর মনে পড়ল, সকাল থেকে তিনি কিছুই খাননি। পেট চুঁই-চুঁই করছে। তেষ্টায় বুক পর্যন্ত শুকিয়ে আছে। মরার উত্তেজনায় এসব শারীরিক বোধ লোপাট হয়েছিল। এবার একটু ভাবিত হয়ে বললেন, ''বোধহয় আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি তো বেশ জ্ঞানী লোক।''

''আরে, সেই জন্যই তো সারাদিন গাছে উঠে বসে থাকি। গাছে উঠলে জ্ঞান বাড়ে, বুঝেছ?''

প্রাণগোবিন্দ অবাক হয়ে বললেন, ''গাছে উঠলে জ্ঞান বাড়ে? কই, একথা তো কোনও পুঁথি-পুস্তকে পড়িনি!''

''ওরে বাপু, পুঁথি-পুস্তক তো সব মুখস্থ বিদ্যে। ওসব ছাইভস্ম কি জ্ঞান? জ্ঞান অন্য জিনিস বাপু। এই তোমার মতোই একদিন বারো বছর আগে গলায় দড়ি দিতে এই গাছে এসে উঠে বসেছিলুম। আটঘাট বেঁধেই এসেছিলুম। দিনক্ষণ দেখে, গয়ায় গিয়ে নিজের শ্রাদ্ধ-পিণ্ডদান সব সেরে এসে, একদিন স্নান করে ইলিশ মাছ আর কচ্ছপের মাংস দিয়ে পেট ভরে ভাত খেয়ে, পান মুখে দিয়ে, নতুন ধুতি আর গেঞ্জি পরে, দুর্গানাম স্মরণ করতে-করতে এসে গাছে উঠে মজবুত করে দড়ি বেঁধে মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য অপেক্ষা করছিলুম। ঠিক তখনই, কী বলব রে ভাই, আকাশ থেকে যেন আমার মাথায় জ্ঞানের বৃষ্টি পড়তে লাগল। কত নতুন-নতুন ভাবনা চিন্তা আসতে লাগল তার লেখাজোখা নেই। মনটা যেন উড়ে-উড়ে বেড়াতে লাগল। ভারি ফুর্তির ভাব। পরিষ্কার বাতাসে শ্বাস নিয়ে বুকটাও যেন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে নিজেই বোঝালুম, তুই তো নিজেকে সৃষ্টি করিসনি। এখন যদি গলায় দড়ি দিস, তাহলে যে তোকে সৃষ্টি করেছে, তার সঙ্গে বেইমানি করা হবে না? বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না? তাকে কি ব্যথা দেওয়া হবে না? আর তাকেই যদি ব্যথা দিস, তা হলে মরেও রেহাই পাবি ভেবেছিস? যখন তোকে শিয়াল-শকুন ছিঁড়ে খাবে, তখন হাড়ে-হাড়ে টের পাবি রে পাপিষ্ঠ!''

প্রাণগোবিন্দ মুগ্ধ হয়ে মাথা নেড়ে-নেড়ে বললেন, ''বাঃ, বাঃ, এ তো খুব ভালো কথা। তা পুঁথি-পুস্তকে আছে এসব কথা?''

'আজ্ঞে না, নেই।''

''হ্যাঁ, বলুন। তারপর কী হল?''

''কী বলব রে ভাই, সারাজীবন যেসব কথা একবারের জন্যও মাথায় আসেনি, সেসব কথা দিব্যি আকাশ-বাতাস থেকে এসে শাঁ-শাঁ করে নাক, কান, মুখ দিয়ে ঢুকে মগজে সেঁধোতে লাগল। কিছুক্ষণ পর মাথাটা যেন জ্ঞানে একেবারে টইটম্বুর হয়ে উঠল। মরা তো হলই না, বরং মাথাভর্তি জ্ঞান নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলুম। সেই থেকে ঠিক করলুম, সারাদিন গাছে উঠে বসে থাকব। যতদিন বাঁচি, রোজ যত পারি জ্ঞান আহরণ করে যাব।''

''আপনি কি গাছেই থাকেন?''

''তা একরকম তাই বলতে পার। সকালে চাট্টি পান্তা খেয়ে সোজা এসে গাছের উঠে পড়ি। সঙ্গে চিঁড়ে, মুড়ি, জল সব নিয়ে আসি। এখানে এককানা মাচানের মতো করে নিয়েছি। দিব্যি থাকি। এখানেই দিবানিদ্রা

সেরে নিই।''

''ও বাবাঃ, ঘুমের ঘোরে পড়ে যাবেন যে!''

''না হে বাপু, তত আহাম্মক নই। এই যে দড়িখানা দেখছ, এটা দিয়েই বারো বছর আগে ফাঁসিতে ঝুলবার মতলব ছিল। তা সেই দড়িখানাই এখন আমার প্রাণরক্ষা করে। ঘুম পেলে দড়িটা দিয়ে নিজেকে গাছের ডালের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নিয়ে তারপর দিব্যি ঘুমোই।''

''নাঃ, আপনি সত্যিই জ্ঞানী লোক।''

''ওই যে বললুম, গাছে উঠলে জ্ঞান বাড়ে।''

প্রাণগোবিন্দ কিছুক্ষণ মাথা চুলকোতে-চুলকোতে ভাবলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, ''কিন্তু আমার যে মরা ছাড়া উপায় নেই। চারদিকে আমার বড় কলঙ্ক রটেছে মশাই, কারও কাছেই মুখ দেখাতে পারছি না। বউ পর্যন্ত আমাকে অবিশ্বাস করে! সেও ধরে নিল যে, গোকুল বিশ্বাসের গোরু আমিই চুরি করে এনে গোয়ালে বেঁধে রেখেছি! না মশাই, এর পর আর বেঁচে থাকার মানেই হয় না।''

''কী নাম বললে? গোকুল বিশ্বাস না কী যেন শুনলাম!''

''যে আজ্ঞে। চরণডাঙার গোকুল বিশ্বাস। তার গোরু গৌরীকে নিয়েই যত যত বখেরা । কয়েকদিন আগে গোকুল বিশ্বাসের আদরের গোরু গৌরী চুরি যায়। রাতের বেলা কে যেন গিয়ে গোকুল বিশ্বাসকে খবর দেয় যে, নসিগঞ্জের প্রাণগোবিন্দ রায়ের বাড়িতে পঞ্চাশ হাজার টাকা পৌঁছে দিলে গৌরীকে ফেরত দেওয়া হবে। সেই মোতাবেক আজ সকালে গোকুল বিশ্বাসের উকিল প্রভঞ্জন সূত্রধর পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে আমার কাছে হাজির।''

''তুমিই কি বাপু নসিগঞ্জের প্রাণগোবিন্দ রায়?''

''যে আজ্ঞে। আমি মশাই সাতেপাঁচে নেই। গোকুল বিশ্বাসকে কস্মিনকালেও চিনি না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, গোরুটাকে আমার গোয়ালেই পাওয়া যায়। আর তাতেই সবাই দুইয়ে-দুইয়ে চার ধরে নিয়ে আমাকে চোর ঠাউরে বসল! তাই ঠিক করেছি, বেঁচে থাকার আর কোনও মানেই হয় না।''

লোকটা তরতর করে নেমে এসে প্রাণগোবিন্দর পাশাপাশি আর একটা ডালে জুত করে বসে বলল, ''তাই বলো!''

লোকটার নেমে আসা দেখে প্রাণগোবিন্দ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর হিসেবে লোকটার বয়স না হোক আশির কাছাকাছি তো হবেই। তবু হাতে-পায়ে যেন টারজানের ভেলকি। তিনি গদগদ হয়ে বললেন, ''আপনি অতি চমৎকার গাছ বাইতে পারেন তো!''

লোকটা বলল, ''ওরে বাপু, বারো বছর ধরে রোজ প্র্যাকটিস করে যাচ্ছি যে! এ বনে বানর আর হনুমান বড় কম নেই। এখন তারাও আমাকে সমঝে চলে। একবার আমার একছড়া কলা নিয়ে একটা হনুমান পালাচ্ছিল, আমি তেড়ে গিয়ে তার লেজ ধরে মুচড়ে একখানা থাপ্পড় কষিয়ে কলা কেড়ে নিয়ে আসি। তারপর থেকে বেশি ঘাঁটায় না। তা সেকথা যাক, বরং গোকুল বিশ্বাসের কথাটাই শুনি।''

''আর শোনার কিছু নেই। গাঁয়ে আমার বড় বদনাম রটে গিয়েছে মশাই। মানসম্মান নিয়ে থাকার জো নেই।''

লোকটা গম্ভীর হয়ে বলল, ''হুঁ। গোকুল বিশ্বাসের গোরু যদি চুরি করে থাকো, আর সেই বাবদে যদি গোকুল বিশ্বাস তোমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে থাকে, তাহলে তো তোমার গলায় দড়ি দিয়ে মরার দরকারই নেই হে! বরং নিশ্চিন্তে বাড়ি গিয়ে নেয়ে-খেয়ে ঘুমোও। গোকুল বিশ্বাসের ঠ্যাঙাড়েরাই এসে তোমাকে মেরে রেখে যাবে।''

প্রাণগোবিন্দ হাঁ করে চেয়ে থেকে বললেন, ''অ্যাঁ! আপনি কি গোকুল বিশ্বাসকে চেনেন?''

''চিনি মানে! আগাপাশতলা চিনি। চরণডাঙার গোকুল বিশ্বাসের নামে গোটা পরগনা কাঁপে। এক সময় দিনেদুপুরে মানুষের গলা নামিয়ে দিত। রামদা চালাত বনবন করে। লাঠি, সড়কি, তলোয়ারে পাকা হাত।

বন্দুকের টিপ ছিল অব্যর্থ। গোকলো ডাকাতের মাথার দাম এক সময় লাখ টাকায় উঠেছিল। তবে সেসব এখন ছেড়েছুড়ে দিয়ে কাজকারবারে মন দিয়েছে। ধান-চালের কল, গুড়ের কারখানা, তেলকল কত কী ফেঁদে বসেছে। তার ডাকাতির স্যাঙাতরাই এখন তার কর্মচারী। গোকুলকে যদি চটিয়ে থাকো, তাহলে আর তোমার মরার ভাবনা নেই। কষ্ট করে গাছ বেয়ে, দড়ি খাটিয়ে, ফাঁস লটকে মরতে যাবে কোন দুঃখে? হাসতে-হাসতে বাড়ি চলে যাও। গোকুল বিশ্বাসই তোমার সব ব্যবস্থা করে দেবে। ভালো করে কিছু টের পাওয়ার আগেই দেখবে দাঁত ছিরকুটে মরে পড়ে আছ। তাতে একটা সুবিধেও হবে হে। আত্মঘাতী হলে নাকি খুব পাপ হয়। খুন হলে সেই পাপের হাত থেকেও বেঁচে যাবে।"

প্রাণগোবিন্দের গলা আগে থেকেই শুকিয়ে ছিল। এখন যেন শিরিষ কাগজের মতো খরখর করছে। তিনি বললেন, "মশাই, বড় তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খাওয়াবেন?"

"আহা, শুধু জলই বা কেন? সেই সঙ্গে এক ডেলা গুড় দিয়ে চাট্টি মুড়িও খাও। আমার সব ব্যবস্থা আছে। শত হলেও তুমি তো অতিথি হে।"

প্রাণগোবিন্দ মুড়ি, গুড় আর জল খেয়ে একটু ধাতস্থ হলেন। তারপর বললেন, "প্রভঞ্জন সূত্রধরের কথা শুনে মনে হয়েছিল, গোকুল বিশ্বাস লোকটার বোধহয় বড় নরম মন। গোরুর উপর যার অত মায়া-দয়া।"

"কথাটা মিথ্যে নয় বাপু। গোকুল একেবারে গৌরী-অন্ত প্রাণ।"

"আচ্ছা, সে যদি ঠ্যাঙাড়ে দিয়ে আমাকে খুনই করাবে, তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা মুক্তিপণ পাঠানোর কী দরকার ছিল বলুন তো?"

"এক কথা, টাকা না পেলে তুমি গৌরীর কোনও ক্ষতিও তো করতে পারো। তাই সে টাকা পাঠিয়ে সেটা বন্ধ করল। গৌরী-উদ্ধারের পর এখন তার অন্য চেহারা। ওই পঞ্চাশ হাজার তো তোমার যাবেই, সেই সঙ্গে তোমার ঘরের যা আছে তাও চেঁচেপুঁছে নিয়ে যাবে, এ তুমি ধরেই রাখতে পার।"

"সর্বনাশ! তাহলে উপায়?"

এবার বুড়ো লোকটা বিরক্ত হয়ে বলল, "আচ্ছা, তোমার আক্কেলখানা কী বলো তো!"

"কেন, কোনও দোষ করলুম নাকি?"

"করলে না? যে লোক গলায় দড়ি দিতে এসেছে তার কেনই বা এত পিছুটান, আর কেনই বা এত বিষয়ের চিন্তা, আর কেনই বা এত সর্বনাশের ভয়! তাই তো বলছিলুম রে বাপু, আটঘাট বেঁধে মরতে হয়। আধখেঁচড়া ভাব নিয়ে মরলে কি সুখ হয়? ওরে বাপু, তুমি তো মরার জন্য পা বাড়িয়েই আছ। এখন গোকুল বিশ্বাস যদি তোমার বাড়িতে চড়াও হয়, তাতে তোমার কোন লবডঙ্কা? না হে, তোমার বৈরাগ্যটাই আসেনি, তাহলে মরে হবেটা কী?"

প্রাণগোবিন্দকে ব্যাপারটা স্বীকার করতে হল। তিনি সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, তা বটে। তবে মনটা বড় খচখচ করছে যে!"

"ও খচখচানিটাই তো মায়া হে। দড়িদড়া না খুললে কি নৌকো পাড়ি দিতে পারে? ওই দড়িদড়াই হল মায়া, বুঝলে? বন্ধন না খুললে নৌকো ঘাট ছেড়ে এগোবে কী করে?"

"বাঃ, আপনি সত্যিই জ্ঞানী লোক!"

"গাছে উঠলেই জ্ঞান বাড়ে হে, গাছে উঠলেই জ্ঞান বাড়ে।"

"আচ্ছা, আজ রাতেই কি গোকুল বিশ্বাস আমার বাড়িতে চড়াও হবে বলে মনে হয়?"

"ওরে বাপু, আমি তো তার পাশের গাঁ হবিবপুরেই থাকি। গত চল্লিশ বছর ধরে তার কাজকারবার দেখে আসছি। এতক্ষণে তার চরেরা তোমার বাড়ির চারপাশে মোতায়েন হয়ে গিয়েছে। কড়া নজর রাখছে চারদিকে, যাতে টাকাটা পাচার না হতে পারে। রাত একটু নিশুতি হলেই তার গুন্ডারা এসে হাজির হয়ে যাবে। বিনা মেহনতে যদি মরতে চাও, তবে বাড়িতে গিয়ে বসে থাকো।"

প্রাণগোবিন্দ আর-একটু ভাবলেন। মুড়ি আর গুড় পেটে যাওয়ার পর তাঁর মাথাটা বেশ ভালো কাজ করছে। তাছাড়া গাছে উঠলে জ্ঞান বাড়ে, এ-কথাটাও বোধহয় খুব মিথ্যে নয়। তিনি চিন্তা করে দেখলেন, এতক্ষণে তাঁর দু'টি নাতি-নাতনি, পিউ আর পিয়াল এসে গিয়েছে। গোকুল বিশ্বাসের গুন্ডারা যদি হামলা করে, তা হলে নিষ্পাপ দু'টি শিশুর বিপদ হতে কতক্ষণ? তিনি হঠাৎ গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, "দেখুন মশাই, মরতে আমার তেমন ভয় হচ্ছে না, তবে, আমার বিরুদ্ধে এরকম একটা ষড়যন্ত্র কে করল, সেটা না জেনে মরাটা বোধ হয় ঠিক হবে না। তাছাড়া আমার দু'টি নাতি-নাতনিও আছে। তাদেরও রক্ষা করা দরকার।"

দাড়ি-গোঁফের ফাঁক দিয়ে একটু বিচক্ষণ হাসি হেসে লোকটা বলল, "মরা যে তোমার বরাতে নেই, তা তোমার রকম দেখেই আঁচ করেছিলুম। আমি বলি কী, মরার আগে একটু ভালো করে বেঁচে উঠলে তবে মরার একটা মানে হয়। আধমরাদের তো বাঁচা-মরার মধ্যে বিশেষ তফাত নেই। কী বলো হে?"

"অতি যথার্থ কথা। আপনি জ্ঞানী লোক।"

"গাছে ওঠার অভ্যেস করো, তুমিও জ্ঞানী হবে। তা যা বলছিলাম, যথার্থ মরতে হলে আগে যথার্থ বেঁচে ওঠা চাই। আধমরা ভাবটা ঝেড়ে ফেলে এবার একটু বেঁচে ওঠো তো বাপু!"

"যে আজ্ঞে। কিন্তু তার জন্য কী করতে হবে বলুন তো! ব্যায়াম নাকি?"

"না হে।"

"তবে কি ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাব, নাকি কোবরেজের কাছে যাব? নাকি হোমিওপ্যাথি ধরব?"

"ওতে কাজ হবে না হে। অন্য নিদান দেখতে হবে।"

৩

আজ বাসে একজন ম্যাজিশিয়ান উঠেছিল। যেমন সুন্দর তার চেহারা, তেমনই আশ্চর্য তার ম্যাজিক। রাস্তাঘাটে ঘুরে-ঘুরে যারা ম্যাজিক দেখায়, তাদের যেমন ছেঁড়াখোঁড়া ময়লা পোশাক থাকে গায়ে, এ লোকটার মোটেই তেমন নয়। রীতিমতো ঝকঝকে কালো কোট-প্যান্ট আর সাদা শার্টের সঙ্গে লাল টাই। মাথায় একটা লম্বা কালো টুপি, দু'হাতে সাদা দস্তানা।

প্রথমেই সবাইকে নমস্কার করে হাতের দস্তানা দুটো খুলে ফেলল সে। তারপর দুটো দস্তানাই ছুড়ে দিল শূন্যে। অবাক কাণ্ড! দস্তানা দু'টো শূন্যে ভেসে-ভেসে অদ্ভুত সব নাচের মুদ্রা দেখাতে লাগল। তারপর দুটো দস্তানা নিজেরাই হাততালি দিল, পরস্পর ঘুসোঘুসি করল, পাঞ্জা লড়ল, তারপর নমস্কার করে খেলা শেষ করল।

তারপর টুপির খেলা। লোকটা মাথা থেকে টুপিটা খুলে সবাইকে টুপির ভিতরটা দেখাল, সেটা একদম ফাঁকা। তারপর টুপির ভিতরে হাত ঢুকিয়ে সে প্রথমে একটা খরগোশ, তারপর একটা টিয়াপাখি, একটা সবুজ জ্যান্ত সাপ বের করে একে-একে একটা ঝোলায় পুরল! তারপর এক ভাঁড় গরম চা বের করে সামনের সিটের এক ভদ্রলোককে দিল। তিনি একটু ভয়ে-ভয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "বাঃ, এ তো চমৎকার চা।"

এর পর ম্যাজিশিয়ান কয়েকটা রুমাল বের করে বিলিয়ে দিল। দু'জনকে দিল ডটপেন, কাউকে দুটো বিস্কুট, কাউকে লজেন্স। সবশেষে দুটো চকোলেট-বার বের করে পিউ আর পিয়ালকে দিয়ে বলল, "তোমরা তো অচেনা লোকের হাতের খাবার খাও না, তাই না? তবু রেখে দাও।"

নসিগঞ্জের অনেক আগেই তালপুকুর নামে একটা জায়গায় সেই আশ্চর্য ম্যাজিশিয়ান নেমে গেল। বাসের সবাই বলাবলি করছিল, এরকম ভালো ম্যাজিক বহুদিন দেখা যায়নি। আর লোকটাও কী ভালো! কারও কাছ থেকে পয়সাও চাইল না!

ম্যাজিশিয়ান নেমে যাওয়ার পরই শান্তামাসি বলল, ''ওই চকোলেট দুটো আমার কাছে দাও। নইলে তোমরা আবার ভুল করে খেয়ে ফেলবে।''

শান্তামাসি তাদের আয়া। খুব কড়া ধাতের মানুষ। মুখে একটুও হাসি নেই। তবে কড়া মানুষ হলেও শান্তামাসি খারাপ লোক নয়, তাদের খুব যত্নআত্তি করে, দেখেশুনে রাখে।

পিউ বলল, ''আচ্ছা মাসি, ম্যাজিশিয়ান কী করে জানল যে, আমরা অচেনা লোকের দেওয়া খাবার খাই না?''

শান্তমাসি বিরস মুখে বলল, ''তা জানি না। তবে পাজি লোকেরা অনেক খোঁজখবর রাখে।''

পিউয়ের কথাটা একটুও বিশ্বাস হল না। লোকটাকে তার কখনও পাজি বলে মনেই হয়নি। সে বলল, ''এটা আমি কিছুতেই খাব না মাসি। কিন্তু মোড়কটা তো খুব সুন্দর, এটা আমার কাছে একটু থাক।''

শান্তামাসি অবশ্য আর কিছু বলেনি। চকোলেট-বারটা পিউয়ের কাছেই রয়ে গিয়েছে। তবে পিয়াল ছোট আর পেটুক বলে ওরটা শান্তামাসি নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে।

শহরে বাবুপাড়ায় তারা যে বাড়িতে থাকে, সেই বাড়িটা কেমন যেন গম্ভীর আর রাগী চেহারার বাড়ি। ও বাড়ির হাওয়ায় মনখারাপের জীবাণু ঘুরে বেড়ায়। না হবেই বা কেন! তাদের মা-বাবা দু'জনেই ভারি ব্যস্ত ডাক্তার। সারাদিন তাঁরা বাড়িতে থাকেনই না। যখন থাকেন, তখন দু'জনের মধ্যে কেবল রোগ আর ওষুধ নিয়ে কথা হয়! হাসিঠাট্টা, মজা কিচ্ছু নেই। নসিগঞ্জের বাড়িটা ঠিক উলটো। এ বাড়িটা যেন সব সময় হাসছে, খুশি আর আনন্দে ডগমগ করছে। খোলামেলা আর হাসিখুশি এ বাড়িটায় ঢুকলেই পিউ আর পিয়ালের মন ভালো হয়ে যায়। ঠিক যেন রূপকথার বাড়ি। এ বাড়িতে তার আনমনা ভুলো মনের দাদু আর ভারি নরম মনের ঠাকুরমা থাকেন। এ বাড়ির বাতাসে যেন মজা বিজবিজ করছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আজ সেরকম হল না। বাস থেকে নেমে শান্তমাসির সঙ্গে সামান্য পথ হেঁটে পিউ আর পিয়াল যখন বাড়িটার সামনে পৌঁছোল, তখন পিউয়ের স্পষ্ট মনে হল, আজ এ বাড়িটার যেন কেমন বিষণ্ণ, হতশ্রী চেহারা। কেমন যেন গম্ভীর, দুঃখী-দুঃখী ভাব।

পিউ চুপিচুপি পিয়ালকে বলল, ''ভাই, দেখেছিস, আজ বাড়িটা যেন ভীষণ গম্ভীর!''

পিয়ালের বয়স মোটে পাঁচ বছর। সে অত কিছু বোঝে না। সে দিদির হাত চেপে ধরে শুধু বলল, ''হ্যাঁ রে দিদি, বাড়িটার বোধ হয় খিদে পেয়েছে।''

পিয়াল একটু পেটুক আছে। সে জানে, খিদে পেলেই লোকের যত কষ্ট।

আজ বারান্দায় দাদু নেই, চেয়ারটা খালি। বাড়িতে ঢুকে শুনল, দাদু নাকি কোথায় জরুরি কাজে গিয়েছেন, ফিরতে দেরি হবে। পিউয়ের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সে হল দাদুর চামচা। সবাই বলে, এমন দাদুভক্ত নাকি দেখা যায় না। তা, কথাটা সত্যি। তার দাদু ভারি অন্যমনস্ক মানুষ। ভোলাবাবুকে তপনবাবু বলে ভুল করেন, স্নান করতে বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে ঠাকুরঘরে ঢুকে সাবান খুঁজে না পেয়ে চেঁচামেচি করেন, ধুতি পরতে গিয়ে কতদিন ঠাকুরমার শাড়ি দিব্যি কাছাকোঁচা দিয়ে পরে বেরিয়ে গিয়ে কেলেঙ্কারি করেছেন। পিউ সারাক্ষণ দাদুর সঙ্গে চিমটি খেয়ে লেগে থাকে। দাদুর ভুলভাল ধরিয়ে দেয়, শাসনও করে খুব। দাদুরও তাতে ভারি আহ্লাদ। পিয়াল পেটুক বলেই বোধহয় ঠাকুরমার আঁচল ধরে থাকতে ভালোবাসে।

পিউয়ের আজ খেতে ইচ্ছে করছিল না। ঠাকুরমা সাধসাধি করায় একখানা লুচি খেল। তারও আধখানা কাককে দিয়ে দিল। তারপর চুপচাপ একটা গল্পের বই নিয়ে সামনের বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে রইল, না, বই পড়াতেও তার মন ছিল না। কখন দাদু আসবেন, সেজন্য ঘনঘন রাস্তার দিকে চেয়ে দেখছিল।

ম্যাজিশিয়ানের দেওয়া চকোলেট-বারটা বারবার ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখছিল পিউ। এটা তার চেনা চকোলেট-বার নয়। মোড়কটা অন্যরকম। ঘুরিয়ে- ফিরিয়ে দেখতে গিয়ে এক সময় তার চোখে পড়ল, মোড়কের পিছনে নীচের দিকে খুব খুদে অক্ষরে ছাপা, মেড ইন ইংল্যান্ড। সে ভারি অবাক হল। গাঁয়ের ম্যাজিশিয়ানের

কাছে বিলিতি চকোলেট এল কোথা থেকে? সে একটু কৌতূহলী হয়ে মোড়কের একটা ভাঁজ খুলে গন্ধ শুঁকতে গিয়ে দেখে, মোড়কের ভিতরে একটা ছোট্ট চিরকুট রয়েছে। তাতে পেনসিল দিয়ে কিছু লেখা।

অবাক হয়ে চিরকুটটা বের করে এনে সে দেখল, তাতে ভারি সুন্দর ছাঁচে গোটা-গোটা অক্ষরে লেখা, "তোমাদের খুব বিপদ আসছে, সবধান! বিক্রমজিৎকে মনে রেখো।" ব্যস, আর কিচ্ছু নেই।

পিউ অনেক বার চিরকুটটা পড়েও মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না। চিরকুটটা ঠাকুরমাকে দেখাবে কিনা ভাবল। কিন্তু বড়দের একটা দোষ হল, তাঁরা ছোটদের কোনও কথাকেই তেমন পাত্তা দেন না। কাগজের টুকরোটা দাদুর পঞ্জিকার মধ্যে গুঁজে রেখে পিউ চুপ করে উঠে এসে দেখল, শান্তমাসি কোথায়! মাসি বাথরুমে গিয়েছে দেখে সে এসে বাইরের ঘরে রাখা শান্তামাসির ব্যাগটা থেকে পিয়ালের চকোলেট বারটা খুলে দেখল, তাতে কোনও চিরকুট নেই। তাহলে কি চিরকুটটা পিউকেই উদ্দেশ্য করে লেখা? কিন্তু ম্যাজিশিয়ান তো তাকে চেনেই না!

মাত্র আট বছর বয়স হলেও পিউ বেশি বকবক করে না। সে চাপা স্বভাবের মেয়ে। কথা কওয়ার চেয়ে বরং সে ভাবতেই বেশি ভালবাসে। আর সব কিছু বোঝার চেষ্টা করে। বিক্রমজিৎ নামটাও সে আগে কখনও শোনেনি, এই নামের কাউকে চেনারও প্রশ্ন ওঠে না। তাই সে বারান্দার চেয়ারে চুপ করে বসে ভাবতে লাগল। চিরকুটে লিখেছে "বিক্রমজিৎকে মনে রেখো"। বেশ কথা। কিন্তু যাকে সে চেনেই না, তাকে সে কী করে মনে রাখবে?

ঠিক এই সময় ফটক খুলে হাসিমুখে গোরাং দাস এসে ঢুকল। গোরাংকে দেখে ভারি খুশি হয়ে পিউ চেঁচিয়ে উঠল, "গোরাংদা!"

এ বাড়িতে যে ক'জন ভিখিরি আসে তাদের সবাইকেই চেনে পিউ। এ বাড়িতে সবাইকেই ভিক্ষে দেওয়া হয়। কেউ-কেউ আবার পাত পেড়ে খেয়েও যায়, সুখ-দুঃখের কথাও কয়। তারা বেশ লোক। গোরাং দাসও ভিখিরি বটে, কিন্তু অন্য সব ভিখিরির মতো নয়। সে বেশ পরিষ্কার একখানা আলখাল্লা পরে। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, বাবরি চুল ভালো করে আঁচড়ানো, কুচকুচে কালো দাড়িগোঁফ, বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। রামপ্রসাদী গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়। নসিগঞ্জ আর আশপাশের পাঁচ-সাতটা গাঁয়ের প্রায় সব বাড়িতেই তার অনায়াস গতিবিধি।

কেউ-কেউ বলে, গোরাং দাস হল স্পাই। কার স্পাই, কীসের স্পাই তা অবশ্য কেউ বলতে পারে না। কেউ আবার বলে, গোরাং হল শিবের অবতার। আবার কেউ বলে, তার সঙ্গে নাকি ডাকাতের দলের যোগাযোগ আছে।

পিউ তাকে একদিন জিগ্যেস করেছিল, "তুমি ভিক্ষে করো কেন গোরাংদা? তোমাকে দেখে তো একটুও ভিখিরি বলে মনে হয় না।"

মাথাটাথা চুলকে গোরাং বলেছি, 'কথাটা কী জানো দিদি, বললে হয়তো বিশ্বাস করবে না! ছেলেবেলা থেকেই আমার ভিখিরি হওয়ার শখ। স্কুলের পরীক্ষায় একবার রচনা এসেছিল, 'বড় হইয়া তুমি কী হইতে চাও?' আমি খুব ফলাও করে লিখেছিলুম, 'বড় হইয়া আমি ভিখারি হইব।' তাতে অবশ্য মাস্টারমশাই গোল্লা দিয়েছিল।'

"এ মা! তুমি ভিখিরি হতে চাইলে কেন?"

"ভিখিরি হওয়ার যে অনেক সুবিধে দিদি। সারাদিন ইচ্ছেমতো যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ানো যায়। কাজকর্ম করতে হয় না। কারও হুকুম তামিল করতে হয় না। বিনা মেহনতে রোজগারপাতিও হয়।"

"আচ্ছা, লোকে যে বলে, তুমি নাকি স্পাই!"

চোখ বড়-বড় করে গলা নামিয়ে গোরাং বলল, "সেকথাও মিথ্যে নয় দিদি। আমি গুপ্তচরও বটে। অনেকের অনেক হাঁড়ির খবর আমার ঝুলিতে আছে।"

"ধেৎ! তোমাকে স্পাই বলে মনেই হয় না!"

''আহা, তুমি বুঝতে পারছ না। স্পাইকে স্পাই বলে চেনা গেলে সে আবার কীসের স্পাই? তাই আসল স্পাইকে কখনও স্পাই বলে মনেই হবে না তোমার!''

''কিন্তু তোমাকে যে ভিখিরি বলেও মনে হয় না গোরাংদা। তোমার জামাকাপড় কেমন পরিষ্কার, চুল কেমন আঁচড়ানো, মনে হয় দাঁতও মাজো, খোঁড়াও নও, কানাও নও, নুলোও নও। তবে তুমি কেমন ভিখিরি?''

''আহা, ভিখিরি কি একরকম? কানা ভিখিরি, খোঁড়া ভিখিরি, ঘেয়ো ভিখিরি যেমন আছে, তেমনই গায়ক ভিখিরি, সাধু ভিখিরি, বাউল ভিখিরি, ফকির ভিখিরিও আছে। আবার চালাক ভিখিরি, বোকা ভিখিরি, আসল ভিখিরি, নকল ভিখিরি—ভিখিরির কি শেষ আছে? আমি তো একটা বই লিখব বলে ঠিক করে রেখেছি, 'ভিখারি কাহাকে বলে ও কয় প্রকার'।''

''তুমি তো হলে কেমন ভিখিরি গোরাংদা?''

গোরাং মাথা চুলকে বলেছিল, ''এই তো মুশকিলে ফেললে দিদি, নিজের মুখে কি আর নিজের কথা বলা যায়?''

তা সে যাই হোক, গোরাং দাসকে ভিখিরি বলে মনে হয় না পিউয়ের। দাদু আর ঠাকুমাও গোরাংকে ভারি খাতির করেন।

আজ গোরাংকে দেখে মনখারাপের ভাবটা একটু কমল পিউয়ের। গোরাং বারান্দার সিঁড়ির ধাপে জুত করে বসে বলল, ''পিউদিদি, আজ যে তোমার মুখখানা তেমন হাসিখুশি নয়! চোখ তো তেমন ঝলমল করছে না! কী ব্যাপার?''

''আমার মনখারাপ গোরাংদা। এ বাড়িটায় আজ যেন কী একটা হয়েছে। কেউ কিছু বলছেন না, দাদু কোথায় চলে গিয়েছেন, ফিরতে নাকি দেরি হবে। দাদুকে ছাড়া একটুও ভালো লাগছে না যে!''

গোরাং একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ''সব দিন কি আর সমান যায় পিউদিদি? এক-একটা খারাপ দিনও এসে পড়ে মাঝে-মাঝে। তবে এসব দুষ্টু দিনগুলো না এলে আবার ভালো দিনগুলো কতটা ভালো তা বোঝা যায় না কিনা।''

''আজকের দিনটা কি দুষ্টু দিন গোরাংদাদা?''

''তাই তো মনে হচ্ছে। পিউদিদির যখন মনখারাপ, তখন বলতেই হবে যে, আজকের দিনটা ভালো দিন নয়।''

''আচ্ছা গোরাংদাদা, আমার দাদুর মতো ভালো লোক তুমি দেখেছ?''

গোরাং মাথা নেড়ে বলল, ''না দিদি, আমি সাতগাঁয়ে ঘুরে বেড়াই, কত লোকের সঙ্গে দিব্যি আমার দেখা হয়। সত্যি কথা বলতে কী, রায়মশাইয়ের মতো এমন নিপাট ভালোমানুষ আমি আর-একটাও দেখিনি।''

পিউ খুব করুণ মুখ করে বলল, ''তাহলে ঠাকুরমা কেন বিড়বিড় করে দাদুকে বকছেন বলো তো!''

''বকছেন নাকি?''

তাই তো মনে হচ্ছে। ঠাকুরমার মেজাজ খারাপ হলেই কেন যে দাদুকে বকেন? আজও বারবার বলছেন, ''বুড়ো বয়সের অধঃপতন বুড়ো বয়সের অধঃপতন।''

গোরাং একটু গুম মেরে গেল।

গোরাং দাস একটু আগে নিতাইবাবুর বাড়িতে গিয়েছিল। গিয়ে দ্যাখে, নিতাইবাবুর মেজাজটা আজ বেজায় খাট্টা হয়ে আছে। রাগে আপন মনেই গজগজ করে যাচ্ছেন। বাজার থেকে ফিরে ঘেমো জামাটা খুলে সবে রোদে শুকোতে দিচ্ছেন, ঠিক এমন সময় গোরাং গিয়ে গান ধরেছে, ''আমায় দাও মা, তবিলদারি...''

নিতাইবাবু কালীভক্ত লোক। গোরাং দাস এসে গান ধরল অন্য সময় তাঁর বেশ ভক্তিভাব হয়। চোখ বুজে মাথা নেড়ে-নেড়ে শোনেন, কিন্তু আজ গোরাংয়ের গলা পেয়েই যেন খেপে উঠলেন, ছুটে এসে তম্বি করে বললেন, ''তোমার আক্কেল কী হে গোরাং? বলি লজ্জাশরমও কি বিসর্জন দিয়েছ?''

গোরাং অবাক হয়ে বলে, ''কেন মশাই, সুরে ভুল হল নাকি?''

"সুর নিয়ে কথা হচ্ছে না। বলি, আমার মতো ছাপোষার বাড়িতে ভিক্ষে করতে তোমার লজ্জা হয় না? যাও না, ওই প্রাণগোবিন্দ রায়ের বাড়িতে! ঘরে বসে দোহাত্তা কামাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ না? তোমরা কি কানা? লাখো-লাখো টাকা লোকে বাড়ি বয়ে এসে সেলাম ঠুকে দিয়ে যাচ্ছে। তা সে-বাড়ি ছেড়ে আমাদের মতো গরিবগুরবোর বাড়িতে আসা কেন?"

নিতাইবাবুর গিন্নি গিরীন্দ্রমোহিনী অত্যন্ত দাপুটে মহিলা। নিতাইবাবুর চেঁচামেচি শুনে বেরিয়ে এসে বললেন, "তা ও বেচারির উপর তম্বি করা কেন? ও তো আর দোষ করেনি। বলি, প্রাণগোবিন্দ রায়ের মতো বুকের পাটা আছে তোমার? তিনি তো আর মেনিমুখো নন তোমার মতো, যাকে বলে বাপের ব্যাটা! গোকুল বিশ্বাসের মতো অমন সাংঘাতিক লোকের কান মুচড়ে টাকা আদায় করল। পারবে তুমি সাতজন্মে ওরকম হতে? এই নিরীহ বেচারার উপর গায়ের ঝাল ঝাড়ছ যে বড়! তোমারই তো লজ্জা হওয়া উচিত! প্রাণগোবিন্দবাবুকে দেখে শেখো। নমস্য ব্যক্তি, এতদিনে গাঁয়ে একটা সত্যিকারের পুরুষমানুষ দেখলুম!"

নিতাইবাবু নিতান্তই মিইয়ে গেলেন। যেমন গরম দুধে পড়ে মুড়ি নেতিয়ে যায়, ঠিক তেমনই।

ওদিকে পরেশবাবুর বাড়িতেও প্রাণগোবিন্দকে নিয়ে বেশ একটা মনকষাকষি হচ্ছে। গোরাং গিয়ে শুনতে পেল। পরেশবাবু তাঁর গিন্নি নবদুর্গাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন, "আহা, তা বলে গোরু চুরি করা কি ভালো?"

নবদুর্গা ফুঁসে উঠে বললেন, "চুরি! চুরি হতে যাবে কেন? গোরু চুরি তো ছোটলোকের কাজ! উনি যা করছেন, সেটাকে বলা হয় অপহরণ। অপহরণ আর চুরি কি এক জিনিস হল? শুধু তাই নয়, উনি সেই গোরু বাবদ মুক্তিপণ আদায় করেছেন। তোমার মুরোদে কুলোবে? গোরুচোর বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলেই তো হবে না। গোকলো ডাকাত কত খুনখারাপি করেছে জানো? কত লোকের যথাসর্বস্ব লুটে নিয়ে পথে বসিয়েছে! আজ তাকেই কেমন উচিত শিক্ষা দিলেন প্রাণগোবিন্দবাবু! আমার তো গিয়ে লোকটাকে পেন্নাম করতে ইচ্ছে করছে।"

পরেশবাবু হাল ছেড়ে দিয়ে গোরাংয়ের কাছে বসে পড়লেন। বললেন, "শুনলি গোরাং শুনলি! গোরু চুরিও নাকি একটা বীরত্বের কাজ! তাই যদি হবে, তাহলে দেশের বড়-বড় বীরেরা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকতেন! তুই-ই বল!"

ব্যাপারটা তখনও কিছু বুঝতে পারছিল না গোরাং দাস। যখন এই বাড়ির দিকে আসছে, তখন বনমালী ঘোষ বাজার সেরে ফিরছিলেন। তাকে দেখে একগাল হেসে বললেন, "প্রাণগোবিন্দবাবুর বাড়িতে যাচ্ছিস বুঝি গোরাং? তা যা, আজ ভালোই পাবি। একটু আগে দেখলুম, বাবু নতুন দড়ি কিনে উত্তরমুখো রওনা হলেন। আবার কার গোরু ঘরে আনতে গেলেন কে জানে বাবা!"

"আচ্ছা গোরাংদাদা, তুমি বিক্রমজিৎ নামের কাউকে চেনো?"

গোরাং একটু আনমনা ছিল। প্রশ্ন শুনে একটু অবাক হয়ে বলল, "কার নাম বললে?"

"বিক্রমজিৎ।"

মাথা নেড়ে গোরাং বলে, "না দিদি, ও নামে কাউকে তো চিনি না!"

"তবে যে তুমি বলো, সাতগাঁয়ের সব লোককে চেনো!"

"তা চিনি বইকি! সব লোককেই চিনি। নাড়িনক্ষত্র জানি।"

"তাহলে বিক্রমজিৎকে চেনো না কেন?"

"সে কি এখানকার লোক দিদি? কাছেপিঠে থাকে?"

"কোথায় থাকে তা তো জানি না!"

"কেমন চেহারা?"

"তাকে কি আমি দেখেছি নাকি?"

গোরাং অবাক হয়ে বলে, "তুমিও চেনো না? নামটা তাহলে কোথায় পেলে?"

''একটা কাগজে লেখা ছিল।''

''কোন কাগজ?''

পিউ পঞ্জিকার ভিতর থেকে চিরকুটটা বের করে গোরাংয়ের হাতে দিয়ে বলল, ''এই দ্যাখো!''

গোরাং চিরকুটটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল। তারপর মাথা তুলে বলল, ''এ তো তুলোট কাগজ। আজকাল এ কাগজ পাওয়াই যায় না। এ চিঠি তোমাকে কে দিল দিদি?''

পিউ একটু হেসে বলল, ''একজন ম্যাজিশিয়ান। যেমন সুন্দর তার চেহারা, তেমনই ভালো তার ম্যাজিক।''

''বটে! তা, তার ম্যাজিক তুমি দেখলে কোথায়?''

''বাসের মধ্যে। সে কিন্তু ম্যাজিক দেখিয়ে পয়সা নেয়নি। বরং সবাইকে বিস্কুট, লজেন্স, চকোলেট, চা এসব দিয়েছে। ভারি ভালো লোক।''

গোরাং ঘনঘন মাথা চুলকে বলল, ''এ তল্লাটে ম্যাজিশিয়ান তো মোটে পাঁচজন। সাত গাঁয়ের গগন চটপটি, হবিবপুরের সনাতন মুস্তাফি, ময়নার হারাধন পোদ্দার, চরণডাঙার সুমন্ত ঘোষ আর কুঞ্জপুকুরের ফটিক দাস। ফটিক আর সুমন্ত ছাড়া বাকি সব বুড়োহাবড়া। তুমি যেমন বলছ, তেমন সুন্দর চেহারা কারও নয়। তাহলে ম্যাজিকটা দেখাল কে, সেটাই ভাবনার কথা আরও একজন ম্যাজিক জানে বলে শুনেছি। সে হল বীরপুরের বটুক সামন্ত। কিন্তু সে কখনও ম্যাজিক দেখায় না।''

''তুমি কিছু জানো না। লোকটা তালপুকুরে নেমে গেল। নিশ্চয়ই তালপুকুরেরই বাড়ি।''

এবার কেমন ভ্যাবলার মতো পিউয়ের দিকে চেয়ে রইল গোরাং। অনেকক্ষণ কথাই বেরোল না মুখ দিয়ে। তারপর বিড়বিড় করে বলল, ''তালপুকুর! বিক্রমজিৎ! কিন্তু তা কী করে হয়? সেটা যে অসম্ভব!''

''কী বলছ গোরাংদাদা?''

''মাথাটা ভোঁ-ভোঁ করছে দিদি। বড্ড গণ্ডগোল পাকিয়ে দিয়েছ তুমি। তালপুকুর আর বিক্রমজিৎকে যে মেলাতে পারছি না! একথাও ঠিক যে, তালপুকুরে বিক্রমজিৎ নামে এক জাদুকর থাকত। সাংঘাতিক জাদুকর। এমন সব অশৈলি কাণ্ড করত যে, লোকে বেজায় ভয়ও পেত তাকে। কিন্তু দিদি, সে তো একশো বছর আগেকার কথা! বিক্রমজিৎ তো কবেই মরে গেছে। তাই ভাবছি, বিক্রমজিতের ভেক ধরে এ আবার কে উদয় হল! তার মতলবটাই বা কী! সে চিরকুটটাই বা কেন দিল তোমাকে! আর বিপদের কথাই বা বলল কেন? মাথার ভিতর সব তালগোল পাকিয়ে গেল যে!''

''তোমার তো সব সময়েই মাথা তালগোল পাকিয়ে যায়। একবার যে তোমাকে গালিভারের গল্প বলেছিলুম, সেটা শুনেও তোমার মাথা তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল!''

''হ্যাঁ দিদি, সেকথা ঠিক। তবে বিক্রমজিৎ আর তালপুকুরের ব্যাপারটা আরও গোলমেলে। যদি সত্যিই তার রাজপুত্তুরের মতো চেহারা হয়, তাহলে আরও ভাবনার কথা। কারণ, একশো বছর আগে যে বিক্রমজিৎ জাদুর খেলা দেখাত, তারও চেহারা ছিল নাকি কার্তিক ঠাকুরটির মতো। কিন্তু মুশকিল কি জানো? তালপুকুরের বিখ্যাত জাদুকর বিক্রমজিৎ একশো বছর আগে খুব অল্প বয়সেই মারা গেছে। লোকে দুঃখ করে বলে, বেঁচে থাকলে সে নাকি দুনিয়ার সব জাদুকরকে হারিয়ে দিত।''

''ধেৎ! এ সে নয়। এ খুব ভালো লোক। আমাকে একটা চকোলেট-বার দিয়েছে। এই দ্যাখো।''

গোরাং জিনিসটা দেখে বলল, ''বাহারি মোড়ক দেখছি।''

''তুমি নেবে?''

মাথা নেড়ে গোরাং বলে, ''না দিদি, ওসব জিনিসের মর্ম কি আমরা বুঝি? আমাদের মোটা চালের রাঙা ভাত আর লঙ্কা ছাড়া মুখে কিছু রোচে না। ওটা তুমিই খেও।''

''আমরা তো অচেনা লোকের দেওয়া জিনিস খাই না।''

''তবু রেখে দাও। ব্যাপারটা গোলমেলে বটে, কিন্তু তালিয়ে দেখলে হয়তো কোনও গুপ্তকথা বেরিয়ে আসবে। আজ উঠছি দিদি। চিরকুট আর চকোলেটটা লুকিয়ে রাখো। হাতছাড়া কোরো না।''

''ওমা! তুমি যাচ্ছ কোথায়? তোমাকে ভিক্ষেই দেওয়া হয়নি!''

''সে আর একদিন হবে'খন দিদি। যা একখানা গোলমেলে ভাবনা ঢুকিয়ে দিলে মাথায়। আগে তার জট ছাড়াই, তারপর ভিক্ষের কথা ভাবা যাবে।''

৪

বটুকবাবু নিবিষ্টমনে তাঁর পানাপুকুরে ছিপ ফেলে বসে আছেন। পুকুরে জল দেখা যায় না। জলের উপরে পুরু পানা ভেসে আছে। বটুকবাবুর আর কোনও দিকে নজর নেই। একদৃষ্টে যেখানে ছিপ ফেলেছেন, সেই জায়গায় চোখ রেখে বসে আছেন। তাঁর পাশে থাবা পেতে আছে বাঘা কুকুরটা। বটুকবাবুর কুকুর টবির ডাক শোনা যায় না। ঘেউ-ঘেউ করার কুকুরই নয়। শোনা যায়, বাড়িতে বাইরের অচেনা কেউ ঢুকলে নিঃশব্দে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে গলার নলি ছিঁড়ে দেয়। তেমন ঘটনা অবশ্য আজ অবধি ঘটেনি। তবে রটনা আছে বলে বটুকবাবুর বাড়িতে কেউ ঢোকে না। কুকুর যেমন ডাকে না, তেমনই বটুকবাবুও কারও সঙ্গে কথাবার্তা কন না। বাড়ির বাইরে তাঁকে কখনওই দেখা যায় না। তাই এ বাড়িতে যে কেউ থাকে, এটাই লোকে ভুলতে বসেছে। গভীর রাতে নাকি মাঝে-মাঝে বটুকবাবু বের হন। কোথায় যান, কী করেন, তা কেউ জানে না।

বটুক সামন্তর বাড়িটাও ভারি একটেরে, গাঁ থেকে একটু তফাতে, শিমূল আর জারুল গাছের একটা বনের মতো আছে, তার পিছনে। নিরালা জায়গা। চারদিকে দেড় মানুষ সমান উঁচু মজবুত পাঁচিল দিয়ে ঘেরা মস্ত বাগান। ভিতরে পুকুর, পুকুরের ধার ঘেঁষেই পুরোনো আমলের লাল রঙের দোতলা একটা বাড়ি। বুড়ো-বুড়িরা কেউ বেঁচে নেই। বটুক সামন্তর বুড়ি বিধবা এক পিসি কয়েক বছর আগেও বেঁচে ছিলেন। তিনি মরা ইস্তক ও বাড়িতে বটুক সামন্ত আর তাঁর বিচ্ছিরি কুকুরটা আর ভিখুরাম ছাড়া কেউ থাকে না। বাইরের ফটকের কাছে একটা খুপরি ঘরে খুনখুনে বুড়ো দরোয়ান ভিখুরাম থাকে বটে, তবে না থাকার মতোই। ভিখুরাম আগে বাজারহাট করত, এখন বুড়ো হয়েছে, সারাদিন শুয়ে-বসেই থাকে। বাইরে বেরোবার ক্ষমতা নেই। বাজারের ব্যাপারীদের সঙ্গে বটুকবাবুর বন্দোবস্ত আছে। তারা চাল, ডাল আর আনাজপাতি বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে পয়সা নিয়ে যায়।

বটুকবাবুর এই নিরালা বাড়ির ভিতরে কী হয় না হয়, তা আর কেউ না জানলেও মহিষবাহন টক্কেশ্বর জানে। টক্কেশ্বরের জানারও কিছু কারণ আছে। এক কারণ হল, তার খুব খিদে পায়। যখন-তখন এমন খিদে চাগিয়ে ওঠে যে, টক্কেশ্বরের তখন বক-রাক্ষুসে চেহারা। তবে মোষ চরিয়ে-চরিয়ে গাঁয়ের কোথায় কোন গাছে কোন ফল পাকছে বা ফলছে, তার সব খবর সে জানে। আর জানে, বটুকবাবুর বাগানে কাশীর পেয়ারা, আতা আর নোনা, বেল আর গ্রীষ্মকালে যা আম হয়, তেমনটা আর কোথাও নয়। তার আরও একটা সুবিধে হল, সে মোষের পিঠে ঘুরে বেড়ায়। ফলে, মোষের কাঁধে ভর করে বটুকবাবুর বাগানের পাঁচিলে উঠে পড়া তার কাছে জলভাত। দেওয়াল ঘেঁষেই কিছু গাছ আছে। টক্কেশ্বর নিঃশব্দে কাজ সারতে ভালোই জানে। এমনকী, কুকুরটাও সবসময় তার উপস্থিতি বুঝতে পারে না। অবশ্য সব দিন সমান যায় না। এক-একদিন কুকুরটা গন্ধ পেয়ে তেড়েও আসে। টক্কেশ্বর তখন টুক করে তার মোষের পিঠে নেমে পড়ে। কুকুরটা মাঝেমধ্যে তেড়ে এলেও বটুকবাবু কিন্তু কখনও ফিরেও তাকান না। একমনে মাছ ধরেন। কিন্তু একমাত্র টক্কেশ্বরই জানে, বটুকবাবু মাছও ধরেন না। সে কতদিন দেখেছে, বটুকবাবু ছিপে গেঁথে মাছ তুলে এনে মুখ থেকে বঁড়শি ছাড়িয়ে মাছকে আবার জলে ছেড়ে দেন। বটুকবাবু কি বোকা? ছেড়েই যদি দেবেন, তাহলে ধরেন কেন? এইটা অনেক ভেবেও টক্কেশ্বর আজও বুঝতে পারেনি।

টক্কেশ্বর তক্কেতক্কে অছে। একদিন ফাঁক পেলে সে বাগানে নেমে পুকুর থেকে একটা বড়সড় মাছ ধরে নিয়ে যাবে। ধরা শক্তও নয়। সে জানে, বটুকবাবুর পুকুরে মাছ গিজগিজ করছে। ছিপ বা জাল ফেলারও দরকার নেই, জলে নেমে সাপটে ধরে তুলে ফেললেই হয়। কিন্তু ফাঁক পাওয়াই মুশকিল। বটুকবাবু প্রায়

সারাদিনই পুকুরপাড়ে বসে থাকেন। বাপ-ঠাকুরদার টাকা ছিল বলে, বটুকবাবুকে কোনও কাজকর্ম করতে হয় না। কিন্তু তা বলে সারাদিন মাছ ধরা আর ছেড়ে দেওয়াটাই বা কী রকম কথা?

বটুকবাবুর পুকুরের মাছের গল্প একদিন সে বাড়িতে করেছিল। তাতে তার ঠাকুরদা বাঘু শিকারি গম্ভীর হয়ে বলেছিল, "তা তোর ও-বাড়িতে উঁকিঝুঁকি দেওয়ার দরকার কী? খবরদার, আর যাবি না!"

টক্কেশ্বর অবাক হয়ে বলে, "কেন দাদু, গেলে কী হয়?"

বাঘু শিকারি মাথা নেড়ে বললেন, "ও-বাড়িতে না যাওয়াই ভালো। বাড়িটা বন্ধন করা আছে। ভিতরে ঢুকলে বিপদ হতে পারে।"

"বাড়ি বন্ধন করা থাকলে কী হয় দাদু?"

"শুনেছি চোর-ডাকাত নাকি ঢুকতে পারে না। বটুকের ঠাকুরদা মস্ত তান্ত্রিক ছিল। ওরা সব মারণউচাটন জানে। কাজ কী তোর ও-বাড়িতে গিয়ে?"

"আমি তো বটুকবাবুর বাড়ির দেওয়ালে উঠে কত ফলপাকুড় পেড়ে খাই। কিছু হয় না তো!"

"খবরদার, আর ওদিক মাড়াসনি। বটুক বাণ মেরে দিলে শেষ হয়ে যাবি।"

টক্কেশ্বর হেসে বাঁচে না। বটুকবাবু বাণ মারবেন কী? বটুকবাবু তো একটা ভ্যাবলা লোক। যিনি পুকুরের মাছ ধরে-ধরে ছেড়ে দেন, তিনি ভ্যাবলা ছাড়া কী?

কথাটা বাড়িতে বেশ চাউর হওয়াতে টক্কেশ্বরের বাবা আর বড়বাবাও তাকে ডেকে বলে দিলেন, বটুকবাবুর বাড়িতে সে যেন আর না যায়।

টক্কেশ্বরের এটাই হয়েছে মুশকিল। তার বাড়িতে চার পুরুষ বর্তমান। মাথার উপর বাবা, বাবার মাথার উপর ঠাকুরদা, আবার ঠাকুরদার মাথার উপর বড়বাবা অর্থাৎ ঠাকুরদার বাবা এখনও বেঁচে। এত গার্জেন থাকায় টক্কেশ্বরের একটু অসুবিধে হয়। কিন্তু বটুকবাবুর বাড়িতে কী এমন জুজু আছে, সেটাই সে বুঝতে পারে না।

আর সেই জন্যই সে আরও বেশি করে ব্যাপারটা জানার জন্য উচাটন হয়। সে বীরপুরের বিখ্যাত বাসুলি মন্দিরে পুরুতঠাকুর পীতাম্বর ভট্টাচার্যের কাছেও গিয়েছিল।

"ঠাকুরমশাই, বাড়ি বন্ধন করা থাকলে কী হয়?"

পীতাম্বর মুখটা আঁশটে করে বললেন, "বন্ধন করলে চোর-ডাকাত আসে না, বদমাশরা তফাত থাকে।"

"সত্যি ঠাকুরমশাই?"

"সত্যি না মিথ্যে তা কী করে বলি বলো তো বাপু! কলিকালে কি আর মন্তরতন্তরের সেই জোর আছে? আমি তো আমার বাগানখানা শতেকবার বন্ধন করেছি। তাতে কি কিছু হল? রোজ গোরু-ছাগল ঢুকে গাছপাতা খেয়ে যাচ্ছে। মুলোটা, লাউটা চুরিও যাচ্ছে রোজ।"

"তবে যে শুনি বটুকবাবুর বাড়ি নাকি বন্ধন করা আছে। সেখানে ঢুকলে বিপদ হবে!"

পীতাম্বর বিরস মুখে বললেন, "বটুকের ঠাকুরদা তন্তরমন্তর জানত বটে। তা বন্ধন করে কোন কচুটা হল? বংশই তো লোপাট হতে বসেছে। বটুকটা তো সংসারধর্মই করল না, বারদু বিবাগী হয়ে ফের ফিরে এসে বাড়িতে থানা গেড়ে বসে আছে। তবে ওর আর বাড়ি বন্ধনের দরকারটাই বা কী? যা একখানা সড়ালে কুকুর পুষেছে, তাতেই তো চোর-ছ্যাঁচড়ারা তফাত থাকে। কলিকাল তো, তাই মন্তরে তেমন কাজ হয় না, বুঝলি? কুকুর পুষলে বেশি কাজ হয়। তা তোর মতলবটা কী বল তো, হঠাৎ বটুকের এত খতেন নিচ্ছিস কেন?"

টক্কেশ্বর একগাল হেসে বলল, "কী জানেন ঠাকুরমশাই, বটুকবাবুর পুকুরে একেবারে গিজগিজ করছে বড়-বড় মাছ। তাই ভাবছিলাম, অত মাছ তো আর বটুকবাবুর ভোগে লাগবে না। এক-আধটা যদি চুপিচুপি গিয়ে তুলে আনি!"

পীতাম্বরের চোখ চকচক করে উঠল। একমুখ হাসি নিয়ে বললেন, "ওরে শাস্ত্রেই আছে, বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়ং। তাতে চুরির দোষও অর্শাবে না। তা তুলবি বাবা? সত্যি?"

"তাই তো ইচ্ছে ঠাকুরমশাই।"

"তা তুলিস। মুড়োটা বরং ব্রাহ্মণভোজনে দিয়ে যাস।"

"তাই হবে ঠাকুরমশাই!"

মাছ চুরির মতলব আঁটলেও চট করে কাজে নামতে ঠিক সাহস হয়নি টক্কেশ্বরের। কারণ, বটুকবাবু লোকটা কেমন, সেটাই আন্দাজ করতে পারছে না সে। যারা কম কথা কয়, যারা গোমড়ামুখো, তাদের টক করে বোঝা যায় না কিনা। গাঁয়ের লোকও বটুককে চেনে বটে, কিন্তু তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই জানে না। ধরা পড়লে টক্কেশ্বরকে বটুকবাবু পেটাবেন না কোতল করবেন না ছেড়ে দেবেন, সেটাও আঁচ করতে পারছিল না সে। তবে মতলবটা মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ক'দিন ধরে।

আজ সকালে কোবরেজমশাই এসে উঠোনে বসে বড়বাবার নাড়ি দেখছেন। অখণ্ড মনোযোগ, চোখ বন্ধ, ধ্যানস্থ, তা কোবরেজমশাইয়ের বয়সও কিছু কম হল না। একশো বারো পেরিয়ে তেরো। বড়বাবা, অর্থাৎ হাবু শিকারির এই একশো তেরো পেরিয়ে চোদ্দ। অনেক সময়ই দেখা যায়, নাড়ি দেখতে-দেখতে কোবরেজমশাই আর হাবু শিকারি দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

আজও প্রায় সেই পরিস্থিতি। প্রায় আধঘণ্টা নাড়ি দেখার পর কোবরেজমশাই হঠাৎ টান হয়ে বসে বললেন, "নাঃ, শরীরে তো কোনও আবল্যি নেই হে। লক্ষণ সবই বেশ ভালো।"

হাবু শিকারি মিটমিট করে চেয়ে বললেন, "তাহলে খিদেটা হচ্ছে না কেন বলো তো! সকাল থেকেই পেটটা যেন ভরা-ভরা।"

টক্কেশ্বরের ঠাকুরমা ঘোমটার আড়াল থেকে বললেন, "তা খিদের আর দোষ কী? ফাঁক পেলে তো খিদে হবে? সকালে উঠে একগোছা রুটি খেয়েছেন। ঘণ্টাটাক পরেই এক কাঁসি ফেনাভাত, পেট তো ফুরসতই পাচ্ছে না!"

কোবরেজমশাই দু'ধারে ঘনঘন মাথা নেড়ে বললেন, "উঁহু, উঁহু, এ তো মোটে ভালো কথা নয় হে হাবু। বয়স হয়েছে, একথাটা মনে রেখো। এ বয়সে সংযম পালন না করলে যে ফ্যাসাদে পড়বে!"

হাবু শিকারি খেঁকিয়ে উঠে বললেন, "রাখো, রাখো, বলি তোমার বয়সটাও কি কম হল? এই তো সদানন্দের মেয়ের বিয়েতে সেদিন বারোটা মাছ আর পঁচিশটা রসগোল্লা খেলে! আমার অত-খাই-খাই নেই বাপু। সেদিন আমি মোটে দশখানা মাছ আর কুড়িটা রসগোল্লা খেলুম।"

"আর মিছে কথাগুলো বোলো না তো হাবু। দশ টুকরো মাছ খেলে কী হয়! সেই সঙ্গে যে এককাঁড়ি মাংস সাঁটালে। এই তো বউমা বলল, সকালে একগোছা রুটি খেয়েছ, তারপর ফেনাভাত, তবে খিদের অভাব হচ্ছে কোথায়?"

হাবু একটু লজ্জা-লজ্জা ভাব করে বলেন, "খেয়েছি নাকি? তা হবে হয়তো! আগে ভালো-মন্দ কিছু খেলে বেশ মনে থাকত। আজকাল মোটেই মনে থাকছে না কেন বলো তো?"

"সেটা মোটেই ভালো-মন্দের দোষ নয়, তোমার নোলার দোষ।"

হাবু শিকারি মাথা নেড়ে বলেন, "তা নয় তো কোবরেজ। আসলে ভালো-মন্দ কিছু জুটছে না বলেই মনে থাকছে না। রুটি আর ফেনাভাত কি ভালো-মন্দের মধ্যে পড়ে? ওসব ভুসিমাল খেয়ে-খেয়েই আমার অরুচিটা হয়েছে।"

"তা বলে রোজ মাংস-পোলাও খেতে চাও নাকি?"

"আহা, মাঝেমধ্যে হতে দোষ কী বলো! রোজ-রোজ গুচ্ছের ফেনাভাত, রুটি, শাকপাতা খেয়ে যে গায়ে মোটেই জোর হচ্ছে না। একটু ভালো পথ্যির নিদান দিয়ে যাও দিকিনি। এই ধরো, পাকা মাছ, মাংসের সুরুয়া, ঘন দুধ।"

''সেসব আর কোথায় পাবে বলো। যা জুটছে তাই ভগবানের দয়া বলে মনে কোরো।''

বুড়ো বয়সে বড়বাবামশাইয়ের একটু নোলা হয়েছে, একথা ঠিক। এ-বাড়িতে শাকপাতা, কচুঘেঁচু ছাড়া ভালো-মন্দ বড় একটা হয় না। বড়জোর কুচোমাছ। তাই বড়বাবুমশাইয়ের জন্য বড় কষ্ট হয় টক্কেশ্বরের। একশো চোদ্দ বছর বয়স মানুষটার, ক'দিনই বা আর আছেন। তাই টক্কেশ্বর ঠিক করল, এসপার-ওসপার যাই হোক, আজ বটুকবাবুর পুকুর থেকে একটা মাছ তুলে আনবে।

মোষ চরাতে বেরিয়ে আজও টক্কেশ্বর বটুকবাবুর বাড়ির দেওয়ালে উঠল। জালের তৈরি একটা থলি এনেছে সে। ফাঁক বুঝে মাছ ধরে কাঁধে ঝুলিয়ে নেবে। তারপর তাড়াতাড়ি গাছে উঠে দেওয়াল ডিঙিয়ে এ-পাশে নেমে পড়বে।

কপালটা ভালোই বলতে হবে তার। আজ দেওয়ালে উঠে দেখতে পেল, পুকুরের ধারে বটুকবাবুর জায়গাটা ফাঁকা। কেউ নেই। টক্কেশ্বর খুব সাবধানে ভালো করে চারধারটা দেখে নিল। না, বাগানে কোথাও বটুকবাবুকে দেখা যাচ্ছে না। কুকুরটারও হদিশ নেই। টক্কেশ্বর খুব ভালো করে চারধার দেখে নিয়ে মনে-মনে একটা হিসেব করল। গাছ বেয়ে পুকুরের কাছাকাছি গিয়ে যদি ঝপ করে নামা যায়, তাহলে মাছ ধরতে দু'মিনিটের বেশি লাগবে না। মাছসুদ্ধ গাছে ওঠা একটু কঠিন হবে বটে, কিন্তু পারা যাবে। একবার গাছে উঠে পড়তে পারলে আর চিন্তা নেই। সে বাঁদরের মতো গাছ বাইতে পারে।

সাহস করে সে সামনের গাছের ডালে উঠে সাবধানে এগোতে লাগল। শব্দটব্দ যাতে না হয়, তার জন্য খুব ধীরে-ধীরে আড়া ডাল বেছে-বেছে এগোতে লাগল। এ-কাজটা শক্ত নয়। আসল শক্ত কাজটা হল, নেমে ঝপ করে মাছ তুলে তাড়াতাড়ি গাছে উঠে পড়া। খুব বড় মাছ হলে অবশ্য বিপদে পড়তে হবে। তার ইচ্ছে, মাঝারি আট-দশ কেজি ওজনের একটা মাছ ধরা। কিন্তু তাড়াহুড়োয় বাছাবাছির সময় তো থাকবে না। সেইটেই বিপদের কথা।

পুকুরের কাছ বরাবর চলে এল টক্কেশ্বর। নামার জন্য ঝুল খেতে পা নামিয়েও সে শেষবার চারদিকটা নিরখ-পরখ করার জন্য এদিক-ওদিক তাকাতে গিয়ে আচমকা আপাদমস্তক শিউরে উঠল। পুকুরের দক্ষিণ দিকে একটা ঝোপের সামনে ফুটফুটে একটা আট-দশ বছরের মেয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে নীল রঙের ফ্রক, পায়ে জুতো-মোজা, সুন্দর করে চুল আঁচড়ানো, তাতে আবার কালো রিবন। হাসি-হাসি মুখ করে মেয়েটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

টক্কেশ্বর এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে, আর-একটু হলে তার শিথিল হাত গাছের ডাল থেকে ফসকে যেত। কোনওরকমে গাছের ডালটা ধরে পা দু'টো উপরে তুলে আড়াল হল সে। বটুকবাবু বাড়িতে কোনও বাচ্চা মেয়ে নেই, থাকার কথাও নয়। তাহলে কি এতদিন বাদে এ-বাড়িতে বটুক সামন্তর কোনও আত্মীয়স্বজন এসেছে? তাই হবে হয়তো। নইলে বটুকবাবুর বাড়িতে খুনিয়া কুকুর আছে জেনেও কোনও বাচ্চা মেয়ে কি ঢুকতে সাহস করবে? মেয়েটা একা অত স্থির হয়ে দাঁড়িয়েই বা আছে কেন, তাও বুঝতে পারছিল না টক্কেশ্বর। সে শুধু অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না টক্কেশ্বরকে। আচমকা কোথায় একটা কীসের শব্দ হল। সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্যুতের গতিতে আর একটা ঝোপের আড়াল থেকে মস্ত কুকুরটা বেরিয়ে এল।

চোখের পলক ফেলার সময় পেল না টক্কেশ্বর। কুকুরটা সোজা মেয়েটার দিকে ছুটে এসে একটু দূর থেকে একটা লাফ দিয়ে পড়েই মেয়েটার গলা কামড়ে ধরে চিত করে ফেলে দিল মাটিতে। তারপর ঝটকা মেরে-মেরে ছিঁড়তে লাগল গলার নলি।

আতঙ্কে চিৎকার করেছিল টক্কেশ্বর। কিন্তু তার ভাগ্য ভালো, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয়নি। চোখ বুজে ফেলেছিল সে। এরকম ভয়ংকর দৃশ্য সে জীবনে দ্যাখেনি। আতঙ্কে হিম হয়ে গিয়েছে তার শরীর। কাঠ হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে সে আর একটা শিসের শব্দ শুনে চোখ চাইল। দেখল কুকুরটা মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে ফের যেখান থেকে এসেছিল, সেখানে ফিরে গেল। টক্কেশ্বর দেখল, মেয়েটা স্থির হয়ে পড়ে আছে। নড়ছে

না। কুকুরটা যখন তেড়ে আসছিল, তখনও মেয়েটা নড়েনি বা পালানোর চেষ্টা করেনি বা চেঁচায়নি। এটা ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার বলে মনে হল টক্কেশ্বরের।

কিছু করার নেই বলে গাছেই বসে রইল টক্কেশ্বর। একটু বাদে দেখা গেল, বটুকবাবু খুব ক্লান্ত মুখে ধীরে সুস্থে হেঁটে এসে মেয়েটাকে তুলে দাঁড় করিয়ে কিছু দেখলেন মন দিয়ে। মুখে কোনও ভাবান্তর নেই। আর টক্কেশ্বর খুব অবাক হয়ে দেখল, মেয়েটার গলায় একটা মস্ত গর্ত হয়ে গেলেও একটু রক্ত পড়ছে না। ভালো করে দেখে টক্কেশ্বর বুঝল, ওটা কোনও মেয়ে নয়। একটা পুতুল। তবে বেশ বড়সড় পুতুল।

কিন্তু পুতুলটার উপর কুকুর লেলিয়ে দেওয়ার অর্থ কী? ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে পারল না টক্কেশ্বর। তবে নিজের ভাগ্যকে সে ধন্যবাদ দিল। ভাগ্যিস আহাম্মকের মতো মাছ ধরতে নেমে পড়েনি!

বটুকবাবু পুতুলটা তুলে নিয়ে ধীরেসুস্থে বাড়িতে গিয়ে ঢুকলেন। পিছন-পিছন তাঁর কুকুরটাও।

টক্কেশ্বর ধীরে-ধীরে গাছের ডাল বেয়ে-বেয়ে ফিরে এল। তারপর পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। কিন্তু মনে বড্ড খটকা লেগে আছে। ব্যাপারটা কী হল, কেন হল, তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না সে। একটা পুতুলের উপর তো কারও কোনও আক্রোশ থাকতে পারে না! বড্ড চিন্তায় পড়ে গিয়ে টক্কেশ্বর ভারি আনমনা রইল সারা দিনমান।

বটুকবাবুর বাড়ি যেসব ব্যাপারীরা চাল, ডাল, তেল, মশলা আর আনাজ পৌঁছে দেয়, তাদের সবাইকেই চেনে টক্কেশ্বর। বীরপুর বাজারের গোপাল পুরকাইত তাদের একজন। তার বেশ বড় মুদিখানার দোকান। টক্কেশ্বরের সঙ্গে ভাবসাব আছে। কারণ, গোপালের আবার মোষের দুধ ছাড়া চলে না আর টক্কেশ্বরের বাড়ি থেকে সেই মোষের দুধ যায়।

সন্ধেবেলা টক্কেশ্বর গিয়ে গোপাল পুরকাইতের দোকানে হানা দিল। দোকানে ভিড়ভাট্টা নেই। দু-চারজন বসে আছে বটে, তবে তারা খদ্দের নয়। গল্পসল্প করতে আসে। গোপাল বসে খাতায় বিকিকিনির হিসেব টুকে রাখছিল। তাকে দেখে বলল, "কী খবর রে, টক্কা?"

টক্কেশ্বর মাথাটাথা চুলকে বলল, "আজ্ঞে, একটা ব্যাপার জানতে এলাম খুড়োমশাই।"

"কী ব্যাপার?"

"আজ একটা ব্যাপার দেখে মনে বড় খটকা লাগছে।"

"বলে ফ্যাল।"

"আজ দেখলাম বটুকবাবু তাঁর শিকারি কুকুরটাকে একটা মেয়ে পুতুলের উপর লেলিয়ে দিলেন। কুকুরটা গিয়ে পুতুলটার গলার নলি ছিঁড়ে ফেলল। পুতুলটা কিন্তু ভারি সুন্দর আর প্রমাণ সাইজের।"

"ওটা পুতুল নয় রে, ওকে বলে ম্যানিকুইন। পোশাকের দোকানে সাজিয়ে রাখে শো-কেসে। তা তুই আবার বটুকবাবুর বাড়িতে ঢুকতে গেলি কেন? প্রাণের ভয় নেই! ও যা কুকুর, এক কামড়ে শেষ করে দেবে যে!"

"বাড়িতে ঢুকিনি খুড়োমশাই, দেওয়ালের উপর দিয়ে একটু উঁকি দিয়ে বাগানটা দেখছিলুম। তখনই এই ব্যাপার। তাই ভাবলাম, ব্যাপারটা কী হল, তা আপনাকে একবার জিগ্যেস করে যাই।"

"বাড়িতে উঁকিঝুঁকি দেওয়া বটুকবাবু কিন্তু পছন্দ করেন না। আর ও যা দেখেছিস, তা তেমন কিছু নয়। ভালো জাতের কুকুর তো, তাই বোধ হয় মাঝে-মাঝে ট্রেনিং দিয়ে রাখেন।"

এবার জলের মতো বুঝতে পারল টক্কেশ্বর। একগাল হেসে বলল, "তবে তাই হবে বোধ হয়। আমার কেমন খটকা লেগেছিল বলে আপনার কাছে জানতে এলুম।"

টক্কেশ্বর যখন চলে আসছিল তখন দোকানে বসা লোকদের মধ্যে একজন তার পিছু নিয়ে এসে ধরে ফেলল, "বলি ও টক্কেশ্বর, একটু কথা ছিল যে!"

টক্কেশ্বর লোকটাকে চেনে। গোরাং দাস। গোরাং দাস ভিক্ষে করে বটে, কিন্তু তাকে কেউ ভিখিরি বলে মোটেই মনে করে না। বরং যেখানে যায়, সেখানেই গোরাং খাতির পায়।

''কী কথা গোরাংদা?''

''ঘটনাটা একটু খোলসা করে বলবি ভাই?''

তা বলল টক্কেশ্বর, এমনকী মাছ চুরির মতলবের কথাও চেপে রাখল না।

সব শুনে গোরাং বলল, ''বটুকবাবু তোকে দেখতে পায়নি তো?''

''না। আমি তো গাছের উপর ছিলুম।''

''কথাটা পাঁচকান করতে যাস না। তোর বিপদ হতে পারে।''

টক্কেশ্বর অবাক হয়ে বলে, ''আমার বিপদ হবে কেন?''

''তা জানি না। আরও একটা কথা।''

''কী কথা গোরাংদা?''

''আর ভুলেও বটুকবাবুর পুকুরের মাছ ধরার মতলব করিস না। আজ বরাতজোরে বেঁচে গেছিস বটে, কিন্তু রোজ-রোজ তো বরাত তোকে দেখবে না।''

''তা বটে। কিন্তু পুকুরে যে অনেক মাছ গো গোরাংদা। কিলবিল করছে যে!''

''শোন বোকা, বটুকবাবু কুকুরের মতো ওই মাছগুলোকেও পোষে। কখনও নিজের পুকুরের মাছ খায় না, বাজারের মাছের ব্যাপারী যোগেন রোজ মাছ পৌঁছে দিয়ে আসে। বুঝলি কিছু? পুকুরের মাছে হাত পড়লে কিন্তু বিপদ আছে।''

''বুঝেছি গোরাংদা।''

টক্কেশ্বরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গোরাং পা চালিয়ে চরণডাঙার দিকে হাঁটা দিল। তার মনে হচ্ছে, আর বিশেষ সময় নেই। তাড়াতাড়ি না করলে কী থেকে কী হয়ে যায় কে জানে বাবা! তবে তার মনটা বড় কু গাইছে।

৫

দুপুর দেড়টা বেজে যাওয়ার পরও যখন প্রাণগোবিন্দবাবু ফিরলেন না তখন সুরবালা খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। বুড়ো হয়েছেন, তার উপর আলাভোলা মানুষ, কোথায় কী হল কে জানে! দুশ্চিন্তায় বারবার ঘড়ি দেখছেন আর ঘর-বার করছেন। শেষ অবধি পুলিশে খবর দিতে হবে কিনা তাও ভাবছেন। ঠিক এমন সময় একটা চাষাভুষো চেহারার লোক এল। একমুখ দাড়িগোঁফ, মাথায় একটা গামছা বাঁধা। গায়ে তুষের চাদর। বলল, ''আজ্ঞে, বাবু পাঠালেন।''

সুরবালা ঝেঁঝে উঠে বললেন, ''তা বাবুটি কোথায়?''

লোকটা জবাব না দিয়ে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে সুরবালার হাতে দিয়ে বলল, ''আজ্ঞে, এতে সব লেখা আছে।''

সুরবালা তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলে পড়লেন। পেনসিলে লেখা,

কল্যাণীয়াসু, জরুরি কাজে বাহির হইয়াছি। একটা ভালো শিকারের সন্ধান আসিয়াছে। বেশ মোটা টাকা আদায় হইবে বলিয়া মনে হয়। এরূপ চলিতে থাকিলে অচিরেই কয়েক লক্ষ টাকা আয়ের সম্ভাবনা। চিন্তা করিও না। ফিরিতে বিলম্ব হইবে।

ইতি—
প্রাণগোবিন্দ রায়

সুরবালা চিঠি পড়ে বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

পাশ থেকে সরু গলায় পিউ জিগ্যেস করল, ''দাদু কী লিখেছেন ঠাকুরমা?''

সুরবালা নাতনির দিকে রোষকষায়িত লোচনে চেয়ে বললেন,

''তোমার দাদু অধঃপাতে গেছে ভাই। ছিঃ ছিঃ, বুড়ো বয়সে যে কারও এমন মতিচ্ছন্ন হয়, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।''

পিউ চিঠিটা ঠাকুরমার হাত থেকে নিয়ে পড়তে লাগল।

সুরবালা লোকটাকে কড়া গলায় জিগ্যেস করলেন, ''তোমার বাবুটি এখন কোথায় বলতে পার?''

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, ''আজ্ঞে না। তবে বীরপুরের দিকেই গেলেন মনে হল।''

''বীরপুর! সেটা আবার কোথায়?''

''বেশি দূর নয় মা-ঠাকরুণ। আপনাদের ছাদে উঠে উত্তর দিকে চাইলে বীরপুরের বাসুলি মন্দিরের চুড়ো দেখা যায়। মাইলটাকও হবে না।''

''তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা হল?''

''আজ্ঞে, মাঠে কাজ করছিলাম, বাবু আল ধরে হনহন করে যাচ্ছিলেন। আমাকে ডেকে চিঠি আর পাঁচটা টাকা দিলেন। বললেন, জরুরি কাজে যাচ্ছেন, চিঠিটা যেন পৌঁছে দিই। তাহলে বিদেয় হই মা-ঠাকরুণ? হাল-গোরু সব মাঠে ছেড়ে এসেছি কিনা।''

লোকটার কাছ থেকে আর কোনও খবর পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে সুরবালা বললেন, ''যাও, কিন্তু যদি বাবুর দেখা পাও তো বোলো, যেন এক্ষুনি বাড়িতে ফিরে আসে। বাড়িতে সবাই খুব চিন্তা করছে।''

লোকটা ঘাড় কাত করে বলল, ''যে আজ্ঞে।''

একটু যেন জোর কদমেই চলে গেল লোকটা।

চিঠিটা কষ্ট করে পড়তে-পড়তে পিউ হঠাৎ বলল, ''ঠাকুরমা, দাদু কি বাংলা লিখতে পারে?''

এ-কথায় সুরবালা খুব আতান্তরে পড়ে গেলেন। প্রাণগোবিন্দর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর থেকে তাঁরা কখনও পরস্পরের কাছ থেকে দূরে থাকেননি। কাজেই প্রাণগোবিন্দ কখনও চিঠিপত্রও লেখেননি সুরবালাকে।

সুরবালা বললেন, ''তা পারবে না কেন? পঞ্জিকাটঞ্জিকা তো পড়ে।''

পিউ মাথা নেড়ে বলে, ''দাদু পঞ্জিকাও পড়তে পারে না। খুব ঠেকে-ঠেকে পড়ে। আর সেদিন আমাকে জিগ্যেস করছিল, 'ঠ'-এর টিকিটা ডান দিকে না বাঁ-দিকে। একটুআধটু পড়তে পারলেও দাদু কিন্তু বাংলা লিখতে পারে না। কী করেই বা পারবে বলো, দাদু তো দেরাদুনে মানুষ!''

সুরবালা ভেবে দেখলেন, কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। বাস্তবিক, প্রাণগোবিন্দরা বরাবর দেরাদুনে থেকেছেন। প্রাণগোবিন্দকে তিনি বরাবর ইংরেজিতেই লেখাপড়া করতে দেখেছেন। বাংলা লিখতে দেখেছেন বলে মনে পড়ল না। প্রাণগোবিন্দর বাংলা হাতের লেখাও তিনি চেনেন না।

চিঠিটা নিয়ে ভালো করে দেখলেন সুরবালা। মেয়েলি ছাঁচের গোটা-গোটা লেখা। পেনসিলে লেখা বলে যেন আবছাও।

''তুই দাদুর হাতের লেখা চিনিস?''

''ইংরেজি হাতের লেখা চিনি।''

সুরবালা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, ''ধরে-ধরে লিখেছে, ও তোর দাদুরই হাতের লেখা। তাছাড়া আর কে চিঠি পাঠাবে?''

''দাদু আসবে না ঠাকুরমা?''

''তার কি আর বাড়ির দিকে মন আছে রে! তাকে ভূতে পেয়েছে।''

উদ্বেগটা একটু কমল বটে, কিন্তু মনটা শান্ত হল না। ওরকম শান্তশিষ্ট, নিরীহ, সজ্জন একজন মানুষ হঠাৎ এরকম হন্যে হয়ে উঠল কেন, তা যেন কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না! এতকাল ঘর করেও তিনি কি সত্যিই প্রাণগোবিন্দকে একটুও চিনতে পারেননি?

হলধরকে ডেকে সুরবালা জিগ্যেস করলেন, "হ্যাঁ রে হলধর, বীরপুর গ্রামটা চিনিস?"

হলধর অবাক হয় বলে, "তা চিনব না! এই তো এক দৌড়ের রাস্তা।"

"তা সেখানে কী আছে বল তো!"

"তা সে অনেক কিছু আছে। বাসুলি মন্দিরের কথা তো সবাই জানে, ভারী জাগ্রত দেবতা। তারপর ধরুন, খালধারে এখন শিবরাত্তির মেলাও চলছে। এই এক-দেড়মাস ধরে চলে। খুব বড় মেলা। সার্কাসের তাঁবুটাবুও পড়েছে দেখে এসেছি।"

"যেতে কতক্ষণ লাগে?"

হেসে গ্যালগ্যালে হয়ে মাথা নেড়ে হলধর বলে, "সে মোটে দূরই নয়। নসিগঞ্জের গা-ঘেঁষেই বীরপুর। কালু শেখ একখানা বিড়ি ধরিয়ে নসিগঞ্জ থেকে হাঁটা দেয়। সেই বিড়ি বীরপুরে গিয়ে শেষ হয়। ছাদে উঠে উত্তর দিকে তাকালেই দেখতে পারেন, বীরপুরের বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। কেন মা, যাবেন নাকি? গেলে বলুন, ভ্যানগাড়ি ভাড়া করে নিয়ে আসি। দশ মিনিটে পৌঁছে দেবে।"

"তুই যাবি বাবা? গিয়ে লোকটাকে পাকড়াও করে নিয়ে আসবি?"

মাথা চুলকে হলধর বলে, "কর্তাবাবু কি বীরপুরে গেলেন নাকি মা?"

"সেরকমই তো শুনছি। একবার যা না বাবা।"

পিউ বলল, "আমিও যাব ঠাকুরমা! আমি ঠিক দাদুকে ধরে আনব।"

সুরবালা মাথা নেড়ে বললেন, "না ভাই, তোমার গিয়ে কাজ নেই। ওসব গন্ডগোলের মধ্যে তোমার না যাওয়াই ভালো। হলধর গিয়ে আগে মানুষটার খবর আনুক। পরে দরকার হলে আমরা সবাই যাব।"

পিউ আর কিছু বলল না। চুপটি করে সিঁড়ি বেয়ে ছাদের উপর উঠে এল। তারপর রেলিং ধরে বীরপুরের দিকে চেয়ে রইল। অনেক গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে একটা মন্দিরের চুড়ো দেখা যাচ্ছে। আর কিছু বাড়িঘর। সামনে একটা প্রকাণ্ড খেত, কিছু ঝোপঝাড়। না, বীরপুর খুব দূরে নয়। পিউ দেখতে পেল, আকাশে একটা সাদা রঙের ঘুড়ি উড়ছে। মস্ত বড় ঘুড়ি। কিছুক্ষণ ঘুড়িটার দিকে চেয়ে থেকে সে এসে চিলেকোঠায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে রইল। চুপচাপ বসে অনেকক্ষণ ভাবল সে। ঠাকুরমার কথাগুলো সে বুঝতে পারেনি। দাদু একটা কোনও দুষ্টুমি করেছেন নাকি? কিন্তু তার দাদু তো ভীষণ ভুলোমনের মানুষ, দুষ্টুমি করবেনই বা কী করে? এসবই খুব ভাবছে সে। ভাবতে-ভাবতে চকোলেটের মোড়কটা খুলে চিরকুটটা বের করল। তাদের কী বিপদ হবে তাও সে বুঝতে পারছে না।

চিরকুটটা খুলে ভারি অবাক হয়ে গেল পিউ। সকালেও চিরকুটটাতে পেনসিলের লেখাটা ছিল। কিন্তু এখন নেই তো! চিরকুটটা তো একদম সাদা! লেখাটা কী করে ভ্যানিশ হয়ে গেল? এটাও কি ম্যাজিক?

হঠাৎ তার মনে হল চিরকুটে যে লেখাটা ছিল, সেটার সঙ্গে ঠাকুরমাকে লেখা দাদুর চিঠির হাতের লেখাটা অনেকটা একরকমের। গোটা-গোটা অক্ষরে লেখা। মনে হতেই পিউ সিঁড়ি দিয়ে নেমে দৌড়ে গিয়ে বারান্দার টেবিলে পড়ে-থাকা দাদুর চিঠিটা নিয়ে ফের ছাদে উঠে এল। চিঠিটা খুলে দেখল, পেনসিলের লেখাটা অনেকটাই আবছা হয়ে গিয়েছে। কোনও-কোনও অক্ষর মুছেও গিয়েছে।

পিউ কিছু বুঝতে না পেরে ভারি অবাক হয়ে বসে রইল। ম্যাজিশিয়ান বিক্রমজিৎ-এর চিঠির সঙ্গে দাদুর চিঠির হাতের লেখা একরকম হবে কেন?

খুবই অন্যমনস্ক ছিল পিউ। হঠাৎ ঠক করে একটা শব্দ হওয়ায় চোখ তুলে দেখল, সাদা ঘুড়িটা তাদের ছাদে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। পিউ তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘুড়িটা কুড়িয়ে নিল। চারদিকে চেয়ে ঘুড়িটা কে ওড়াচ্ছে, তা দেখতে পেল না। সুতো টেনে দেখল, ঘুড়িটা ভো-কাট্টা হয়ে উড়ে এসে পড়েনি। ভো-কাট্টা হলে সুতো ছেড়ে আসত। ঘুড়িটা ফের উড়িয়ে দিবে কিনা ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ তার চোখ পড়ল, ঘুড়ির গায়ে কী যেন লেখা আছে। পেনসিলের লেখা। ঠিক একই রকম গোটা-গোটা হরফে। লেখা আছে,

''বীরপুরে এখন একশো মজা। খেলনার দোকান, পুতুলনাচ, কাচের চুড়ি, ম্যাজিক, সার্কাস, নাটক, মোচার চপ, মাংসের ঘুগনি কী চাই? দাদু এখানে। ছুটে চলে এসো।''

পিউ ভীষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল। অন্য কিছু নয়, তার ভীষণ দাদুর কাছে যেতে ইচ্ছে করছে। তার অমন ভালো দাদুটা নাকি খারাপ হয়ে গিয়েছেন। পিউ সে কথা মোটেই বিশ্বাস করে না। দাদু কক্ষনো খারাপ হতে পারেন না। সে গিয়ে দাদুকে ঠিক নিয়ে আসবে।

৬

সন্ধে-রাত্তিরে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে ভিতরে বসে হিসেব সেরে রাখছিল গোপাল পুরকাইত। এমন সময় দোকানের দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ হল।

''কে?''

''এই আমরা, কিছু মালপত্র নিতে এসেছি।''

''কী মাল?''

''পাইকিরি মালই নেব হে। দশ-বিশ বস্তা চাল-ডাল।''

গোপাল শশব্যস্তে উঠে দরজা খুলে দিল। বড় খদ্দের।

দু'জন মুশকো চেহারার লোক দোকানে ঢুকল। একজন দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, ''ব্যস্ত হোয়ো না গোপাল, কথা আছে।''

গোপাল পরিস্থিতিটা ভালো বলে মনে করল না। ঘাবড়ে গিয়ে বলল, ''কী চাই তোমাদের? আমি কিন্তু...''

প্রথমজন হাত তুলে তাকে থামিয়ে বলল, ''বলেছি তো, কথা আছে। চুপ করে বোসো।''

গোপাল ফ্যাকাসে মুখে তার নীচু তক্তপোশে বসল।

প্রথম লোকটা বলল, ''কারবার কেমন চলছে গোপাল?''

গোপাল বলল, ''কোনওরকমে চলে। লুটপাট করতে এসে থাকলে কিন্তু লাভ হবে না। সামান্য ব্যবসা আমার।''

''তোমার মতো ছোটখাটো ব্যাপারীর গদি লুঠ করে কি মানমর্যাদা খোয়াব? আমরা গোকুল বিশ্বাসের লোক।''

গোপাল প্রমাদ গুনল। ''গোকুল বিশ্বাস!''

''চেনো তাকে?''

গোপাল ঘাড় নেড়ে বলল, ''কে না চেনে?''

''আমরা ছোটখাটো কাজ করি না।''

গোপাল চুপ করে রইল।

''এখন যা বলছি, খুব মন দিয়ে শোনো। তারপর ঠিকঠাক জবাব দাও।''

গোপাল এই শীতেও ঘামতে লাগল।

গোকুল বিশ্বাসের একটা আদরের গোরু আছে, জানো? দুধের মতো সাদা রং, বাঁ-দিকের দাবনায় ত্রিশূলের ছাপ। খুব সুলক্ষণা গোরু। জানো?''

''না তো!''

''মিথ্যে কথা বলে কিন্তু পার পাবে না। পেট থেকে কথা টেনে বের করতে আমরা জানি। তা সেসব আসুরিক ব্যাপারের দরকার আছে কি?''

গোপাল বিবর্ণ হয়ে বলল, ''জানি।''

''ঠিক দু'দিন আগে মাঠ থেকে গোরুটা চুরি যায়।''

গোপাল একটু গলাখাঁকারি দিয়ে কিছু বলতে গিয়েও বলল না।

''আদরের গোরুটা চুরি হয়ে যাওয়ায় গোকুল বিশ্বাস খুব ভেঙে পড়ে। শুধু আদরেরই নয়, গোরুটা ভীষণ পয়া। ওই গরুটা আসার পর থেকেই গোকুল বিশ্বাসের ব্যবসা দ্বিগুণ হয়েছে। এসব খবর আশপাশের গাঁয়ে সবাই জানে। তুমি জানো না, এ তো হতে পারে না। কী বলো?''

''শুনেছি।''

''বেশ কথা। এবার খুব ভেবেচিন্তে আমার কথার জবাব দিও।''

গোপাল অস্বস্তি বোধ করছে। উসখুস করে বলল, ''কী জানতে চাও?''

''গোরুটা কে চুরি করেছিল?''

''তা কি আমার জানার কথা?''

''তুমি ছাড়া আর কে জানবে?''

''গোপাল সিঁটিয়ে গিয়ে বলল, 'বিশ্বাস করো, আমি জানি না।''

''শোনো গোপাল, তোমার চার ছেলে আর গোটাচারেক কর্মচারী আছে। অন্য সব কাজের লোকও আছে। লোকবলের অভাব নেই। তাদের সব ক'জনকে যদি ধরে একে-একে পেটানো হয়, তাহলে সত্যি কথাটা বেরোতে দেরি হবে না। সবার আগে কিন্তু তোমার চার ছেলেকে পেটাই করা হবে। আমাদের দিয়ে অত মেহনত করাবে কেন?''

গোপাল ভয় পেয়ে আমতা-আমতা করে বলল, ''যে চুরি করেছে তার দোষ নেই। সে হুকুম তামিল করেছে বই তো নয়।''

''লোকটা কে?''

''আমার ছেলে জয়চাঁদ।''

''আর গোকুল বিশ্বাসের জানালায় টোকা দিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকার হুকুমনামা জারি করে এসেছিল কে? সেও কি জয়চাঁদ?''

''হ্যাঁ। কিন্তু তার দোষ নেই।''

''দোষের কথা তো হচ্ছে না। আমরা সত্যি কথাটা জানতে চাইছি।''

গোপাল কাঁপতে-কাঁপতে বলল, ''দ্যাখো ভাই, আমি সাতে-পাঁচে থাকি না। খোঁজ নিলেই দেখবে, আমার ছেলেরাও কেউ খারাপ নয়। তাদের কোনও বদনামও নেই। জয়চাঁদ একটু ডাকাবুকো বটে, কিন্তু কক্ষনো কোনও খারাপ কাজ সে করে না।''

''জয়চাঁদের কপালের বাঁ-দিকে একটা আব আছে, না?''

''হ্যাঁ, কিন্তু, যা হয়েছে তার জন্য আমি নাকে খত দিতে রাজি। আমার ছেলেটাকে প্রাণে মেরো না।''

''তুমি তাহলে বলতে চাও জয়চাঁদ নির্দোষ?''

''একেবারে নির্দোষ।''

''তাহলে কি ধরে নেব, গোরু চুরি করা বা মুক্তিপণ আদায় করা এগুলো কোনও দোষের মধ্যে পড়ে না?''

''তা বলিনি।''

''তবে কী বলছ?''

''যা করেছে তা মতলব এঁটে করেনি। ওই যে বললাম, হুকুম তামিল না করে উপায় ছিল না। মুক্তিপণ তো আর নিজের জন্য চায়নি।''

''কার জন্য চেয়েছিল?''

''প্রাণগোবিন্দ রায়ের জন্য।''

''হুকুমটা কি প্রাণগোবিন্দবাবুই দিয়েছিলেন?''

''এ ব্যাপারে আমার কিছু বলা বারণ।''

''ঠিক আছে, বোলো না। আমরা জয়চাঁদকে তুলে নিয়ে যাচ্ছি। যা বলার সে-ই বলবে।'' বলেই উঠতে যাচ্ছিল তারা।

গোপাল আঁতকে উঠে বলল, ''দাঁড়াও, আমিই বলছি।''

''বলো।''

''প্রাণগোবিন্দবাবুর হুকুমে এ কাজ হয়নি।''

''সেটা আমরা জানি গোপাল। আগে জানতাম না, এখন জেনেছি। এবার বলো, কার হুকুম?''

গোপাল হাল ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল। লোক দুটো ব্যস্ত হল না। স্থির হয়ে বসে রইল বেঞ্চিতে।

বেশ কিছুটা বাদে গোপাল সামলে উঠল। ধুতির খুঁটে চোখ মুছল। তারপর ধরা গলায় বলল, ''তাঁর কাছে আমার টিকি বাঁধা। আমার জমিজিরেত, ব্যবসার মূলধন সব তাঁর কাছে বাঁধা। যদি বলি, তাহলে আমি শেষ হয়ে যাব।''

''তুমি না বললেও আমরা জানি। কিন্তু তবু আমরা তোমার মুখেই শুনতে চাই। বলো।''

''যদি জানোই তবে আর আমাকে দিয়ে বলাতে চাও কেন?''

''তার কারণ, আমরা যাচাই করে দেখতে চাই, আমরা যা আন্দাজ করেছি আর যা শুনেছি, তা সত্যি কিনা।''

গোপাল ধরা গলায় বলল, ''পরশুদিনই বটুকবাবু আমাকে কাজটা করতে বলেন। কেন কোন কাজ করতে হবে তা জানতে চাওয়ার উপায় নেই। বটুকবাবু এমনিতে চুপচাপ, কিন্তু সামান্য বেয়াদপি দেখলে এমন সাংঘাতিক রেগে যান, যেন খুনও করতে পারেন। ভয়ে আমি কখনও কিছু জিজ্ঞেসও করতে পারি না। তার উপর উনি আমার অন্নদাতা। অভাবে-কষ্টে যখন সংসার ভেসে যেতে বসেছিল, তখন উনি হাল না ধরলে এতদিনে মরেই যেতাম।''

''বটুকবাবুর রাগ কেমন?''

''অতি সাংঘাতিক। যখন রেগে ওঠেন, তখন চোখ-মুখের চেহারাই পালটে যায়। চোখে যেন বাঘের দৃষ্টি।''

''একটা কথা। উনি যখন গোরুটা প্রাণগোবিন্দবাবুর গোয়ালে রেখে আসতে বললেন, আর প্রাণগোবিন্দবাবুর কাছে মুক্তিপণের টাকা পৌঁছে দিতে বললেন, তখন তোমার খটকা লাগেনি?''

''লেগেছিল। কিন্তু খুব বেশি তলিয়ে ভাবিনি। একবার মনে হল, প্রাণগোবিন্দবাবুর সঙ্গে ওঁর বোধ হয় কোনও বন্দোবস্ত হয়েছে। শত হলেও উনি একসময় প্রাণগোবিন্দবাবুর ছাত্র ছিলেন, হয়তো তখন থেকেই ভাবসাব। আর তাই থেকেই এই বন্দোবস্ত।''

''উনি যে প্রাণগোবিন্দ রায়ের ছাত্র ছিলেন, তা কী করে জানলে?''

''প্রাণগোবিন্দ রায় যখন রিটায়ার করে দেশের বাড়িতে থাকতে এলেন, তখন খবরটা শুনে একদিন বটুকবাবু বলেছিলেন, মাস্টারমশাই তাহলে এলেন! ভালোই হল।''

''তাহলে তোমার তেমন খটকা লাগেনি?''

''না।''

''প্রাণগোবিন্দবাবুর বাড়িতে কি ওঁর যাতায়াত ছিল?''

''না। বটুকবাবু কোথাও যান না।''

''তাহলে প্রাণগোবিন্দবাবুর সঙ্গে ওঁর বন্দোবস্ত হয় কী করে?''

''বললাম তো, ওটা নেহাত একটা আন্দাজ।''

''বটুকবাবুর একটা ভয়ংকর কুকুর আছে, তাই না?''

''ও বাবা! খুনে কুকুর!''

''শোনো গোপাল, গোকুল বিশ্বাসের সঙ্গে গণ্ডগোল করে আজ অবধি কারও সুবিধে হয়নি।''

''আজ্ঞে, গোকুলবাবুর সঙ্গে আমার তো কোনও গণ্ডগোল নেই! জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে বিবাহ আহাম্মক ছাড়া কেউ করে? আমরা যা করেছি তা প্রাণের দায়ে।''

''তাহলে বটুকবাবু এ কাজটা কেন করলেন বলে তোমার মনে হয়?''

''তা কী করে বলব। বড়-বড় মানুষের কত খেয়াল থাকে।''

''তাতে কী হল তা জানো? প্রাণগোবিন্দবাবুর মতো একজন মানী লোকের গায়ে গোরুচোরের ছাপ্পা মেরে দেওয়া হল। লোকে জানল, উনি একজন মস্ত লেখাপড়া জানা লোক হয়েও এমন জঘন্য কাজ করে টাকা উপায় করেন। লোকটা যে এমন কাজ করতে পারেন না, তা গাঁয়ের লোক বিশ্বাস করবে না। তারা গুজবে বিশ্বাসী। এর ফলে প্রাণগোবিন্দবাবু আত্মঘাতী হওয়ারও চেষ্টা করেন।''

''আমি তো অত জানি না। আমাকে মাফ করে দাও ভাই। না খেতে পেয়ে মরলেও আর এমন কাজ করব না।''

''কাল সকালে গোকুলবাবুর কাছে তোমার ছেলেকে নিয়ে যেও। যদি মাফ করার হয় তিনি করবেন। তোমরা লোকটাকে যত খারাপ বলে ধরে নিয়েছ, লোকটা কি তত খারাপ? গোকুল বিশ্বাস দশ-বারোটা ছেলের পড়ার খরচ দেয়। একটা অনাথ আশ্রম চালায়। এসব কি খারাপ লোকের লক্ষণ?''

''নাক মলছি, কাল মলছি ভাই। গোকুলবাবুকে আমরা খারাপ ভাবি না, বিশ্বাস করো।''

লোক দুটো তার দিকে একবার বিষদৃষ্টি হেনে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। দোকানের গদিতে অনেকক্ষণ ঝুম হয়ে বসে রইল গোপাল। মনে বড় দুশ্চিন্তা, এবার কি রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হবে, আর উলুখাগড়ার প্রাণ যাবে?

একটা দিক রক্ষা হল বটে কিন্তু আর-এক দিকে যে বিপদ ঘনিয়ে এল! গোকুল বিশ্বাস যদি বা ছেড়েও দেয়, বটুকবাবু আর রক্ষে রাখবেন কি? সে ভালোই জানে, গোকুলের চেয়ে বটুক কম ভয়ংকর নন, বরং আরও বেশি। গোকুলের ওস্তাদের কাছে তিনি যেসব কথা কবুল করেছেন, সেটাও চাপা যাবে না।''

জীবনে প্রথম গাছে ওঠার পর প্রাণগোবিন্দ বুঝতে পারছেন, আজ তাঁর জীবনটাই যেন পালটে গিয়েছে। কোথায় গলায় দড়ি দিয়ে মরবেন, না তার বদলে বৃক্ষবাসী বাদামচন্দ্র ঘোষের মতো একজন বিজ্ঞ বন্ধু পেয়ে গেলেন। সত্যি কথা বলতে কী, গাছে উঠলে শুধু জ্ঞানই বাড়ে না, বুকে ফুর্তির ভাবটাও উথলে ওঠে। আজ সেই ফুর্তিতেই প্রায় তুড়ি দিয়ে চলেছেন প্রাণগোবিন্দ। ময়নার জঙ্গলে গাছে উঠে তাঁর এমন ডগমগভাব হল যে, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হওয়ার পরও গাছ থেকে মোটেই নামতে চাইছিলেন না। শেষ অবধি বাদাম ঘোষের চাপাচাপিতেই নামতে হল। বাদাম ঘোষ বলল, ''বাপু হে, গাছে থাকার মজাই আলাদা। কিন্তু কী জানো, জ্ঞানের পোঁটলা নিয়ে বসে থাকলেই তো হবে না, সেটাকে কাজে লাগানোও তো দরকার। যে গন্ডগোলটা পাকিয়ে রেখে এসেছ, তার গিঁট না খুললেই নয়।''

প্রাণগোবিন্দর অবশ্য মনে হচ্ছিল, এখন দুনিয়াও রসাতলে গেলেই বা তাঁর কী! তিনি তো থাকবেন গাছে, দুনিয়া ভেসে যায় যাক, তবে অত আনন্দের মধ্যেও খিদে-তেষ্টা বলেও যে একটা ব্যাপার আছে, সেটা মাঝে-মাঝে টের পাচ্ছিলেন, আর ফাঁকে-ফাঁকে নাতি-নাতনি পিউ আর পিয়ালের কথাও বড্ড মনে পড়ছিল। তাই বাদাম ঘোষের চাপাচাপিতে শেষ অবধি পড়ন্ত বেলায় গাছ থেকে দু'জনে নামলেন। টের পাচ্ছিলেন তাঁর মাথাটা জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তিতে একেবারে টইটুম্বুর হয়ে আছে। রোজকার আলাভোলা, বোকাসোকা প্রাণগোবিন্দ যেন আর নেই, এ এক নতুন প্রাণবন্ত প্রাণগোবিন্দ। জ্ঞানবৃক্ষ কথাটার মানে আজ তিনি স্পষ্ট বুঝলেন।

তারপর দুই জ্ঞানবৃদ্ধ বীরদর্পে হেঁটে লহমায় পৌঁছে গেলেন চরণডাঙা গাঁয়ে। এ গাঁয়েই ভয়ংকর গোকুল বিশ্বাসের বাস, কিন্তু প্রাণগোন্দির কোথাও উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা নেই। জীবনে কখনও সঙ্গীতচর্চা করেননি প্রাণগোবিন্দ, কিন্তু আজ গুনগুন করে একটু রামপ্রসাদী গাইতে লাগলেন। তেমন বেসুরো গাইছেন বলেও মনে হল না তাঁর।

হুট বলতে গোকুল বিশ্বাসের বাড়িতে ঢোকা আর সিংহের গুহায় মাথা গলানো একই ব্যাপার। সেখানে গদাম-গদাম চেহারার আর ফটফটে চোখওলা দন্ত কিড়মিড় করা আসুরিক লোকজন পাহারা দিচ্ছে। মাছি অবধি গলবার উপায় নেই, কিন্তু কী আশ্চর্য ব্যাপার! দুই জ্ঞানবৃদ্ধকে দেখে অসুরদের যেন দাঁত-নখ সব খসে পড়ল, তারা বৈষ্ণবোচিত বিনয়ে পথ ছেড়ে দিল।

প্রভঞ্জন সূত্রধর ব্যস্তসমস্ত হয়ে বোধহয় আসছিলেন। প্রাণগোবিন্দকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন, "বাপ রে! এ যে বিচক্ষণ প্রাণগোবিন্দবাবু! তা কী চাই বলুন তো? আরও পাঁচ-দশ হাজার টাকা নাকি? না, না, লজ্জা পাবেন না। পঞ্চাশ হাজার যদি একটু কম হয়েছে বলেই মনে হয়ে থাকে তা হলে পরিষ্কার করে বলুন, মিটিয়ে দেওয়া হবে।"

অন্য দিন হলে প্রাণগোবিন্দ হয়তো এ কথা শুনে রেগে যেতেন বা দুঃখে কেঁদেই ফেলতেন। কিন্তু আজ তিনি অন্য প্রাণগোবিন্দ, শান্ত মাথায় তিনি তখন সব কথা বলে যেতে লাগলেন, অর্থাৎ তাঁর মুখ দিয়ে অন্য এক অচেনা জ্ঞানবৃদ্ধ প্রাণগোবিন্দ এমন সব কথা প্রম্পট করতে লাগলেন যে, প্রভঞ্জন ভারি কাঁচুমাচু হয়ে জিভ কেটে মাথা নীচু করে পালানোর পথ পান না।

গোকুল বিশ্বাসের হাতে বন্দুক বা পিস্তল ছিল না। কিন্তু যে কেউ গোকুল বিশ্বাসের চোখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারে যে, এ মানুষের আলাদা বন্দুকের দরকার নেই। গোকুলের দু'খানা বাঘা চোখই যেন দোনলা বন্দুক। সেই চোখ থেকে যেন সর্বদাই গুলি বেরিয়ে এসে চারদিক ছ্যাঁদা করে দিচ্ছে। শালখুঁটির মতো দু'খানা হাত। ওই হাতে মোষের ঘাড় মটকানো আর গামছা নিঙড়ানো প্রায় একই রকম সহজ। তা এহেন গোকুল বিশ্বাসের সামনে গিয়ে যখন দুই জ্ঞানবৃদ্ধ দাঁড়ালেন, তখন গোকুলকে কে যেন ইলেকট্রিক শক দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। সে ভারি জড়সড় হয়ে হাতজোড় করে বলতে লাগল, "কী সৌভাগ্য! আস্তাজ্ঞে হোক! বস্তাজ্ঞে হোক।"

প্রাণগোবিন্দ ভারি ফুর্তি বোধ করছেন। মাথাটা কী চমৎকার কাজ করছে তা কহতব্য নয়। তিনি অতিশয় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যে নাতিদীর্ঘ ভাষণটি দিলেন, তাতে গোরুচুরি থেকে গোটা ব্যাপারটাই এত করুণ আবেদনের সঙ্গে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে, গোকুল বিশ্বাসের বাঘা চোখও ছলছল করতে লাগল। গোকুল বিশ্বাস ধরা গলায় বলল, "আমাকে মাফ করবেন প্রাণগোবিন্দবাবু। আমি বড্ড ভুল করে ফেলেছি। এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমিই করব। আপনি ভাববেন না।"

না, প্রাণগোবিন্দর আর ভাবনাচিন্তা, উদ্বেগ, হীনমন্যতা কিছুই নেই। গোকুলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে তিনি বলে উঠলেন, "চমৎকার! অতি চমৎকার!"

বাদাম ঘোষও তারিফ করে বলল, "তোমার দিব্যি উন্নতি হচ্ছে হে!"

দাড়ি-গোঁফওয়ালা, আলখাল্লা পরা একটা লোক হঠাৎ তাঁদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ভারী অবাক হয়ে প্রাণগোবিন্দর দিকে চেয়ে রইল। তারপর ভারি বিনয়ের সঙ্গে হাতজোড় করে বলল, "কর্তাবাবু, আপনি যে একেবারে পালটি খেয়ে গেছেন! চেনাই যাচ্ছে না!"

প্রাণগোবিন্দ গোরাং দাসের কাঁধে হাত রেখে বললেন, "ওরে গোরাং, আমি আর সেই আগের কর্তাবাবু নেই রে। নিজেকে আমি নিজেই চিনতে পারছি না।"

গোরাং মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বলল, "তাহলে যে ভারি মুশকিল হবে কর্তাবাবু! বড্ড ভজঘট লেগে যাবে যে! আপনাকে যারা এতকাল মাপজোপ করে একটা আঁচ করে রেখেছিল, তাদের সব হিসেবনিকেশ উলটে যাবে না তো!"

"সেসব জানি নে রে গোরাং। শুধু বলতে ইচ্ছে করছে 'আজকে আমার মনের মাঝে ধাঁইধপাধপ তবলা বাজে।"

গোরাং একগাল হেসে বলল, "আজ্ঞে, বোলটা খুব ফুটেছে কর্তা। মনে হচ্ছে আমিও যেন শুনতে পাচ্ছি। তা কর্তা, গুরুতর একটা কথা ছিল।"

দুই জ্ঞানবৃদ্ধ গোরাংয়ের সব কথা খুব মন দিয়ে শুনলেন। সেই ম্যাজিশিয়ানের কথা, চকোলেট, রহস্যময় চিরকুট, শেষের বটুক সামন্তের কুকুর আর টক্কেশ্বরের অভিজ্ঞতার কথাও।

শুনে বাদাম ঘোষ বলল, "কিছু বুঝলে হে প্রাণগোবিন্দ?"

প্রাণগোবিন্দ একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, "জলের মতো।"

"কী বুঝলে?"

"ম্যাজিশিয়ানটা জালি। আর যেই হোক, লোকটা বিক্রমজিৎ নয়।"

মাথা নেড়ে বাদাম ঘোষ বলে, "আমারও তাই মনে হয়েছে।"

একটু চিন্তিত মুখে প্রাণগোবিন্দ বললেন, "আমার গিন্নি বলেন, আমার নাকি বড্ড ভুলো মন। একমাত্র দর্শনশাস্ত্রের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই আমার মনে থাকে না। তা কথাটা মিথ্যেও নয়। বাজার থেকে সাতটা জিনিস আনতে দিলে আমি দুটো ঠিক জিনিস, বাকিগুলো ভুল জিনিস নিয়ে আসি। কারও নামটাও আমার মনে থাকে না, রামকে রাবণ, হারাধনকে বিশ্বজিৎ বলে আকছার ভুল বলছি। কিন্তু আজ আর ভুল হওয়ার জো নেই। মাথা পরিষ্কার কাজ করছে, স্পষ্ট মনে পড়ছে, আজ থেকে বাইশ বছর আগে বটুক সামন্ত নামে আমার এক বেয়াদব ছাত্র ছিল। অত্যন্ত রগচটা, মারমুখো ছেলে। দুমদাম রেগে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মারপিট করত। একবার সে তার এক ক্লাসমেটকে সামান্য কারণে এমন মেরেছিল যে, ছেলেটাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। আমি তখন কলেজের প্রিন্সিপাল, বাধ্য হয়ে তাকে কলেজ থেকে তাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিই। তাতে রেগে গিয়ে সে রাত্রিবেলা কলেজ বিল্ডিংয়ে আগুন দিয়েছিল। বাধ্য হয়ে তাকে রাস্টিকেট করতে হয়। জানি না এই সেই বটুক সামন্ত কিনা! তবে সেও ম্যাজিক দেখাত বলে শুনেছিলাম।"

গোরাং ভারি মুগ্ধ চোখে প্রাণগোবিন্দর দিকে চেয়ে বলল, "বড্ড গোলমালে ফেলে দিলেন কর্তাবাবু! আলাভোলা মানুষটি ছিলেন, কতবার এক টাকার জায়গায় ভুল করে পাঁচ টাকা দিয়ে ফেলতেন। হাটেবাজারে দশ টাকার জিনিস বিশ টাকায় কিনে আনতেন। চোর-বাটপাড়েরা কত কম মেহনতে আপনার পকেট থেকে টাকাপয়সা হাপিশ করতে পারত। আমরা তো ধন্যি-ধন্যি করতাম, কিন্তু আপনি হুঁশিয়ার হয়ে ওঠায় সে চিন্তার লোক ভারি লোকসানে পড়ে যাবে। গিন্নিমার কথাটাও একটু ভাবুন।"

শশব্যস্ত প্রাণগোবিন্দ বললেন, "কেন, তাঁর আবার কী হল?"

"তিনি যে বড্ড ফ্যাসাদে পড়ে গেলেন কর্তাবাবু। এতকাল একজন ভারি আত্মভোলা, আনমনা, কাছাছাড়া মানুষের ঘর করে বুড়ো হলেন। এখন যে তাঁকে একজন ভারি চালাক-চতুর, হুঁশিয়ার, হিসেবি লোকের সঙ্গে নতুন করে ঘর করতে হবে। এটা ভেবে দেখেছেন? এই কেঁচে গণ্ডূষে তাঁর যে ভারি হয়রানি হবে!"

বাদাম ঘোষ মাথা নেড়ে বলল, "খুব ঠিক কথা হে প্রাণগোবিন্দ! আমি বৃক্ষাবাসী হওয়ার পর থেকেই আমার বাড়িতেও এরকম সব হয়েছিল কিনা। গিন্নি লুকিয়ে গয়না গড়ালে টের পেতুম, রাখাল ছেলেটা গোরুর দুধ চুরি করলে ধরে ফেলতুম, নাতি পড়ায় ফাঁকি দিয়ে ডান্ডাগুলি খেলছে কিনা বলে দিতে পারতুম।"

প্রাণগোবিন্দ বুক ফুলিয়ে বললেন, "আমার সঙ্গে আর কেউ চালাকি করে পার পাবে না। এই তো সেদিন, গিন্নি ছাদে বড়ি শুকোতে দিয়ে আমাকে পাহারায় বসিয়ে রেখেছিলেন। কী বলব মশাই, একটা জিনিস ভাবতে-ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়েছি, ওমনি কাকগুলো এসে বড়ির টুকরো ছড়িয়ে ছয়ছত্রখান করে গেল। গিন্নি এসে কী উস্তম-কুস্তম করে অপমান করলেন আমায়। তারপর ধরুন, বাজারের রাধেশ্যাম মুদি, যখনই কিছু কিনতে যাই, তখনই রাধেশ্যাম এসে আমার সামনে দাঁড়ায় বিগলিত মুখে নানা গল্প ফেঁদে বসে আর এমনভাবে দাঁড়িপাল্লাটা আড়াল করে দাঁড়ায়, যাতে আমি দেখতে না পাই। প্রত্যেকদিন ওজনে ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে! মানুষের কথা কী আর বলব, আমার বিড়াল দুটো কী কম বজ্জাত! তাদের এমন চায়ের নেশা হয়েছে যে, আমি খবরের কাগজে মুখ ঢাকলেই তারা লাফিয়ে টেবিলে উঠে আমার চায়ের কাপ থেকে চুকচুক করে চা খেয়ে নেয়। সব সময় তো আর বুঝতে পারি না, তাই সেই বিড়ালের এঁটো করা চা-ও

কতদিন খেয়ে নিয়েছি। কিন্তু সেসব দিন আজ ইতিহাস। যাক, বিড়াল আর রাধেশ্যাম কেউ এখন আমার হাতে নিস্তার পাবে না।"

গোরাং দাস বিনীতভাবেই বলল, "বুঝতে পারছি, আমাদের কপালেই এবার কষ্ট আছে।"

প্রাণগোবিন্দ এবার একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "কিন্তু ঘটনার প্যাটার্নটা এখনও ঠিক ধরা যাচ্ছে না! ম্যাজিশিয়ান, চকোলেট, চিরকুট, বটুক, তাঁর কুকুর আর পুতুলের উপর কুকুর লেলিয়ে দেওয়া, এসব কি এক সূত্রে বাঁধা! নাকি আলাদা-আলাদা বিচ্ছিন্ন ঘটনা!"

বাদাম ঘোষ বলল, "একটু চেপে ভাবলেই বেরিয়ে আসবে। তোমার মাথা তো এখন চমৎকার কাজ করছে হে!"

"তা করছে। কিন্তু এখনও আমি জানি না, কে বা কারা গোকুল বিশ্বাসের গোরুটা চুরি করে আমার গোয়ালে রেখে এল এবং কে-ই বা মুক্তিপণের টাকা আমার কাছে পৌঁছে দিতে বলল। মাঝেমধ্যে মনে হচ্ছে, এসব ঘটনা একই সূত্রে বাঁধা।"

গোরাং চাপা গলায় বলল, "গাঁয়ে আপনার বদনামও করেছে লোকে।"

"লোকের আর দোষ কী বলো! আমার গিন্নিও তো আমাকে গোরুচোর বলে সন্দেহ করলেন।"

৭

পিউ একটা কাঠের পুতুল কিনল। ঘাড় ধরে ঘোরালেই মুন্ডুটা খুলে যায়, ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে আর-একটা পুতুল। আবার সেটার পেটের মধ্যেও আর একটা পুতুল। আর-একটা কাচের চুড়িওয়ালা তার দু'হাতে কী সুন্দর সব জরি বসানো কাঁচের চুড়ি পরিয়ে দিল। একটুও ব্যথা লাগল না। কাঠের চিরুনি সে কখনও দ্যাখেনি। দুটো নিল। একটা মাকে দেবে। পিয়ালের জন্য নিল বাঁশি আর বেলুন আর প্লাস্টিকের ব্যাট-বল। দাদু আর ঠাকুরমার জন্য কিছু একটা নেওয়া উচিত। কী নেবে ভাবছিল। এমন সময় দেখতে পেল, মেলার গেটের দিকে একটা ভারি সুন্দর রঙিন তাঁবু। তার বাইরে লাল শালুর উপর সাদা অক্ষরে লেখা বিক্রমজিতের ম্যাজিক শো!

সে চেঁচিয়ে উঠল, "এই তো বিক্রমজিতের ম্যাজিক!"

হলধর উঁচু হয়ে বসে সুরবালার ফরমাশ অনুযায়ী ভারী লোহার চাটুর দরদাম করছিল। বলল, "ম্যাজিক দেখতে গেলে দেরি হয়ে যাবে দিদি! সাড়ে সাতটা বেজে গেছে।"

"আমি যে বিক্রমজিতকে চিনি! ভীষণ ভালো ম্যাজিক দেখায়। সে আমাকে চকোলেট দিয়েছিল।"

"এই তো মুশকিলে ফেললে দিদি! দেরি হয়ে গেলে আমি বকুনি খাব!"

"বাঃ রে! আমরা তো এখনও দাদুকেই খুঁজে পাইনি! ঘুড়ির মধ্যে যে লেখাছিল দাদু এই মেলাতেই আছেন।"

হলধর ফাঁপড়ে পড়ে বলল, "বুড়ো মানুষরা কি আর মেলায় ঘুরে বেড়ান! দ্যাখো গে যাও, দাদু এতক্ষণে বাড়ি ফিরে বসে চা খাচ্ছেন!"

"তুমি কী করে জানলে?"

একগাল হেসে হলধর বলে, "তা আর জানব না! এসময় চা না খেলে যে কর্তাবাবু তেড়ে ইংরিজি বলেন! আমার সঙ্গে একদিনে এমন ইংরিজি বলেছিলেন যে, রাতে আমার মোটে ঘুমই হল না, আর মোক্ষদা তো ইংরিজি বকুনির চোটে হাউমাউ করে কী কান্নাই কাঁদল। তখন কর্তামা তাড়াতাড়ি চা করে দেওয়ার পর চা খেয়ে তবে কর্তাবাবু বাংলায় নামলেন।"

"যাঃ, দাদু মোটেও ওরকম নন। আচ্ছা হলধরদাদা, ওই ট্যারা লোকটাকে লক্ষ করেছ?"

"ট্যারা লোক! না তো! কার কথা বলছ?"

''আমরা যখন নসিগঞ্জে ভ্যানে উঠছি, তখন বাজারের কাছ থেকে লোকটা খুব লক্ষ করছিল আমাদের। এখন দেখছি মেলাতেও লোকটা আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরছে।''

হলধর বলল, ''তোমার রাঙা টুকটুকে জামাটা দেখেছে বোধ হয়, গাঁয়ের গরিব লোক তো সব, এত সুন্দর পোশাক তো বড় একটা দ্যাখে না।''

''না হলধরদা, আমি তাকালে লোকটা চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কোথায় যেন লুকিয়ে পড়ছে।''

''ভয় পেও না দিদি, আমি তো সঙ্গেই আছি।''

''আমি মোটেই ভয় পাইনি।''

''ট্যারা লোকটা কাকে দেখছে তা তো বোঝবার উপায় নিই কিনা। তারা কাকের দিকে তাকিয়ে হয়তো বক দেখতে পায়। রামবাবুর দিকে চেয়ে শ্যামবাবুর সঙ্গে কথা কয়।''

ঠিক এই সময় জোকারের পোশাক পরা একটা লোক এগিয়ে এসে পিউকে বলল, ''ম্যাজিক দেখবে না খুকি? বিক্রমজিতের ম্যাজিক? এই নাও দুটো টিকিট। ম্যাজিক এক্ষুনি শুরু হবে।''

বলেই লোকটা ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পিউ হাতের দু'খানা টিকিটের দিকে চেয়ে বলল, ''দেখলে তো হলধরদাদা বিক্রমজিৎ কেমন ভালো!''

হলধর আমতা-আমতা করে বলল, ''তাই তো দিদি, বিক্রমজিৎ তো তোমার চেনা লোকই দেখছি। তা, দেরি একটু হলে হোক। বিনে পয়সায় বরং ম্যাজিকটা একটু দেখেই যাই চলো।''

দু'জনে তাঁবুতে গিয়ে ঢুকে ভারি অবাক হয়ে গেল। সারি-সারি চেয়ার সাজানো আছে বটে, কিন্তু একটাও লোক নেই। তাঁবু একদম ফাঁকা। সামনে ছোট একটা স্টেজ। পরদা ফেলা। তারা বসতে না বসতেই পরদা সরে গেল। বিক্রমজিৎ স্টেজে এসে দাঁড়াল। ঠিক সকালে যেমন দেখেছিল, তেমনই কালো কোট আর প্যান্ট, লাল টাই, মাথায় টুপি। বিক্রমজিৎ ম্যাজিক দেখাতে শুরু করে দিল।

হলধর চাপা গলায় বলে, ''ইরে বাবা, কত চটপট দেখাচ্ছে! এত তাড়াহুড়োর কী আছে বলো তো!''

কথাটা সত্যি। বিক্রমজিৎ বড় তাড়াতাড়ি ম্যাজিক দেখাচ্ছে। মুখে কোনও কথা নেই। টুপি থেকে বের করছে কাচের গ্লাস, ফুলদানি, জ্যান্ত সাপ, খরগোশ, পায়রা। তারপর হঠাৎ একটা লাল চাদর দু'হাতে ধরে উঁচু করে নিজেকে আড়াল করল বিক্রমজিৎ। চাদরটা দু'-একবার দুলে উঠেই পড়ে গেল নীচে। দেখা গেল বিক্রমজিৎ চাদরের আড়ালে নেই, কোথাও নেই। কিন্তু হঠাৎ একটা চাপা শিসের শব্দ হল যেন। আর তারপরই স্টেজের উপরে উঠে এল একটা ভয়ংকর সাদা কুকুর। মাত্র একবার একটা 'আউফ' শব্দ করে সেটা স্টেজ থেকে একটা লাফ দিয়ে নেমেই সোজা ছুটে এল তাদের দিকে।

পিউ আর হলধর কিছু বুঝে ওঠার আগেই কুকুরটা সোজা এসে লাফিয়ে পড়ল তাদের উপর। দু'জনেই চেয়ার উলটে পড়ে গেল মাটিতে। ঠিক এই সময় আর-একটা তীব্র শিসের শব্দ হল। পিউ চিৎকার করে উঠল, ''মা গো!''

চোখ বুজে ফেলেছিল পিউ। এত ভয় সে কখনও পায়নি। ভয়ে শক্ত হয়ে পড়ে রইল সে। কুকুরটা কি কামড়াবে তাকে? কেন কামড়াবে? সে তো কিছু করেনি!

কারা যেন এসে দাঁড়াল কাছে। কে একজন তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বলল, ''ভয় নেই মা। কোনও ভয় নেই।''

পিউ চোখ চেয়ে অবাক হয়ে দেখল, কয়েকজন লোক তাদের চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে একজন গোরাংদাদা, আর দাদু।

''দাদু,'' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল পিউ।

দাদু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ''কোনও ভয় নেই ভাই, কোনও ভয় নেই।''

''কুকুরটা যে আমাকে কামড় দিচ্ছিল!''

"হ্যাঁ, কপাল ভালো, তাই অল্পের জন্য বেঁচে গেছ। এই যে ছেলেটাকে দেখছ, এ হল টক্কেশ্বর। এ-ই বুদ্ধি করে শিসটা ঠিক সময়ে দিয়েছিল। আর তাইতেই কুকুরটা ঘাবড়ে গিয়ে ফিরে যায়। নইলে এতক্ষণে কী হত, ভাবাই যায় না।"

"কুকুরটা কেন আমাকে কামড়ে দিচ্ছিল দাদু! আমি তো কিছু করিনি!"

"না, তুমি কিছু করোনি। কিন্তু বাইশ বছর আগে তোমার দাদু কিছু করেছিল। আর এটা তারই প্রতিশোধ।"

গোকুল বিশ্বাস আর তার কয়েকজন শাগরেদ বাদাম ঘোষ, গোরাং দাস টক্কেশ্বর—সবাই এসে প্রাণগোবিন্দবাবুকে ঘিরে বসে গেল। গোকুল বলল, "ব্যাপারটা আমার মাথায় এখনও সেঁধোয়নি। একটু বুঝিয়ে বলুন।"

প্রাণগোবিন্দ ব্যথিত মুখে বললেন, "এ বড় সুখের গল্প নয়। বাইশ বছর ধরে যে কেউ এত রাগ পুষে রাখতে পারে, তার ধারণাও আমার ছিল না। বটুককে রাস্টিকেট করার যে এতখানি মূল্য দিতে হবে, তাও জানা ছিল না। সে আমাকে একেবারে শেষ করে দিতে চেয়েছিল বটে, কিন্তু খুব ধীরে ধীরে, দগ্ধে-দগ্ধে। সরাসরি মেরে দিলে আর মজা কী? তাই সে গোকুলের গোরু চুরি করে আমার গোয়ালে চালান দেওয়া আর মুক্তিপণ আমাকে দেওয়ানোর ব্যবস্থা করে। সে ভালোই জানে, এই গ্রামদেশে একবার কলঙ্ক আর বদনাম হলে সহজে তা স্খলন হয় না, আর গাঁয়ের লোকরা এসব জিনিস সহজেই বিশ্বাস করে। কাজেই আমাকে গোরুচোর এবং মুক্তিপণ আদায়কারী এক জঘন্য লোক বলে সে দেগে দিতে চেয়েছিল, তাতে চরিত্রহনন যেমন হবে, তেমনই আমার হবে বুদ্ধিনাশ। শুধু এটুকু করেই সে ক্ষান্ত হয়নি, তার ভিতরে বাইশ বছর ধরে যে কত রাগ পুষে রেখেছে, তারা আরও ভয়ংকর প্রতিশোধ চাইছিল। আর এর জন্যই সে বেছে নেয় আমার নাতনিকে। আমার এই আদরের নাতনিকে খুন করলে আমি বেঁচে থেকে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা পাব, এটা সে ভালোই জানে। এজন্য সে বুদ্ধি করে ম্যাজিশিয়ান সেজে বাসের মধ্যে খেলা দেখায়, আর আমার নাতনি তার বেশ ভক্ত হয়ে পড়ে। নানা কৌশলে সে পিউকে টেনে আনে এই মেলায়, প্ল্যান সে ভালোই করেছিল। নির্জন তাঁবুর মধ্যে কুকুর দিয়ে বাচ্চা মেয়েটাকে খুন করলে পুলিশ তাকে ধরতেও পারত না। গ্রামদেশের পুলিশ অত তৎপর নয়। তার উপর সাক্ষিসাবুদও নেই।"

টক্কেশ্বর বলল, "বটুকবাবুর কুকুরটার রং কিন্তু কালো।"

প্রাণগোবিন্দ বললেন, "হ্যাঁ, কুকুরটাকে কামোফ্লাজ করার জন্য সেটার গায়ে সাদা রং লাগিয়ে নিয়েছিল সে। আমরা খবর নিয়েছি, এ-তাঁবুতে বিক্রমজিতের ম্যাজিক শো হয় না, হয় পুতুলনাচ। আর সেটা হয় দুপুরে। বাইরে যে লাল শালু টাঙানো আছে, সেটা শুধু আমার নাতনিকে টেনে আনার জন্যই।"

গোকুল বিশ্বাস বলে, "কিন্তু কুকুরটা সবাইকে ছেড়ে আপনার নাতনির দিকেই বা তেড়ে এল কেন?"

"এখানেও গোকুলের ক্ষুরধার বুদ্ধির কথা বলতে হয়। সকালে বাসের মধ্যে সে আমার নাতি আর নাতনিকে চকোলেট-বার দিয়েছিল। আমার দৃঢ় ধারণা, পিউকে দেওয়া চকোলেটটার মধ্যে এমন কিছু সে মাখিয়ে দিয়েছিল, যার গন্ধ পিউয়ের শরীরে থেকে যাবে। মানুষের নাক সে গন্ধ টের পাবে না বটে, কিন্তু কুকুরের জ্ঞানেন্দ্রিয় অনেক তীক্ষ্ন। আমার আরও মনে হয়, যে মেয়েপুতুল দিয়ে সে কুকুরটাকে ট্রেনিং দিচ্ছিল, সেটার গায়েও ওই গন্ধ মাখানো আছে। পিউ যদি আজ মেলায় না-ও আসত, তাহলেও ছাড়ত না বটুক। পিউকে যেখানে পেত, সেখানেই সে তার কামোফ্লাজ করা খুনে কুকুর লেলিয়ে দিত।"

গোকুল বিশ্বাস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "প্রাণগোবিন্দবাবু, কবুল করছি আমিও একসময় পাজি লোক ছিলুম বটে, কিন্তু এত শয়তানি বুদ্ধি আমারও ছিল না।"

"যেসব খারাপ লোক বুদ্ধিমান হয় তারাই সবচেয়ে বিপজ্জনক। তার প্ল্যানিং দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। টুকরোটাকরা ঘটনাগুলোকে সাজাতে গিয়ে ধরা পড়ল, যা সব ঘটেছে তা একটা সুতোয় বাঁধা। এই সাজাতে গিয়ে বড্ড দেরি হয়ে গেল। একেবারে শেষ সময় পিউকে বাঁচানো গেছে, তাই ঢের। টক্কেশ্বর রোজ

বটুকের বাড়ির দেওয়ালে উঠে সব লক্ষ করত। কোন শিস দিলে কুকুরটা তেড়ে যায়, কোন শিসে ফিরে আসে, তা শিখে গিয়েছিল। ওর শিসটা ঠিকমতো কাজ না করলে অবশ্য আপনাকে গুলি চালাতেই হত গোকুলবাবু। তবে তাতে পিউয়ের রিস্ক ছিল।"

গোকুল বিশ্বাস মাথা নেড়ে বলল, "না মশাই, না। আমার হাতের টিপ এখনও অব্যর্থ। এক চুল এদিক-ওদিক হওয়ার জো নেই। বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখুন।"

"রক্ষে করুন। পরীক্ষার দরকার নেই। তবে কুকুরটাকে যে মারতে হয়নি, এটাতে আমি স্বস্তিই বোধ করছি।"

পিউ দাদুর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "দাদু, বিক্রমজিৎ কি খারাপ লোক? আমার যে তাকে খুব ভালো লাগে! কী সুন্দর ম্যাজিক দেখায়।"

"হ্যাঁ দিদিভাই। তার গুণও অনেক। ওই বুদ্ধি কাজে লাগালে সে অনেক ভালো কাজও করতে পারত। কিন্তু অলস মস্তিষ্ক শয়তানের বাসা। বাপ-ঠাকুরদার অঢেল পয়সা পেয়ে সে কর্মবিমুখ হয়ে গিয়েছিল, আর তার চণ্ড রাগও ছিল তার বড় শত্রু।"

ঠিক এই সময় তাঁবুর পরদা সরিয়ে দারোগাবাবু এসে ঢুকলেন। প্রাণগোবিন্দবাবুকে প্রণাম করে বললেন, 'সরি মামাবাবু, কুকুরটাকে গুলি করে মারতে হয়েছে। কিছু করার ছিল না। বটুককে অ্যারেস্ট করার সময় কুকুরটা ভীষণ ভায়েলেন্ট হয়ে ওঠে। কুকুরটাকে মারতেই বটুকবাবু কোলাপস করেন।'

প্রাণগোবিন্দ বললেন, "খুবই দুঃখের কথা, কুকুরটাকে সে খুবই ভালোবাসত, যেমন ওই গোকুল বিশ্বাস তার গোরুটাকে ভালোবাসে, যেমন আমি আমার এই নাতনিটাকে ভালোবাসি। এসব ভালোবাসার গল্পের সঙ্গে যখন ঘৃণা-বিদ্বেষ এসে মিশে যায়, তখনই হয় বিপত্তি। নইলে ভালোবাসার মতো এমন শুদ্ধ জিনিস আর কী আছে বলো!"

দারোগা সুধাবিন্দু বললেন, "তা বটে।"

সকালবেলা সুরবালা খুবই চেঁচামেচি করছিলেন, "ও পিউ, এ কাকে দাদু বলে ধরে নিয়ে এলি ভাই? সেই আলাভোলা ভালোমানুষ লোক তা এ মোটেই নয়। এই ধুরন্ধর লোকটা তোর দাদু হয় কী করে, অ্যাঁ?"

পিউ খিলখিল করে হেসে বলে, "ইনিই তো আমার দাদু!"

"তা হলে বলতেই হবে, ওই বৃক্ষবাসী বাদামচন্দ্র ঘোষের পাল্লায় পড়ে তোর দাদু একেবারে উচ্ছন্নে গেছে। আগে চায়ে চিনি কম-বেশি হলে টের পেত না। বাজারে গেলে হিসেব মেলাতে পারত না। সংসারের কোনও খবরই রাখত না। কিন্তু এখন তো দেখি কেবল টিকটিক করছে, এটা হল না কেন, ওটা হল কেন? এক রাত্তিরেই আমার হাড় ভাজা-ভাজা হয়ে গেল। এখন এই নতুন লোককে সামলাব কী করে বল তো!"

উঠোনের কোণে বসে হলধর খড় কাটছিল। মুখ তুলে বলল, "যা বলেছেন মাঠান। আগে কত্তাবাবুর চোখ দুটো ছিল গোরুর চোখের মতো ঠান্ডা। এখন একেবারে টর্চবাতির মতো জ্বলতে লেগেছে।"

বাইরের বারান্দার সিঁড়িতে বসে গোরাং দাস মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বলল, "বলেছিলাম না কত্তাবাবু, বড় ভজঘট বেধে উঠবে! আমাদের যে সব হিসেবনিকেশ উলটে গেল!"

প্রাণগোবিন্দ মৃদু-মৃদু হেসে আপনমনে শুধু বললেন, "হুঁ, হুঁ বাবা!"

রাজা

রাজা তাঁর গোলাপ বাগিচার পরিচর্যায় রত ছিলেন। কাল অপরাহ্ন, ঋতু বসন্ত, চতুর্দিকে পতঙ্গের শব্দ ও পাখির ডাকে আনন্দিত। আমাদের প্রাকার থেকে সূর্যাস্তের নিবিড় লাজ বর্ষিত হচ্ছে। পরিখার স্বচ্ছ জলে মৃদু তরঙ্গের শব্দ। রাজার সুললিত বাহু একটি মৃতপ্রায় গোলাপ গাছে প্রাণ সঞ্চারে ব্যগ্র।

এমন সময়ে শীর্ণদেহ এক গুপ্তচর আবিভূর্ত হয়ে অভিবাদন করে এবং নতচোখে নম্রস্বরে জানায়—মহারাজ বিদ্রোহী ও ক্ষুব্ধ প্রজাবর্গ শক্তি পরীক্ষা ভিন্ন অন্য কোনো শর্তে রাজি নয়। তারা মনে করে রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি নন, সামান্য মানুষ মাত্র! তাদের বিশ্বাস, রাজা অতিভোজী, বিলাসপ্রিয়, ইন্দ্রিয়াসক্ত, অত্যাচরী ও পক্ষপাত দুষ্ট।

তরুণ রাজা তাঁর মৃত্তিকা মলিন দুটি হাত নিরীক্ষণ করতে করতে অন্যমনস্কতার সঙ্গে বলেন—ওরা কি জানে মৃত গাছে ফুল ফোটানো কত শক্ত?

গুপ্তচর রাজার এই অসংলগ্ন মন্তব্যের গূঢ়ার্থ বুঝতে পারল না। অভিবাদন করে চলে গেল।

তরুণ রাজার ভ্রু ক্ষণেকের জন্য কুঞ্চিত হয় চিন্তার বলি রেখা তাঁর প্রশস্ত কপালে এক মুহূর্ত খেলা করে। তারপর তিনি আবার তাঁর পুষ্পোদ্যানের পরিচর্চায় নিরত হন।

পরদিন সভাগৃহে সমবেত অমাত্যবর্গের মুখের দিকে চেয়ে রাজা কিছু কুটিলতা লক্ষ্য করেন। প্রত্যেকেই কিছু অস্বস্তি বোধ করছেন। পরার্থপহারক এক ব্যক্তির বিচার করছিলেন রাজা। সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণের পর তার কারাবাসের আদেশ দিতে গিয়ে রাজা অকস্মাৎ বললেন—অপরাধী, ক্ষুধার চেয়ে লোভ সহস্র গুণ শক্তিশালী। যে লোভকে জয় করতে পারে ক্ষুধা জয় তার কাছে কোনো কঠিন সমস্যা নয়। হে প্রিয়, কারাবাসের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে তুমি আমার কাছে এসো। আমি তোমাকে দেখতে শেখাবো জ্যোৎস্নাময়ী ও অমা রাত্রির সৌন্দর্য ও রহস্য। পাখির গান, ফুলের শোভা, প্রীতি ও বন্ধুত্বের আকর্ষণ যেদিন তুমি বুঝতে পারবে সেদিন পরের সম্পদ তোমার কাছে অস্পৃশ্য হয়ে উঠবে।

রাজার এই আদেশ শুনে অমাত্যবর্গ গোপনে মৃদু হাসলেন। মহামাত্য মৃদুস্বরে রাজার কানে কানে বললেন—মহারাজ অপরাধীকে প্রশ্রয় দেবেন না, তাতে রাজশক্তির দুর্বলতাই প্রকটিত হচ্ছে। মনে রাখবেন সিংহাসনে আরূঢ় রাজা আর ব্যক্তিবিশেষ নন, তিনি বিধির নিয়ামক।

রাজা ম্লান হাসলেন। অস্ফুট স্বরে বললেন—মহামাত্য, শরৎ ঋতুর রৌদ্রও বিধিকে লঙ্ঘন করে না কিন্তু তবু কী অফুরান তার সৌন্দর্য।

রাজাবরোধে কাকচক্ষু জলের সরোবরের ধারে রাজা বসে আছেন। জলে তাঁর প্রতিবিম্বকে ঘিরে মৎসকুল ভীড় করে আসে। রাজা তাঁর সুললিত হাত বাড়িয়ে জলের মধ্যে তাদের শরীর স্পর্শ করেন। রাজার হাতের সুগন্ধে মৎসকুল সম্মোহিত হয়ে থাকে। রাজার স্কন্ধ ও শিরোপরি এসে উপবেশন করে দূর অরণ্যে নীড়গামী পাখিরা। ক্ষণেক অবস্থান করে তারা, তারপর আবার উড়ে যায়। গৃহপালিত মৃগটি এসে রাজার পাদমূল স্পর্শ করে স্নেহ জ্ঞাপন করে। অশ্বপালকের কিশোর পুত্রটি রাজার অবকাশ সময়ের পার্শ্বচর। অদূরে ভূমিতে উপবিষ্ট সেই বালক রাজার ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করতে করতে তৃষ্ণার্ত চোখে রাজার অতুল রূপ অবলোকন করছে।

এই সময়ে দক্ষ আর এক গুপ্তচর এসে অভিবাদন করে বলে—মহারাজ, বিদ্রোহীদের সংখ্যা প্রতিদিন প্লাবনের জলের মতো বাড়ছে। তারা চায় প্রজাবর্গের দ্বারা প্রজাবর্গের জন্য প্রজাবর্গের শাসন। অচিরে একদিনে পঙ্গপালের মতো তারা ধেয়ে আসবে।

রাজা অন্যমনে মৃদুস্বরে বলেন—ওরা কি জানে বৃক্ষের মতো সহনশীল হতে? ওরা কি পারে গগণচারী পাখিকে আশ্রয় দিতে?

অপ্রতিভ গুপ্তচর বিদায় নেয়!

রাজমাতা ডেকে পাঠান পুত্রকে। ঈষৎ কঠিন স্বরে বলেন—তোমার পিতা ও পিতামহ যেভাবে বিদ্রোহ দমন করতেন তোমার কর্তব্যও তাই করা। সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত। বৎস, কালক্ষেপ কোরো না।

তরুণ রাজা অকপটে জননীর চোখে চোখ রেখে বলেন,—বাহুবলে মানুষের বাইরের আচরণকে শাসন করা সম্ভব কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষার দমন হবে কী ভাবে?

রাজামাতা হতাশ হন। বিরক্তির সঙ্গে বলেন—তুমি তবে অযোগ্য রাজা।

তরুণ রাজা মাতার ভর্ৎসনায় বিচলিত হন না। তাঁর মুখে শুধু একটু বিষণ্ণতার ছায়া পড়ে। তিনি নীরবে প্রাঙ্গনে আসেন। তাঁর ইঙ্গিতে অশ্বপালকের বালকপুত্র দ্রুতগামী রাজ অশ্বকে নিয়ে আসে। তরুণ রাজা ঝটিকার বেগে ছুটে যান রাজাবরোধের গুপ্তপথ ধরে অরণ্যের দিকে!

গভীর অরণ্যের ভিতরে রাজা এক মহাবৃক্ষের তলায় বসে থাকেন। চতুর্দিকে চির হরিতের সমারোহ, চিরছায়া, অতলান্ত গভীর শান্তি। বৃক্ষমূলে রাজা এক শিশুর মতো মুগ্ধ বিস্ময়ে বসে থাকতে থাকতে নিদ্রিত হয়ে পড়েন। তাঁর সুঠাম সুবিশাল শরীরের ওপরে একটি কৃষ্ণবর্ণের ভয়াল সাপ উঠে আসে। দংশানোদ্যত সেই সাপ অকস্মাৎ নিদ্রিত মুখের দিকে চেয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে। দংশনের পরিবর্তে সে ধীরে শির অবনত করে রাজার গণ্ডে একটি চুম্বন দেয়। ক্ষুধার্ত এক ব্যাঘ্র রাজাকে অনেকক্ষণ ধরে অনুসরণ করছিল। এখন সে নিদ্রিত রাজার কাছে এসে তাঁর দেহের ঘ্রাণ গ্রহণ করে। রাজ অশ্ব হেÉষরব করে ওঠে। ক্ষুধার্ত বাঘটি বিরক্ত হয়ে রোষ কষায়িত লোচনে ঘোড়ার দিকে চেয়ে নিজস্ব ভাষায় বলে—মূর্খ, কলবর করো না, এ লোকটাকে ঘুমোতে দাও। এইভাবেই শ্বাপদেরা রাজার কাছে আসে। আসে পাখি প্রজাপতি ও অজস্র পতঙ্গ। শিশুর মতো রাজা নিদ্রিত থাকেন অনেকক্ষণ। যখন জেগে ওঠেন তখন তাঁর মন আকাশের মতো অবারিত। মৃদুস্বরে বলেন—ওরা কি জানে আমি কত সুখী?

সন্ধ্যায় যখন রাজা প্রাসাদে ফিরলেন তখন প্রধান দ্বারের বাইরে বিদ্রোহীরা জড়ো হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে তাদের ক্রুদ্ধ চিৎকার ও আস্ফালন। তাদের হাতের খরশান অস্ত্রগুলি মশালের আলোয় ঝলসে উঠছে। দ্বারীরা পলাতক, অমাত্যবর্গ আত্মসমর্পণ করেছেন, সেনাপতি যোগ দিয়েছেন বিপক্ষ দলে।

ধীর ও দৃঢ় পদক্ষেপে তরুণ রাজা এগিয়ে গেলেন। তাঁর সেই সুললিত হাতে উন্মোচন করলেন দ্বার। শান্ত চোখে চেয়ে রইলেন প্রজাদের দিকে। তাঁর সেই অপরূপ দেহলাবণ্য আর মুখের অপার্থিব ভাব দেখে প্রজারা স্থাণুবৎ হয়ে যায়। কারো হাতের অস্ত্র উত্তোলিত হয় না। শুধু এক দয়াহীন নৃশংস মানুষ নিস্পন্দ বিদ্রোহীদের ভিতর থেকে এগিয়ে আসে। হাতের বল্লমটি তুলে সজোরে নিক্ষেপ করে রাজার কপাট-বিশাল বুকে।

অস্ত্রে বিদ্ধ তরুণ রাজা ভূলুণ্ঠিত হয়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় কয়েকটি কাতর শব্দ করলেন। তাঁর ক্ষতস্থান থেকে অনর্গল রক্তের স্রোত বেরিয়ে এসে ধুলোয় একটি রক্ত পদ্মের ছবি আঁকতে থাকে। রাজা বিস্ফারিত চোখে সেদিকে চেয়ে বলেন—ওরা কি জানে ফুল ফোটানোর পিছনে কত কষ্ট, কত রক্তক্ষরণ।

প্রজারা কেউ জয়ধ্বনি করে না, রাজার হত্যাকারীকে সাধুবাদও দেয় না কেউ। সাবধানে, রাজার মৃতদেহে যাতে পাদস্পর্শ না ঘটে এমনি ভাবে নীরবে প্রজারা প্রাসাদে ঢোকে এবং ক্ষমতা হাতে নেয়।

প্রজাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই এখন রাজ্যের শাসক। তাদের মধ্যে ভালো বনিবনা নেই। সব ব্যাপারে মতৈক্যও হয় না। কাজেই যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে যৎপরোনাস্তি বিলম্ব ঘটে। কোন ফাঁকে কিছু অযোগ্য লোক প্রবেশ করেছে প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুতর পদে। তারা কাজের বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। ঘন ঘন বসছে জনপ্রতিনিধিদের আলোচনা সভা। ক্ষমতালাভের লড়াই এবং মতান্তর তীব্র হওয়ায় প্রায় সময়েই সভা পণ্ড হয়। রাজ্য জুড়ে দেখা দেয় অসন্তোষ ও ক্ষোভ, দিন যায়।

অশ্বপালকের পুত্র ভীত অনিমেষ চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিল তরুণ রাজার মৃত্যু। আর সেই যে দুঃখী ও বিষণ্ণ হয়ে গেল সে, যুবা বয়সেও সেই বিষণ্ণতার ছাপ গভীর হয়ে আঁকা রইল তার সুন্দর মুখমণ্ডলে। তরুণ রাজাকে সে ভালোবাসত বটে, কিন্তু সে কেবলই প্রশ্ন করত নিজেকে, রাজা কেন কাপুরুষ ছিলেন? কেন অস্ত্রধারণ করলেন না?

বিষয়কর্মে তার মন নেই। সে ভালোবাসে খোলামেলা মাঠে নবীন তৃণের ওপর অর্ধশায়ন থেকে নভোচারী পাখিদের দিকে চেয়ে থাকতে। সে উদ্যানে পুষ্পবৃক্ষের কাছে বসে থাকতে ভালোবাসে। তার প্রিয় হল জীবজন্তু, জলের মাছ, জনপদের সরল সহজ মানুষ। অশ্বারোহণে সে বহু দূরবর্তী অরণ্য বা পর্বতে চলে যায় একাকী বসে থাকে ধ্যানস্থবৎ।

একদা এই রকম অশ্বারোহণে দূর ভ্রমণের পর সে পথিমধ্যে ক্লান্ত হয়ে এক গৃহস্থের কুটিরে ক্ষণকাল বিশ্রাম নিচ্ছিল। গৃহস্থ এক সম্পন্ন চাষী, অতিথির যথাযোগ্য আপ্যায়ন ও সেবার পর আলাপচারীর সময় চাষী বললেন এ রাজ্যে পুরুষকারের বড়ই অভাব। বহুকাল আমরা প্রকৃত বীরত্বের কোনো দৃষ্টান্ত দেখিনি, এ যেন এক বামন মানুষের রাজত্ব সকলেই ক্ষুদ্রকায়, ক্ষুদ্রমনা ক্ষুদ্র স্বার্থের অন্বেষী।

এ কথাটি বিদ্যুতের মতো স্পর্শ করল যুবাকে। সে চমকিত হয়ে প্রশ্ন করে—বীরত্ব আপনি কাকে বলেন?

—বীরভাগ্যা বসুন্ধরা। কথাটা ঠিক। বিশ্বাস, নির্ভরতা ও আত্মত্যাগ—এই তিনই বীরত্বের লক্ষণ। এই তিন লক্ষণ আজ আর কারো মধ্যে দেখা যায় না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে যুবাপুরুষ উঠে দাঁড়ায়। তার বুকের মধ্যে এক বহু পুরাতন শোক ঝড় তুলল। কিন্তু তাতে সে অশ্রু মোচন করল না বরং অতিশয় তীব্র হয়ে উঠল তার দৃষ্টি। নিহত তরুণ রাজা প্রকৃত পক্ষে বীর ছিলেন কিনা সে বিষয়ে কিছু সংশয় তার ছিল। প্রবীণ চাষীর কথায় তার সেই সংশয় কেটে গেছে। সে বুঝতে পারল কেবল অস্ত্রচালনার দক্ষতা বা রক্ত পাতের মোহই বীরত্ব নয়। বীরত্বের বৃহত্তর সংজ্ঞা রয়েছে।

ঝটিকার বেগে অশ্বচালনা করে যুবক নগরে এসে প্রবেশ করে। তার মুখের বিষণ্ণতা কেটে গেছে। স্থিরতা এসেছে চিন্তায়, দৃষ্টিতে। হৃদয়ে এসেছে শক্তি।

কিছুদিন পর একদিন লোলচর্ম প্রবৃদ্ধ মহামাত্যের কাছে গুপ্তচর এসে খবর দিল-এক যুবাপুরুষ বিদ্রোহের সূচনা করছে। লক্ষণ ভালো নয়।

খবর গেল সেনাপতির কাছে। খবর পেলেন মুখ্য নগরকোটাল। ক্রমে সমস্ত রাজ পুরুষ ও সৈন্য বাহিনীতেও খবর ছড়িয়ে পড়ল এক সুঠাম সুন্দর যুবা লোকের কাছে একটি ফুল ফোটানোর গল্প করছে। কী ভাবে এক তরুণ রাজা বুকের রক্ত ঢেলে ফুটিয়েছিলেন রক্তপদ্ম সে কাহিনী শুনে প্রজারা চঞ্চল উত্তেজিত ক্রুদ্ধ।

অমাত্য পরিষদের আদেশে নগর রক্ষক ও সৈন্য বাহিনী ছুটে বেরোলো চারধারে সেই বিপদজনক যুবকের সন্ধানে।

অবশেষে একদিন হস্তপদ বন্ধ অবস্থায় ধরে আনা হল তাকে বিচারশালায়। বিচার দেখতে ভেঙে পড়ল লোক। বিচারক প্রশ্ন করলেন—তুমি কি বিদ্রোহী?

বিস্মিত যুবক বললেন—না তো? আমি পরম রাজভক্ত।

ভ্রূকুটি করে বিচারক বললেন—অযোগ্য যে কাপুরুষ রাজাকে প্রজাবর্গ মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে তুমি কি তার অনুগত।

যুবক মৃদু হাসল। বলল—মহান বিচারপতি, আমিও ভাবতুম তরুণ রাজা বুঝি কাপুরুষ ছিলেন। তিনি অস্ত্র ধারণ করেননি, তিনি দোষীর বিচার করেননি। কিন্তু বিচারপতি, তরুণ রাজা একটি রক্ত পদ্মের জন্ম দিয়েছিলেন? সারা জীবন ওই পদ্মের কলিকাটি গোপন ছিল তার প্রেমময় অন্তর জুড়ে। একদিন কাপুরুষের অস্ত্রাঘাতে ফুটে উঠল ফুল। ঝরে গেল। বিচারপতি, আমরা সেই সহস্রদল পদ্ম চাই। আমরা পদ্মের কাঙাল। রক্তপদ্ম চাই। দুহাত বাড়িয়ে যুবা বলে ওঠে—দিন সেই পদ্ম।

যুবকের তীক্ষ্ণ কণ্ঠের সেই ধ্বনি সমস্ত বিচারশালায় প্রতিধ্বনিত হল সমবেত মানুষের কণ্ঠস্বরে—দিন সেই পদ্ম। আমরা রক্তপদ্ম চাই।

ক্রমে সেই স্বর ছড়িয়ে যেতে লাগল নগরে, জনপদে, রাজ্যের দূর দূরতম প্রান্তে। রক্তপদ্ম চাই। দাও সেই মহার্ঘ ফুল। আমরা আর কিছুই চাই না।

বিদ্যে

সিধু ছিল বিখ্যাত চোর।

এত সাফ হাত আর নিখুঁত চুরির মাথা সে-তল্লাটে আর কারও ছিল না। সিঁধ কাটা, গরাদ ভাঙা তো তুচ্ছ ব্যাপার, ভালোরকম মন্ত্র-টন্ত্রও জানা ছিল তার। মন্ত্রের জোরে গেরস্থকে ঘুম পাড়িয়ে হাসতে হাসতে চুরি করে আসত। জীবনে একবারও ধরা পড়েনি।

তা হল কি, সেদিন রাতে সিধু ভালোরকম রোজগার করেছে। পটলাপাড়ার নায়েব মশাইয়ের নতুন জামাই এসেছে। সোনার বোতাম, আংটি, চেন, মেয়ের গলার নেকলেস—জিনিস বড় কম নয়। তবে সিধু ছোটলোক নয়। চুরি করে বটে, কিন্তু গেরস্থকে পথে বসায় না। অর্থাৎ চেঁছেচুঁছে সব নিয়ে আসে না। রেখে ঢেকে নেয়। চুরির পরদিনই যাতে গেরস্থকে ভিক্ষেয় বেরতে না হয় সেদিকে তার নজর থাকে। তবু রোজগার বড় মন্দ হয়নি। মনটা খুশি খুশি ছিল তার।

শেষ রাতে একটু চাঁদ উঠেছে। সিধু মৃদুস্বরে একটু সুর ভাঁজতে ভাঁজতে মাঠ পেরিয়ে নিজের গাঁয়ে ঢুকল। তারপর পুকুরে হাত মুখ ধুয়ে বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াল।

চোরের কান খুব সজাগ। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ও তার কাজ করে। সিধু হঠাৎ খুব স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কী একটা জিনিস আঁচ করে নিল। তারপর বড় ঘরের পিছন দিকটায় আগাছার জঙ্গলে খুব নিঃশব্দে গিয়ে সেঁধোল।

তারপরই সিধুর চক্ষু স্থির। স্বপ্নেরও অগোচর দৃশ্যটা দেখে সে হাসবে না কাঁদবে তা ভেবে পেল না।

একটা চোর তার ঘরে সিঁধ কাটছে।

চোর হলেও সিধু শিল্পী মানুষ। প্রথমটায় অবাক ভাবটা কেটে যেতে তার ভীষণ রাগ হয়েছিল। কিন্তু রাগটা বেশিক্ষণ রইল না। শিল্পী মানুষ শিল্প দেখলেই সব ভুলে যায়। কিছুক্ষণ পিছনে দাঁড়িয়ে সে চোরটার কাজকর্ম দেখে খুশিই হল। সিঁধের হাত অতি পরিষ্কার।

সিঁধ কেটে চোরটা নিয়মমাফিক কেলে হাঁড়ি ঢুকিয়ে কেউ জেগে আছে কিনা পরীক্ষা করল। ঘুমপাড়ানি মন্ত্র পড়ল নির্ভুলভাবে। তারপর সেঁধোল।

পিছু পিছু সিধুও ঢুকে পড়ল।

চোরটার হাত যে ভালো তা সিন্দুকের তালা ভাঙার কায়দাতে বুঝে গেল সিধু। আলমারিটা খুলল একটু শব্দ না করে। বাসনপত্র যেন তার পোষমানা নাড়াচাড়াতেও শব্দ হল না। সিধু আর থাকতে পারল না। বলেই ফেলল, 'শাবাশ!'

চোরটা চমকে উঠে সিধুকে দেখে লজ্জায় জিভ কেটে মাথা হেঁট করে রইল।

সিধু তার পিঠ চাপড়ে বলল, 'লজ্জার কিছু নেই। হাত আছে তোমার। একটু তালিম নিলেই দিব্যি জমিয়ে ফেলবে।'

চোর সিঁধ কাঠি ফেলে সিধুর পায়ে পড়ে বলল, 'শেখাবেন আমাকে?'

সিধু মাথা নেড়ে বলে, 'শেখাব হে শেখাব। এ বিদ্যে তো আর নিজের ছেলেকে শেখানো যায় না। অথচ বিদ্যেটা নষ্টই বা করি কী করে? তোমার মতো লোক পেলে শেখাই।'

বাকি রাতটা আর সিধু ঘুমোল না। চোরটাকে নিয়ে দাওয়ায় বসে খুব মন দিয়ে চুরির কলাকৌশল শেখাতে লাগল। চোরটা ভক্তি গদগদ মুখে শিখতে লাগল।

কথার দাম

কেউ যদি বলে, এটা আপনার ছদ্মনাম, তা হলে রহস্যময়বাবু খুবই অসন্তুষ্ট হন। এমনকী, রেগেও যান। রহস্যময় তাঁর নিজস্ব পিতৃদত্ত নাম। রহস্যময় যেন অত্যন্ত সফল উকিল। তাঁর বাড়ির চেম্বারে রাত দশটা-এগারোটা অবধি মক্কেল গিসগিস করে। টাকাপয়সার লেখাজোখা নেই। এখন রাত সাড়ে দশটা। মফস্বল শহরে শীতটা এবার খুব জম্পেশ হয়ে পড়েছে। ক'দিন হল মেঘলা এবং টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে নাগাড়ে। আজ আবার একটা ঝোড়ো হাওয়াও দিচ্ছে সন্ধে থেকে। ফলে আজ তেমন মক্কেলের ভিড় নেই। তবু মোট চারজন এখনও আছে। একজন মক্কেলের সঙ্গে রহস্যময়বাবু চেম্বারে বসে কথা বলছেন। বাইরের ঘরে আরও তিনজন বসে আছে। তাদের মধ্যে আরসাদ মিঞা বুড়ো এবং কালা মানুষ। তিনি বসে-বসে অনেকক্ষণ ধরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। অন্য দু'জনের একজন আটগাঁয়ের গণেশ সাহা, তেলের কারবারি। তিন নম্বর লোকটি হল মনসাতলার নন্দ হাজরা। নন্দ আর গণেশের এই উকিলবাবুর চেম্বারেই চেনা হয়েছে। বসে থেকে-থেকে সেথা গল্পও হল। গল্প হতে-হতে দু'জনেরই হাঁফ ধরল। এখন দু'জনেই একটু ঝিমোচ্ছে।

ঠিক এই সময়ে হঠাৎ নিস্তব্ধতা খানখান করে বিকট একটা ঝনঝন শব্দ হল। সেই শব্দ এমনই সাঙ্ঘাতিক যে, রহস্যময়বাবুর মতো ঠান্ডা মাথার লোকও লাফিয়ে উঠে 'ভূমিকম্প, ভূমিকম্প' বলে চেঁচাতে লাগলেন। তাঁর মক্কেল সনাতন হালদার ধাঁ করে টেবিলের নীচে ঢুকে পড়ল। নন্দ চমকে উঠে হাঁউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল। আর গণেশ একটিও কথা না বলে টপ করে উঠে ঘরের বাইরে লাফিয়ে পড়ে অন্ধকারে পাঁই-পাঁই করে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য ছুটতে লাগল। শুধু আরসাদবুড়োরই কোনও ভাবান্তর হল না। শান্ত মুখে ঘুমিয়ে রইলেন, ঘাড়টা একটু লটকে দিয়ে। কানে না-শোনার কিছু ভালো দিকও তো আছে।

রহস্যময়বাবুর বাড়ির লোকজনও শব্দে আতঙ্কিত হয়ে দোতলা থেকে নেমে এল। বউ, দুই ছেলে, এক মেয়ে, রহস্যময়বাবুর বুড়ি মা, রান্নার ঠাকুর হরিহর এবং কাজের মেয়ে অন্নদা।

রহস্যময়বাবু দু'মিনিট ধরে 'ভূমিকম্প, ভূমিকম্প' বলে চেঁচালেও ঘর ছেড়ে বেরোতে পারেননি। তাঁর ধুতির খুঁট টেবিলের ড্রয়ারের টানায় আটকে গিয়েছিল। স্ত্রী মানময়ী মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, 'ভূমিকম্পটা আবার কখন হল? ভূমিকম্প তো নয়, একটা কাচ ভাঙার শব্দ হয়েছে।'

এ-কথায় রহস্যময়বাবু একটু দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লেন। বললেন, 'থাক! কাচ ভাঙবে কেন? ভূমিকম্প হলেই তো কাচটাচ ভাঙে।'

'মোটেই নয়, ঢিল মারলেও ভাঙে।'

'ঢিল! আমার জানালায় ঢিল মারে কার এমন বুকের পাটা? পাঁচশো ছয় ধারায় ঠুকে দেব না! আমার নাম রহস্যউকিল।'

এই বলে বুক চিতিয়ে অহঙ্কারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইলেন। তবে তিনি রোগা মানুষ, বুক চিতিয়ে দাঁড়ালেও তেমন কিছু ভয়ঙ্কর দেখাল না।

তাঁর ছোট ছেলে পুঁটু হামাগুড়ি দিয়ে মেঝে থেকে একটা জিনিস কুড়িয়ে আনল। একটা কাগজে মোড়া জিনিস। সেটা দেখেই রহস্যময় আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বোমা! বোমা! ফেলে দে, ফেলে দে।'

বোমা শুনে সনাতন হালদারের বুদ্ধি কাজ করল। সে একটা বোমার মামলারই আসামি। বলতে নেই বোমা বানানোয় তার একটু বেশ হাতযশও আছে। ভূমিকম্প হচ্ছে না জেনে সে টেবিলের তলা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে টপ করে পুঁটুর হাত থেকে বোমাটা কেড়ে নিয়ে বলল, 'উকিলবাবুর বুদ্ধিরও বলিহারি, বোমা ফেলে দিতে বলছেন। বাচ্চা ছেলে যদি ছুড়ে ফেলে দেয় তাহলে বোমা ফেটে ঘরসুদ্ধু লোক মরব না?'

'তা বটে।' রহস্যময়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বোমার পণ্ডিত সনাতন বোমাটা একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল, হাতে একটু নাচিয়ে ওজনটা পরীক্ষা করল, একটু শুঁকেও দেখল। তারপর ভ্রূকুটি করে বলল, 'উকিলবাবু, জিনিসটা বোমা বলে মনে হচ্ছে না।'

বলেই ওপর থেকে কাগজটা সাবধানে ছাড়িয়ে নিয়ে সনাতন যে-জিনিসটা তুলে সবাইকে দেখাল তা একটা পাথরের টুকরো। বলল, 'এটা কেউ ছুড়ে মেরেছে বাইরে থেকে।'

একটা জানালার ওপর লম্বা ভারী পরদা ঝুলছিল। সেটা সরিয়ে দেখা গেল, শার্শি হাঁ হয়ে আছে। মেঝেময় কাচের টুকরো ছড়ানো।

রহস্যময়বাবু আস্তিন গোটানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু গায়ে শুধু গেঞ্জি এবং তার ওপর আলোয়ান জড়ানো বলে পেরে উঠলেন না। তবে মুখে বললেন, 'পাঁচশো ছয় ধারা। কালপ্রিটকে অ্যায়সা শিক্ষা দেব...'

সনাতন ঢিলের ওপরকার কাগজের খোসাটা খুলে টেবিলের ওপর রেখে মন দিয়ে কী যেন দেখছিল। সে বলল, 'উকিলবাবু, বেশি চেঁচামেচিতে কাজ নেই।'

'কেন বলো তো!'

'এই কালপ্রিট খুব সুবিধের নয়। করালী-ডাকাতের চিঠি বলে মনে হচ্ছে। সে কাল রাতে আপনার বাড়িতে ডাকাতি করতে আসবে বলে লিখেছে। আগের দিনে এসব প্রথা ছিল, ডাকাতরা চিঠি দিয়ে আসত। আজকাল সব ভালো-ভালো প্রথাই তো লোপাট হয়েছে! তা এই করালীই যা কিছু ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। আহা, নমস্য লোক।'

রহস্যময় ধাঁ করে চিঠিটা প্রায় কেড়ে নিলেন। চিঠিটা পড়েই তিনি আলমারি খুলে পেনাল কোড বের করে উপুড় হয়ে দেখতে-দেখতে আপনমনে বলতে লাগলেন, 'ডাকাতির ভয় দেখানো? দাড়াও, ধারাটা আগে দেখে নেই।'

সনাতন একটু গলাখাঁকারি দিয়ে সসম্ভ্রমে বলল, 'আজ্ঞে, ধারা দেখার মেলা সময় পাবেন, যদি বেঁচেবর্তে থাকেন। ধারা দিয়ে হবেটাই কি? করালী-ডাকাত যা বলে তা-ই করে। ধারা-ফারা সব আমাদের মতো চুনোপুঁটিদের জন্য। করালীর জন্য ধারায় হবে না। আপনি বরং কাল সকালেই শ্বশুরবাড়ি চলে যান। টাকাপয়সা, গয়নাগাঁটি সব পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে যাবেন।'

রহস্যময়বাবু ফের বুক চিতিয়ে বললেন, 'পালাব! কেন, পালাব কেন? দেশে পুলিশ নেই? আদালত নেই? সরকার নেই?'

সনাতন মাথা চুলকে বলল, 'তা বটে। তেনারাও তো আছেন! তাহলে তো আর ভাবনার কিছু নেই।'

কথাটা এমনভাবে বলল, যেন মশকরা করছে। রহস্যময়বাবু কটমট করে তার দিকে চেয়ে বললেন, 'ভাবনার কী থাকবে? অ্যাঁ! কাল সকালেই পুলিশের কাছে যাচ্ছি।'

এই বলে রহস্যময়বাবু দফতর গুটিয়ে ফেলতে লাগলেন। রাগে ফুঁসছেন।

সনাতন মৃদু গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, 'বাইরে যে এখনও তিনজন মক্কেল বসে আছে উকিলবাবু!'

'তাদের যেতে বলে দাও। আজ আর হবে না।'

'সেই ভালো।'

পরদিন সকালেই পুলিশের কাছে গিয়ে সব বললেন রহস্যময়বাবু। দারোগা মদনলাল খাঁড়া বন্ধু লোক। চিঠিটা দেখে এবং ঘটনার কথা শুনে মদনলাল কিছু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'রহস্য, করালী-ডাকাতের কথা কি তুমি শোনোনি।'

'শুনব না কেন? ঢের শুনেছি। তোমরা অপদার্থ বলে তাকে এতকাল ধরে জেলে পুরতে পারোনি।'

মদনলাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বড় ঠিক কথা বলেছ। আর অপদার্থ বলেই সরকার আমাকে দূরের একটা জায়গায় বদলি করে দিয়েছেন। সামনের মাসে চলে যাচ্ছি। তবে আমি একা নই, আমার আগে আরও সাতজন দারোগা ওই একই কারণে বদলি হয়েছে।'

'তাহলে মানেটা কী হল? তুমি আমার একটা বিহিত করবে না?'

'তুমি উকিলমানুষ, তার ওপর বন্ধু লোক। তোমাকে বাঁচাতে যা করার সবই করব। দুপুর থেকেই তোমার বাড়িতে বন্দুকধারী কয়েকজন সেপাই বহাল থাকবে। তারপর তোমার ভাগ্য।'

রহস্যময়বাবু খুব রেগে গিয়ে বললেন, 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে করালীর হাত থেকে আমাকে রক্ষার করার ব্যাপারে তোমার তেমন গা নেই।'

'রক্ষাকর্তা ভগবান, আমি কে? ভগবানকে ডাকো।'

'তার মানে, করালীকে তুমিও ভয় খাও?'

মদনলাল করুণ হেসে মাথা নেড়ে বললেন, 'না রে ভাই। ভয়টয় পাওয়ার মতো অবস্থা আর আমার নেই। গত দু'বছরে অন্তত ত্রিশটা বাড়িতে করালী আগে থেকে খবর দিয়ে ডাকাতি করেছে। ত্রিশটা বাড়িতেই আমি ফোর্স নিয়ে গেছি।'

রহস্যময়বাবু সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর?'

'এঁটে উঠিনি ভায়া। ত্রিশটা বাড়ির একটা বাড়িতেও সে হানা দেয়নি। তবে ওই রাতেই সম্পূর্ণ অন্য জায়গায় ডাকাতি করে আমাদের বোকা বানিয়েছে।'

রহস্যময়বাবু সোৎসাহে বললেন, 'তাহলে আমার বাড়িতে আজ ডাকাতি হবে না?'

'আজ না হলেও, হবে। যেদিন রামবাবুর বাড়িতে হওয়ার কথা, সেদিন শ্যামবাবুর বাড়িতে হয় বটে, কিন্তু রামবাবুও শেষ অবধি রেহাই পায় না। যেদিন যদুবাবুর বাড়িতে হওয়ার কথা, সেদিন রামবাবুর বাড়িতে সে হানা দেয়। সুতরাং তুমি আজকের দিনটা কাটিয়ে দিলেও অন্য কোনও সময়ে করালীর থাবা খাবেই খাবে।'

রহস্যময়বাবু অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'লোকটা দেখছি এককথার মানুষ নয়। অথচ কাল আমার এক মক্কেল বলছিল, করালী নাকি যা বলে তা-ই করে।'

ভ্রূ কুঁচকে মদনলাল বললেন, 'কে মক্কেল? কী নাম?'

রহস্যময়বাবু নিপাট মুখে বললেন, 'নামটা বলছি না। সে ক্রিমিন্যাল। সাবধানে থেকো।'

রহস্যময়বাবু কোর্টে গেলেন। আদালতের কাজে মন দিতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলেন। দেখলেন জনাআষ্টেক সেপাই তাঁর বাড়ির সামনে পাহারায় বসে গেছে।

সন্ধেবেলা আজ আর মক্কেলরা কেউ বাড়িতে ঢুকতে পারল না। রহস্যময়বাবু এবং তাঁর পরিবারের সবাই আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। ঘুম অবশ্য কারও এল না। বারবার উঠে সবাই জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বাইরের দিকে দেখতে লাগলেন। এই করতে রাত শেষ হয়ে এল। সেপাইরাও জানে, ডাকাত আসবে না। তারা সারারাত বসে-বসে দিব্যি ঘুমোল। ভোরবেলায় রহস্যময়বাবুকে সেলাম জানিয়ে বখশিশ নিয়ে বিদেয় হল।

রহস্যময়বাবু খুবই দুশ্চিন্তার সঙ্গে বাইরের ঘরে পায়চারি করতে-করতে আপনমনে বলছিলেন, 'কথা দিয়ে যারা কথা রাখে না তারা বিশ্বাসঘাতক। লোকটা দেখছি একেবারে যাচ্ছেতাই। ছ্যাঃ!'

'পেন্নাম হই উকিলবাবু।'

বিরক্ত রহস্যময়বাবু ফিরে দেখলেন, খোলা দরজায় তেলচুকচুকে চেহারার গোলগাল একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। মুখে অমায়িক হাসি।

'কী চাই?'

'আজ্ঞে, আপনাকে একটু পেন্নাম করতেই আসা। সঙ্গে স্যাঙাতরাও আছে।' বলে পিছু ফিরে রাস্তার দিকে চেয়ে কাকে যেন ডাকল, 'ওরে, আয়! আয়! পেন্নাম কর এসে।'

পাঁচ-সাতজন মোটাসোটা লোক ঘরে ঢুকে পড়ল।

রহস্যময়বাবু বললেন, 'কে তোমরা? কী চাও?'

তেলচুকচুকে লোকটি বলল, 'আমিই করালী। একটু দেরি করে ফেলেছি। আপনি রাগ করেননি তো?'

রহস্যময়বাবু লোকটির দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ হাঁ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'তুমিই করালী?'

'যে আজ্ঞে।'

রহস্যময়বাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, 'এটা কেমন কথা হে? অ্যাঃ! তুমি আমার শার্শি ভেঙে, ঢিল মেরে, বীরত্ব দেখিয়ে চিঠি দিলে! আর আসল কাজের বেলায় লবডঙ্কা! কথা দিয়ে যারা কথা না রাখে, তারা কীরকম মানুষ বলো তো?'

করালী জিভ কেটে বলে, 'কথাটা সত্যি। তবে কিনা আপনি পুলিশে খবর দিয়েছিলেন, সেপাইরাও মোতায়েন ছিল, তাই...'

দ্বিগুণ রেগে রহস্যময়বাবু বললেন, 'বিপদ আছে বলে কথার খেলাপ করবে? তোমার মতো কুলাঙ্গার ডাকাত আমি কমই দেখেছি। জানো, যার কথার দাম নেই তার মুখদর্শন করাও পাপ? আজকে ভোরবেলা তোমার মুখ দেখলাম, দিনটাই মাটি হল দেখছি। ছিঃ-ছিঃ, তার ওপর সকালবেলায় ডাকাতি করতে এসেছ, সেটাও মস্ত বড় বেইমানি। এরকম তো নিয়ম নয়।'

করালী কী একটা বলতে যাচ্ছিল, রহস্যময়বাবু তাকে পেল্লায় একটা ধমক দিলেন, 'চোপ! চোপরাও বেয়াদব কোথাকার! লুটপাট করতে চাও সব বাক্স-প্যাঁটরা, আলমারি খুলে দিচ্ছি, নিয়ে যাও। কিন্তু বাড়ি ফিরে গিয়ে নিজের বউ, ছেলেমেয়ে আর দলবলের কাছে বড়াই কোরো না। কাপুরুষ আর কাকে বলে...ইত্যাদি।'

করালী-ডাকাত খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। রহস্যময়বাবু তাঁর অগ্নিবর্ষী গলায় দেশের বীরপুরুষ ক্ষুদিরাম থেকে বাঘা যতীন, এমনকী গান্ধীজির প্রসঙ্গও এনে ফেললেন। এবং শেষে প্রশ্ন করলেন, 'দেশটা কোথায় যাচ্ছে বলো তো?'

করালীর চোখ ছলছল করছিল। অর্থাৎ হাতজোড় করে ধরা গলায় বলল, 'আর এরকম হবে না। কথা দিচ্ছি।'

হাঃ হাঃ করে হাসলেন রহস্যময়বাবু, 'তোমার কথার কীই-বা দাম!'

বলে ফের হাঃ হাঃ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন তিনি।

করালীচরণ ডাকাতি না করেই পালাতে-পালাতে অনেক দূর থেকেও সেই হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছিল।

কোট

সুবলবাবুর পুরোনো কোটটা বড়ই পুরোনো হয়েছে। আর চলে না। জোড়াতাপ্পি দিয়ে দু-তিন বছর চলল। কিন্তু এ বছর শীতের শুরুতে কোটটা বের করে দেখে তাঁর গিন্নি বললেন, ওগো, এটা এবার ঘর পোঁছার ন্যাতা বানাতে হবে, কোনও ভদ্রলোকের এটা আর গায়ে দেওয়া চলবে না।

সুবলবাবুর কোটটার ওপর ভারি মায়া। তাঁর ঠাকুর্দার আমলের জিনিস। দীর্ঘদিন পরেছেন। এখন আর সত্যিই চলে না। সুবলবাবুর অবস্থা ভালো নয়। কষ্টেসৃষ্টে চলে। একটা কোট কিনতে না হোক দেড় দুশো টাকা খরচ।

উনি বললেন, 'এই বছরটা কোনওক্রমে ওটা দিয়েই—'

গিন্নি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'না এটা ভিখিরিও আর গায়ে দিতে পারে না। এটা আমি ন্যাতা বানাবো।'

প্রস্তাবটা শুনে সুবলবাবুর চোখ ছলছল করতে লাগল। কোটটা বাতিল করতে তাঁর আপত্তি নেই, কিন্তু ন্যাতা বানিয়ে দাদুর স্মৃতিকে অপমান করতে তাঁর বড় বুকে বাজবে। কিন্তু সুবলবাবুর গিন্নি অতিশয় রাগী ও একরোখা মহিলা। যা করবেন তা করেই ছাড়বেন।

সুবলবাবু মিথ্যে কথা বলেন না। কিন্তু আজ কোটটাকে বাঁচানোর জন্য অতিকষ্টে একটা মিথ্যে কথা বলেই ফেললেন। বললেন, 'ইয়ে, শুনেছি ধর্মতলায় একটা দোকান আছে, সেখানে পুরোনো জিনিস নিয়ে নতুন জিনিস দেয়। তাতে অনেক পয়সা বাঁচে। কোটটা নিয়ে গিয়ে দেখি এর বদলে কম পয়সায় একটা কোট পাওয়া যায় কিনা।'

গিন্নি এ প্রস্তাবে বেশ খুশি হয়েই রাজি হলেন।

এরকম কোনও দোকান যদিও সুবলবাবুর জানা নেই, তবু তিনি কোটটা ভালো করে কাগজে মুড়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি ঠিক করলেন, ধারকর্জ করে একটা নতুন কোট আজ কিনেই ফেলবেন আর এই পুরোনো কোটটা আমতলায় তাঁর বোনের জিম্মায় রেখে আসবেন।

অফিসে গিয়ে সুবলবাবু টাকা ধার করার অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু সুবিধে হল না। মাসের শেষে কারও হাতেই তেমন টাকা নেই। মনটা খারাপ হয়ে গেল। শীতটাও এবার জাঁকিয়ে পড়বে বলে মনে হয়।

অফিস থেকে বেরোবার মুখে এক বিপত্তি। মেঘ করে বৃষ্টি পড়ছে। ছাতা আনেননি। সুতরাং ভেজা ছাড়া উপায় নেই। যা হওয়ার হবে, সুবলবাবু বৃষ্টি মাথায় করেই বেরিয়ে পড়লেন।

রাস্তাঘাট বৃষ্টির জন্য বেশ ফাঁকা হয়ে গেছে। শনিবার বলে দোকানপাটও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সুবলবাবু গুলিঘুঁজি দিয়ে আমতলায় বোনের বাসায় যাবেন বলে এগোতে লাগলেন।

বিপত্তির ওপর বিপত্তি, হঠাৎ ফটাস করে গেল লোডশেডিং হয়ে। সুবলবাবু অন্ধকারে একরকম আন্দাজেই হাঁটতে লাগলেন। একটু বাদেই বুঝতে পারলেন, তাঁর রাস্তা ভুল হয়ে গেছে। যে গলিটায় ঢুকে পড়েছেন সেটা যেন বড্ড সরু আর বড়ই নির্জন। হাতের তেলোটা অবধি ঠাহর করা যায় না এমন অন্ধকার।

সুবলবাবুর একটু ভয় ভয় করতে লাগল। যতদূর আন্দাজ করে বুঝলেন, এ গলিটা একটু বিটকেলে। দু'ধারে বাড়িঘর বা দোকানপাট কিছুই নেই। শুধুই দেয়াল। এ কোথায় এসে পড়লেন তিনি?

এগোবেন না পিছোবেন তা বুঝতে পারলেন না। বৃষ্টির জোরও যেন বাড়ছে। হিমশীতল বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে যেন ঠান্ডার ছ্যাঁকা দিচ্ছে। সর্দি নির্ঘাৎ হবে। নিউমোনিয়াও হতে পারে। এ সময়ে একটা দোকান-টোকান পেলে ঢুকে পড়তেন।

সুবলবাবু সামনের দিকে একরকম দৌড়োতে লাগলেন। গলিটাও বিচিত্র। কখনো বাঁ কখনো ডাইনে কেবলই এঁকেবেঁকে যাচ্ছে। উপায় নেই। তিনি এগোতে লাগলেন।

হঠাৎ ডান দিকে মোড় ফিরতেই ভারি খুশি হলেন সুবল সেন। সরু গলির মধ্যে একটা ছোট্ট দোকানঘরে আলো জ্বলছে। সুবলবাবু গিয়ে সোজা দোকানঘরটায় ঢুকে পড়লেন।

অবশ্য ঢুকে পড়া বলতে যা বোঝায় তেমন নয়। দোকানটা খুবই ছোট। চার ফুট বাই পাঁচ ফুট হবে বড় জোর। তার মধ্যে একজন বুড়ো মানুষ একটা সেলাই মেশিনের মতো জিনিস নিয়ে বসে আছেন। বুড়ো বলতে বুড়ো! মানুষ যে এত বুড়ো হয় তা তাঁর জানা ছিল না। ভারি রোগা বিশুষ্ক কঙ্কালসার চেহারা। গায়ে জোব্বা, মাথায় টুপি, চোখে ঠুলি পরা। দাঁত-টাত নেই, খুনখুনে বুড়ো।

সুবলবাবুকে দেখে মুখটা তুলে বৃদ্ধ বললেন, 'কী চাই?'

'আজ্ঞে এই একটু মাথা বাঁচাতে ঢুকে পড়েছি।'

'বগলে ওটা কী?'

'আজ্ঞে, একটা ছেঁড়া কোট।'

'ছেঁড়া কোট? কই দেখি?'

'আজ্ঞে, অনেক পুরোনো জিনিস। মায়া বলে ফেলে দিতে পারছি না। ঠাকুর্দার জিনিস কিনা। বোনের বাড়িতে রেখে দেব বলে নিয়ে বেরিয়েছি।'

বুড়ো মানুষটা বিরক্ত হয়ে বলে, 'বড্ড বেশি কথা বলো তোমরা। জিনিসটা দেখাও তো একটু।'

সুবলবাবু কোটটা বৃদ্ধের হাতে দিলেন। বুড়ো মানুষটি কোটটা খুলে একটু দেখে বললেন, 'তাই তো! বড়ই পুরোনো দেখছি। ছেঁড়া, দেখি কী করা যায়।'

'আপনি কি দর্জি?'

'তাও বলতে পারো।'

'কিন্তু এটা তো সেলাইয়ের মেশিন বলে মনে হচ্ছে না?'

'এটা সেলাইয়ের মেশিন কে বলল? তার চেয়ে ঢের ভালো জিনিস।'

এই বলে বুড়ো মানুষটি মেশিনের ঢাকনা খুলে কোটটা তার মধ্যে রেখে ঢাকনা দিয়ে একটা সুইচ টিপে দিল। মেশিনটার মধ্যে একটা অদ্ভুত বোঁ বোঁ শব্দ হতে লাগল। তিনি ভয় পেয়ে ভাবলেন, এই রে! যা-ও ছিল রয়ে বসে তাও গেল বদ্যি এসে। এ যা কাণ্ড হচ্ছে যন্ত্রের ভিতরে তাতে পুরোনো কোটটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার কথা।

সুবলবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, 'ওটা ছিঁড়ে যাবে যে!'

বৃদ্ধ চোখ তুলে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, 'ছিঁড়বে কী হে! ছিঁড়ে একেবারে কুটি কুটি হয়ে রেণু রেণু হয়ে গেছে এতক্ষণে।'

'অ্যাঁ! সর্বনাশ! ঠাকুর্দার স্মৃতি যে শেষ হয়ে গেল।'

লোকটি ধমকের সুরে বললেন, 'গোড়া থেকে শুরু না করলে কি হয়? মেটেরিয়ালের এলিমেন্টে ফিরে যেতে হবে না?'

'আজ্ঞে সেটা কী?'

'রিকনস্ট্রাকশনের গোড়ার কথা। বিরক্ত করো না।

সুবলবাবু কাহিল মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ মেশিনের বোঁ বোঁ শব্দ থেমে গিয়ে একটা খচ খচ শব্দ শুরু হল।

'এটা কী হচ্ছে?'

'বুনোট।'

খচ খচ শব্দের পরে শুরু হল খটাখট শব্দ।

'আজ্ঞে এই শব্দটা?'

'মেমরি থেকে প্রোগ্রামিং হচ্ছে। তুমি বুঝবে না।'

সুবলবাবু মাথা নাড়লেন। নাঃ, পাগলের পাল্লায় পড়ে কোটটা গেল। দুঃখ করে লাভ নেই। বৃষ্টিটা থামলেই ফিরে যাবেন। কোটের মায়া ত্যাগ করাই ভালো।

কিন্তু বৃষ্টিটা জোরেই হচ্ছে। বেরোতে পারছেন না তিনি।

হঠাৎ মেশিনটা থেকে একটা চ্যাঁ চ্যাঁ শব্দ হতে লাগল। বৃদ্ধটি সুইচ টিপে যন্ত্রটা বন্ধ করলেন। তারপর ঢাকনা খুলে কোটটা বের করে সুবলবাবুর হাতে দিয়ে বললেন, 'এবার দেখ, চলবে?'

সুবলবাবু যা দেখলেন তা স্বপ্ন না বাস্তব বুঝতে পারলেন না। তাঁর হাতে ঝকমক করছে আনকোরা নতুন সার্জের সেই কোটটাই। কী জেল্লা! কী রঙ! কী চেকনাই।

'এ কী?'

বৃদ্ধটি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, 'এ আর এমন কী? সব বস্তুরই নবীকরণ হতে পারে। এই যে আমাকে দেখছ, কত বয়স বলো তো?'

'শতখানেক হবে বোধহয়, না?'

'হাঃ হাঃ, শতখানেক কিছুই নয়। পাক্কা পাঁচ হাজার বছর। তা এই আমারও নবীকরণ হয় মাঝে মাঝে। এই যন্ত্র দিয়েই।'

'উরেব্বাস! বলেন কি?'

'যা বললাম সত্যি কথা। এখন বাড়ি যাও, আমার কাজ আছে।'

বাইরে বৃষ্টিটাও ধরেছে। সুবলবাবু কোটটা কাগজে মুড়ে নিয়ে হতভম্বের মতো বললেন, 'কিছুই বুঝলাম না দাদু। আপনার ঠিকানাটা বলবেন। ফের দরকার হলে আসব।'

'পাগল নাকি? ঠিকানা দিলে রক্ষে আছে? যাও যাও। আর দেরি কোরো না।'

সুবলবাবু ভয় পেয়ে গলিতে নেমে পড়লেন। তারপর অন্ধের মতো হাঁটতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল, 'আরে' লোকটা পয়সা নিল না যে!'

সুবলবাবু ফিরে এসে দোকানটা আর দেখতে পেলেন না।

যাই হোক, একটু রাত করে যখন বাড়ি ফিরলেন সুবলবাবু তাঁর গিন্নি কোট দেখে ভারি খুশি।

সুবলবাবুও খুশি। খুশি কেন, ডবল খুশি। কিন্তু মাথা থেকে ধন্ধ ভাবটা তাঁর কিছুতেই যাচ্ছে না।

বাজি ও কুকুর

বাজির শব্দে কুকুরটা ভয় পেয়ে খাটের তলায় ঢুকেছে। আর সেখান থেকেই পরিত্রাহি আর্তনাদ করে যাচ্ছে। একটানা একঘেয়ে, স্নায়ুবিদারক। ডিউক খুবই ভালো জাতের অ্যালসেশিয়ান কুকুর। কখনও কাঁদে না বা ডাক ছেড়ে চেঁচায় না। ধমক শোনে, আদর সোহাগ বোঝে। কিন্তু কালী পুজোর দিন তার সব শিক্ষাদীক্ষা জলাঞ্জলি দিয়ে সে রাস্তার কুকুরের মতোই চেঁচায়।

রণেন অনেকবার চেষ্টা করেছেন ডিউককে ঠান্ডা করতে অন্তত চুপ করিয়ে রাখতে। পারেননি। এখন কুকুরের চিৎকারে তাঁর স্নায়ু বিকল হওয়ার জোগাড়।

ডিউকের সঙ্গে রণেনের তেমন মাখামাখি নেই। গৃহপালিত পশুপাখি তাঁর পছন্দ নয়। ছেলেবেলায় আদরের কুকুর, বেড়াল ও পাখির মৃত্যু কয়েকবার দেখেছেন, পোষা খরগোশ তাঁর কোলেই মরে গিয়েছিল। সেই থেকে তিনি আর পশুপাখি পোষেননি।

ডিউককে কোন এক কুকুর-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিনে এনেছিল তাঁর ছেলে লুকু। এনেছিল তাঁর জন্যই। বছর দেড়েক আগে রণেনের স্ত্রী রত্নাবতী আকস্মিকভাবে মারা যান। রণেন যে খুব ভেঙে পড়েছিলেন তা নয়। তবে একটু চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। লুকু ধরে নিয়েছিল, তিনি পত্নীশোকে ভেঙে পড়েছেন। নানাভাবে রত্নাবতীর শূন্য স্থান পূরণের একটা অক্ষম চেষ্টা লুকু করেছে। কাজটা সে ছেলে বলেই করেছে। কিন্তু ফলটা ভালো হয়নি। রত্নাবতী মারা যাওয়ার পর তাঁকে পুরী এবং ভুবনেশ্বর ঘুরিয়ে এনেছিল লুকু এবং তার জন্য নিজের বউ সুমিতার কাছে যথেষ্ট কটু কথা শুনেছে। আদিখ্যেতা আজকালকার মেয়েরা পছন্দ করে না। তার ওপর এই কুকুর। লুকুর ধারণা, কুকুরটা সঙ্গী হিসেবে থাকলে রণেনের মনটা একটু ভালো থাকবে। তবু লুকু পাছে দুঃখ পায় সেই ভেবে তিনি প্রথম প্রথম জোর করে কুকুরটাকে একটু একটু লাই দিতেন। তারপর সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে পড়েন। আসলে বুড়ো বয়সে একটাই অভাব থাকে। কথা বলার লোক থাকে না। আর বুকে একগাদা কথা জমে থাকে কাউকে বলবার জন্য। যেমন ছিল তাঁর নাতি জয়। কিছু বুঝত না, কিন্তু শুনত। বলতও অজস্র। ঠিক যেমন বন্ধুরা হয় আর কি।

একদিন লুকুকে তিনি বলে ফেলেছিলেন, 'জয়টা যদি কাছে থাকত তবে বেশ হত।'

লুকু অবাক হয়ে বলল, 'সেটা কী করে সম্ভব?'

রণেন জানেন, সম্ভব নয়। তাঁর একমাত্র নাতি জয়কে বছরখানেক হল নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলে যে ভর্তি করা হয়েছে। ওরকম নামী স্কুলে ভর্তি করা গেছে সেইটাই লোকে সৌভাগ্য বলে মানবে। সুতরাং তাকে আর কাছে পাওয়ার আশা করা বৃথা। তবে স্কুল বন্ধ থাকলে আসে। এখন যেমন এসেছে। তবে সেই আগের জয় আর নেই। এক বছরের মধ্যেই কেমন একটু সাবালক এবং ভারিক্কি হয়েছে। দাদু-দাদু এখনও করে বটে, কিন্তু কেমন যেন একটু কেজো মানুষ হয়ে গেছে, সেই-আঁকড়ে আবদেরে ভাবটা আর নেই।

ঘাড়ে দীর্ঘদিনের স্পন্ডেলাইটিসের ব্যথা। তবু নীচু হয়ে চৌকির তলায় কুকুরটাকে দেখবার চেষ্টা করছিলেন রণেন। গলা তুলে কেঁ-উ কেঁ-উ করে ডাকছে। সন্ধে থেকে ডাকছে বলে গলাটা কি একটু ভাঙা ভাঙা?

বাড়িতে রণেন আর রান্নাবান্নার লোকটি ছাড়া কেউ নেই। সুমিতাদের বাড়ি বাগবাজারে বিরাট কালী পুজো হয়। অনেক টাকার বাজি পোড়ে, গোটাকয়েক পাঁঠা বলি হয়। ওরা আজ ওখানেই থাকবে। তবে লুকু ফিরে আসতে পারে। সেইরকম বলে গেছে।

শিবু। শিবু। আবার ডাকলেন রণেন। এ পর্যন্ত বহুবার ডেকেছেন। শিবু ফ্ল্যাটে বা আশেপাশে নেই। রান্নাঘর খোলা পড়ে আছে, বাতি জ্বলছে। পনেরো-ষোলো বছরের ছেলেকে আজকের রাতের অন্যমনস্কতার জন্য দোষ দেওয়া যায় না। দশতলার ছাদে বাজি পোড়ানো হচ্ছে, একতলায় পুজো। তারই কোথাও গিয়ে সেঁটে আছে। ডাল-ভাত-তরকারি-ঝোল সব ওবেলাই রেঁধে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। রাতে শুধু গরম করে দেবে। রণেন রাত দশটা-সাড়ে দশটার আগে খান না। সুতরাং শিবু নিশ্চিন্ত।

রণেনের ফ্ল্যাটটা বেশ বড়ই। দেড়হাজার স্কোয়ার ফুট। সস্তাগণ্ডার সময়েও সোয়া লাখ দাম পড়েছিল। এখন হেসে খেলে ছ-সাত লাখ টাকা। রত্নাবতীর নামেই আছে। এই ফ্ল্যাটে রণেনের নিজস্ব একখানা ঘর আছে। সবচেয়ে ছোট ঘরখানাই তিনি বেছে নিয়েছেন। সেই ঘরে জিনিসপত্র বলতে গেলে কিছুই নেই। খরচ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনকেও সঙ্কুচিত করে ফেলেছেন তিনি। জামাকাপড়ের ওয়ার্ডরোব একসময়ে উপচে পড়ত। আজকাল একজোড়া হাওয়াই আর একজোড়া বেরোনোর চপ্পল। বারোটা লাইটার ছিল। সিগারেট ছেড়েছেন তিন বছর আগে। এখন একটাও লাইটার নেই। বক্স খাটটা ছেলেকে দিয়ে একখানা সাধারণ চৌকি পেতে নিয়েছেন ঘরে। আর একখানা ইজিচেয়ার। ছোট্ট একটা টেবিল। রণেনের বিষয় সম্পত্তি বলতে এইটুকুই। তবে বইপত্র কিছু আছে, কিছু সাময়িক পত্রিকা। এগুলোই তার অবসরের সঙ্গী।

কাচের শার্শি সবই বন্ধ। তবু বীভৎস লাগাতার বাজির শব্দ ঠেকানো যাচ্ছে না। এরকম ছেদহীনভাবে বাজি পোড়াতে হলে কত টাকা খরচ হতে পারে তা রণেন ভেবে পান না। তার ওপর এই শব্দ সহ্য করার জন্য শক্ত নার্ভও চাই। বাজির শব্দের সঙ্গে ডিউকের চিৎকার রণেনকে যেন খানখান করে ভেঙে ফেলেছে।

অন্য সব ঘরের দরজা বন্ধ এবং চাবি দেওয়া। কেন কে জানে, ওরা কোথাও বেরোলে ঘরগুলো সব বন্ধ করে রেখে যায়। শুধু বসার ঘর আর রান্নাঘর খোলা থাকে। রণেনের অন্য কোনও ঘরে গিয়ে আত্মরক্ষা করার উপায় নেই, বসার ঘর ছাড়া। কিন্তু বসার ঘরটা গিয়ে শেষ হয়েছে গ্রীল দেওয়া বারান্দায়। সেখানে কোনও কাচের শার্শি নেই। এই সাংঘাতিক, প্রাণঘাতী বাজির শব্দ সেখানে আটকানো যাবে না। আর তিনি গেলে ডিউকও তাঁকে অনুসরণ করবেই।

অসহায়ভাবে রণেন ইজিচেয়ারে বসে একটা ম্যাগাজিন খুলে অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভিতরটা এমন কাঁপছে, এত অস্থির লাগছে যে, উঠে পড়তে হল।

ঘাড়ের ব্যথা নিয়েই আবার নীচু হলেন। 'ডিউক! ডিউক!'

ডিউক ফিরে তাকাল এবং বলল, 'কী বলছ?'

রণেন ছিটকে পড়লেন মেঝেয়। মাথাটা ঝিমঝিম করল। আজকাল বুড়ো বয়সে কি ভীমরতি ধরল। না কি স্বপ্ন দেখছেন?

বাঁ কনুইতে একটু চোট পেলেন। তবে তেমন কিছু নয়। ফের উঠলেন রণেন। সভয়ে নিচু হয়ে ডিউকের দিকে চাইলেন। ডিউক দু'থাবার মধ্যে মাথা রেখে কেঁউ কেঁউ করে কাঁদছে।

'ডিউক!'

'তখন থেকে কেন ডাকছ! আমি বেরোব না যাও।'

বুকটা ধক করে উঠেই যেন কয়েক সেকেন্ডের জন্য থেমে গেল। তবে ফের চলল। ধড়াস ধড়াস করে। একটু শ্বাসকষ্টও হতে লাগল রণেনের।

সাবধানে আবার ডাকলেন, 'ডিউক!'

'তখন থেকে কেন যে ফ্যাচ ফ্যাচ করছ! কী চাও বলো তো!'

অবিশ্বাস্য। সম্পূর্ণ ভৌতিক! অলৌকিক! তবু রণেন এবার নিজেকে শক্ত রাখলেন। কাঁপা গলায় বললেন, 'তুই কি কথা বলতে পারিস!'

'পারি। তবে এখন কাঁদছি। কাঁদতে দাও।'

'কাঁদছিস কেন?'

'আমার পূর্বজন্মের কথা মনে পড়েছে।'

'পূর্বজন্ম? ওরকম কিছু সত্যিই আছে নাকি?'

'আছে। না থাকলে মনে পড়বে কেন?'

'পূর্বজন্মে তুই কি ছিলি? কুকুরই তো!'

'না। তবে কুকুরের অধম। বারোটা ছেলেপুলে ছিল। না খেয়ে খেয়ে, রোগে ভুগে চোখের সামনে মরেছে। দুটোকে চোর বলে পিটিয়ে মারে। একজন জেল খাটত। সে বেঁচে আছে কিনা জানি না। রাস্তার কুকুরের মতো এঁটো-কাটা খুঁটে খেতুম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতুম, কুকুরের মতোই যদি বেঁচে আছি তবে কুকুরই করলে না কেন? সেই প্রার্থনা ভগবান বোধহয় শুনেছেন। বাজির শব্দে মাথাটা কেমন টলমল করছিল, হঠাৎ সব মনে পড়ল।'

'এ জন্মে তোর কেমন লাগছে?'

'সুখে আছি, বেশ সুখে। আগের জন্মের চেয়ে ঢের ভালো মাংসের সুরুয়া খাই, গমের খিচুড়ি, সাততলায় বাস, সুখের বাকি কী? শুনলুম তোমার ছেলে আমাকে সাত'শ টাকায় কিনেছে। শুনে ভারি আনন্দ হল। আমার এত দাম হবে ভবিনি কখন।'

'চুপ, চুপ। অত টাকায় তোকে কেনা হয়েছে তা খবরদার বলিসনি। তাহলে লুকুকে তার বউ বকবে।'

'জানি লুকু কমিয়ে বলেছে। সত্তর টাকা। তাইতেও বাপান্ত হচ্ছে। কিন্তু যার জন্য কেনা হল সে তো পাত্তা দিচ্ছে না।'

'তুই মাদী নাকি?'

'তাও জানো না! আচ্ছা লোক বাপু!'

'তোর নাম যে ডিউক।'

'সে যদি তোমরা নাম দাও তাতে আমার কী করার আছে?'

'আগের জন্মে মদ্দা ছিলি?'

'না, মাদীই। বললুম না রাস্তার কুকুরের মতো জীবন ছিল।'

'খুব কষ্ট ছিল তোর!'

'এখনও আছে। বড় কষ্ট। এখন যাও ইজিচেয়ারে বসে থাকো গে আমি একটু কাঁদি।'

কাঁদ ডিউক। রণেন ইজিচেয়ারে এসে বসলেন। একাই একটু হাসলেন তিনি। খুশিই লাগছে মনটা। কথা বলার মতো একজনকে পাওয়া গেল এত দিনে। সময়টা কেটে যাবে।

কিছুক্ষণ

পতিতপাবনের দুটো গুণ। সে ভারি ভালো সাইকেল চালায় আর দুর্দান্ত ফুটবল খেলে। সাইকেল সে এতই ভালো চালায় যে, একবার মহামায়া সার্কাস তাকে সাইকেলের খেলা দেখানোর জন্য চাকরি অবধি দিতে চেয়েছিল। আর ফুটবলের কৃতিত্বও তার এতই সুবিদিত যে, কলকাতার ভালো-ভালো ক্লাব তাকে টানাটানি করতে লেগেছে। পতিতপাবনের অবশ্য বেশি বড় হওয়ার লোভটোভ নেই। সে খেলে বা সাইকেল চালিয়ে আনন্দ পায় আর তাইতেই সে খুশি।

হেমন্তের এক বিকেলে পতিতপাবন কুসুমপুরে তার বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। চার মাইল দূরে নয়াগঞ্জে আজ তার শীতলাষষ্ঠী ক্লাবের সঙ্গে গঙ্গাধরপুরের যুবকবৃন্দ ক্লাবের মধ্যে তারাময়ী স্মৃতি শিল্ডের ফাইনাল খেলা। তারাময়ী হলেন নয়াগঞ্জের জমিদার হরিকিশোরের স্বর্গগতা ঠাকুমা। শুধু শিল্ড নয়, বিজয়ী দলের প্রত্যেককে হরিকিশোর পাঁচশো টাকা করে পুরস্কার দেন, শ্রেষ্ট খেলোয়াড়কে এক ভরির সোনার মেডেল। তাছাড়া রাতের ভূরিভোজ তো আছেই। শীতলাষষ্ঠী ক্লাব গত তিন বছর তারাময়ী স্মৃতি শিল্ড জিতেছে আর পতিতপাবন তিনবারই পেয়েছে নিরেট সোনার মেডেল।

এবারও জিততে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। শীতলা ক্লাবের সবাই ভালো খেলে। পতিতের তাই দুশ্চিন্তা নেই। সে শিস দিতে দিতে সাইকেল চালাচ্ছিল।

জয়দেবের মোড় অবধি ফাঁকা রাস্তা। বেশ জোরেই চালাচ্ছিল সে। মোড়ের কাছ-বরাবর তার হঠাৎ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জেগে উঠল। মনে হল বাঁ ধার থেকে একটা কালো মোটরগাড়ি যেন বড্ড বেশি গতিতে এগিয়ে আসছে। পতিত গাড়িটা এক ঝলক নজর করে মনে মনে হিসেব করে নিল, গাড়িটা মোড় পর্যন্ত আসার আগেই সে মোড়টা ঠিক পেরিয়ে যাবে। গতিটা একটু বাড়িয়েও দিল পতিত।

সাধারণ নিয়মে মোড়টা গাড়ির আগেই পেরনোর কথা পতিতের। কিন্তু কালো গাড়িটা যেন পতিতকে ধরবে বলেই হঠাৎ স্পিড বাড়িয়ে দিল।

ঘটনাটা ঘটছিল মোড়ের কাছাকাছি। জনমনিষ্যি ছিল না রাস্তায়। গাড়িটারও ভীম গতি দেখে বিপদ বুঝে সাইকেলের ব্রেক চেপেও ধরেছিল পতিত। কিন্তু সাইকেলকে রোখা গেল না। গাড়িটা বাঁদিক থেকে ধেয়ে এসে সোজা পেল্লায় ধাক্কা মারল সাইকেলে।

পতিতের আর কিছু মনে নেই।

যখন চোখ মেলল তখন সে একটা গাড়ির সামনের সিটে বসে আছে। পাশে একজন বেশ সুদর্শন ভদ্রলোক গাড়ি চালাচ্ছেন বসে। তাকে চোখ চাইতে দেখে ভদ্রলোক বললেন, 'এই যে, কেমন আছ?'

মাথাটা আবছা লাগছে। কী হয়েছিল তা মনে পড়ছিল না পতিতের। সে বলল, 'ভালোই আছি।'

'শরীরে ব্যথাট্যথা নেই তো?'

'না। কিন্তু আপনি কে?'

'আমার নাম নির্জন সেন।'

'আমি গাড়িতে বসে আছি কেন?'

'তোমার একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল।'

'তাই নাকি! কীভাবে হল?'

'অত জানি না। দেখলাম তুমি রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছ, তাই তুলে নিলাম।'

'ও। কিন্তু আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি? হাসপাতালে নাকি?'

'না। হাসপাতালে যাওয়ার মতো কিছু হয়নি তোমার।'

সামনে বিরাট চওড়া মসৃণ পাকা রাস্তা। অদ্ভুত সব গাড়ি উলটো দিক থেকে এসে পেরিয়ে যাচ্ছে সাঁ সাঁ করে। অবশ্য বাইরের কোনও শব্দই শোনা যাচ্ছে না গাড়িতে বসে ।

পতিত হঠাৎ জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা, আমরা কোথায় যাচ্ছি যেন!'

'ফুটবল খেলতে।'

'ওঃ, তাই বলুন।'

'তুমি যে ফুটবল খেলো তা মনে আছে তো?'

'আছে। কিন্তু আর কিছু মনে নেই।'

'আর কিছু মনে রাখার দরকারটা কী? শুধু ফুটবলটা মনে রাখলেই হবে।'

'তাই নাকি? আচ্ছা, আমার বাড়ি কোথায়?'

'বাড়ির কথা ভাবছ?'

'না। আসলে আমার কিছু মনেই পড়ছে না।'

'এরকমটাই তো ভালো। মনখারাপ নয় তো?'

'নাঃ।'

'তোমার বাড়িটাড়ি কিছু নেই!'

'বাঃ, বেশ তো! এই শহরের নাম কী?'

'শহর! শহর কোথায় দেখছ? এটা তো একটা রাস্তা।'

'ওঃ, তাই তো! খেলাটা কোথায় হবে?'

'স্টেডিয়ামে। আর মাত্র দশ মাইল।'

'সেখানে কারা খেলবে?'

'দুটো ক্লাব। ক আর খ।'

'বাঃ, সুন্দর নাম। আমি কোন দলে খেলব?'

'খ দলে। আজকের খেলাটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট।'

'সব খেলাই ইম্পর্ট্যান্ট, তাই না?'

'ঠিক বলেছ। সব খেলাই ইম্পর্ট্যান্ট। তবে আজকের খেলার একটা আলাদা গুরুত্ব আছে।'

'কেন বলুন তো!'

'খ দলের সবাই নতুন। কেউ কাউকে চেনে না। আজই তারা প্রথম একসঙ্গে খেলবে।'

'বাঃ বেশ মজা তো!'

'তোমাদের জার্সির রং নীল। ক দলের জার্সি লাল। মনে থাকবে?'
সামনেই গাছপালার ফাঁক দিয়ে হঠাৎ মস্ত স্টেডিয়ামটা দেখা গেল।
'ওটা কী?'
'ওটাই স্টেডিয়াম। এক লক্ষ লোক ধরে।'
'এত লোক?'
'হ্যাঁ। স্টেডিয়াম আজ কানায় কানায় ভরা।'
'কিন্তু হইচই নেই তো?'
'না। আজকাল হইচই হয় না। সবাই মন দিয়ে খেলা দেখে, নোট নেয়, চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করে। হইচই হবে কেন?'
কথাটা খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হল পতিতের কাছে। সে বলল, 'ঠিকই তো।'
নির্জন সেন গাড়িটা স্টেডিয়ামের সিঁড়ির নীচে একটা ফটকের সামনে এনে দাঁড় করালেন।
চারদিকে একটা ঝলমলে ভাব। একটা মস্ত ড্রেসিং রুমে তাকে এনে দাঁড় করিয়ে নির্জন সেন বললেন, 'আর পনেরো মিনিটের মধ্যে খেলা শুরু হবে। ড্রেস আপ করে নাও। বুট, জার্সি সব গোছানো আছে। তৈরি হয়ে বেরিয়ে এসো। ওয়ার্ম আপ করার জন্য পাঁচ মিনিট সময় পাবে। আজ খ দলের মস্ত পরীক্ষা।'
লক্ষ্মী ছেলের মতো আদেশ পালন করল পতিত। তারপর বেরিয়ে এল। নির্জন সেন দরজার বাইরেই ছিলেন। তাকে নিয়ে মাঠের ধারে এসে বললেন, 'বাঁ ধারেরটা ক দল। ডান ধারে খ। রাইট আউটের জায়গাটা খালি দেখছ তো! ওটাই তোমার পজিশন। যাও, নামো।'
পতিত নামল।
বিশাল মাঠ, সবুজও বটে, কিন্তু মাঠে পা দিয়েই পতিত বুঝতে পারে, পায়ের নীচে মাটি নয়, একটা কৃত্রিম আস্তরণ। কিন্তু পতিতের তাতে কিছু ইতরবিশেষ মনে হল না।
কাদের বিরুদ্ধে সে খেলছে এবং সহ-খেলোয়াড়রাই বা কারা তা সে জানে না। কিন্তু তাতেও তার কোনও অসুবিধে হল না। সে এটাও লক্ষ করল, মাঠে রেফারি বা লাইন্সম্যান নেই। একপাশে একটা বিশাল বোর্ডে একটা ইলেকট্রনিক ঘড়িতে দেখাচ্ছে খেলা শুরু হতে আর পনেরো সেকেন্ড বাকি।
একটা মিষ্টি বাঁশি অলক্ষে বেজে উঠল। বিপক্ষ ক দল সেন্টার করে খেলা শুরু করে দিল।
পতিত কিছুক্ষণ বল যেদিকে সেদিকে লক্ষ করে দৌড়তে লাগল। তাকে বুঝতে হবে খেলাটা কোন গতিতে হচ্ছে এবং কোন কায়দায়। তার খ দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে যে বোঝাপড়া নেই এবং ক দল যে অতি সুসংবদ্ধ তা বুঝতে তার লহমাও লাগল না। সেন্টারের পর ক দলের খেলুড়েরা দুর্দান্ত গতিতে নিজেদের মধ্যে পাস খেলে এগিয়ে যাচ্ছে। খ দলের হাফলাইন বরাবর তারা লোক বাড়িয়ে নিয়ে খেলাটা বাঁ-দিকে উইং-এ নিয়ে যাচ্ছে। অতি, অতি দ্রুত তাদের পায়ের কাজ, নির্ভুল মাপা পাস এবং নিখুঁত জায়গা দখল। এত ভালো ফুটবল খেলা পতিত কখনও দেখেনি, তুলনায় তাদের দলকে ছন্নছাড়া, বিপর্যস্ত এবং হতচকিত মনে হচ্ছে।
বাঁদিকের উইং থেকে ক দলের লেফট আউট অতি অনায়াসে দু'জনকে কাটিয়ে বল ঠেলে দিল। ফরওয়ার্ডের একজন এগিয়ে গিয়ে সেটা গোলে প্লেস করে দিল। ১—০।
না, মাঠে কোনও চেঁচামেচি হল না, উল্লাসধ্বনি হয়। খেলা শুরুর তিন মিনিটের মধ্যে গোল। রেফারির বাঁশি বাজল। পতিত বুঝতে পারল খেলা পরিচালিত হচ্ছে নেপথ্য থেকে। সম্ভবত কম্পিউটারই এ-খেলায় রেফারি।
এবার তাদের সেন্টার। নিজেদের খেলোয়াড়দের একটু চিনে নিচ্ছে পতিত, দশ নম্বর জার্সি পরা লোকটাকে চেনা-চেনাও লাগছিল তার। সেন্টারের পর সেই দশ নম্বর লোকটা বল নিয়ে খুব মসৃণ গতিতে ক দলের গোলের দিকে এগোচ্ছিল। দু'জনকে ডাইনে-বাঁয়ে, মাইনাস করে দিল ছবির মতো। তারপর বল

বাড়াল ডান দিকে। একজন বলটা ধরতে যেতেই ক দলের একজন ঈগলের মতো বলটা তুলে নিল পায়ে। তারপর ফের অনবদ্য এবং সঙ্ঘবদ্ধ সেই চোখধাঁধানো খেলা। গতি, ছন্দ, নির্ভুল আদানপ্রদান। দশমিনিটের মাথায় ক দল দু' নম্বর গোল করে ফেলল। এরকম চললে নব্বই মিনিটে দশ-বারো গোল খেতে হবে। কিন্তু পতিতের কী করার আছে তা বুঝল না। একটা ছন্নছাড়া দল একটা সঙ্ঘবদ্ধ দলের বিরুদ্ধে খেললে তো এরকমই হওয়ার কথা।

দ্বিতীয়বার সেন্টারের পর দশ নম্বর খেলুড়ে হঠাৎ বলটা পতিতের দিকে বাড়িয়ে দিল। পতিত বলটা ট্র্যাপ করে লাইন বরাবর ছুটতে লাগল। এই প্রথম বল পেয়েছে, বেশ টগবগ করছিল সে। একজন বাধা দিতে আসছিল, তাকে একটা হাফ টার্নে কাটিয়ে একটু ভেতরে ঢুকে আবার লাইনের দিকে সরে গেল সে। কর্নার ফ্ল্যাগের কাছবরাবর বলটা সেন্টার করতে যেতেই একজন অতি তৎপর প্রতিপক্ষ অতি অবিশ্বাস্য শারীরিক দক্ষতায় শূন্যে লাফিয়ে তার শট করা বল পায়ে নামিয়ে নিয়ে ক্লিয়ার করে দিল। বোকার মতো পতিত দেখল, খেলাটা ওরা আবার ধরে নিয়েছে।

তৃতীয় গোলটা অবধারিতই ছিল। ডান ইনসাইড খেলোয়াড়ের কামানের গোলার মতো শটটা খ দলে লম্বা গোলকিপার অবশ্য ঝাঁপ খেয়ে বুকে জাপটে নিয়ে বাঁচিয়ে দিল। তবে তিন নম্বর গোলটা হল আরও পাঁচ মিনিট খেলা চলার পর। ডান ধার থেকে একটা বুলেটের মতো ফ্রি কিকে।

ক দল সারাক্ষণ চেপে আছে। খ দল হিমসিম খাচ্ছে ঘর সামাল দিতে। বল তারা ছুঁতেই পাচ্ছে না ভালো করে। পতিত এবং অন্য সব ফরওয়ার্ডরা নীচে নেমে এসেছে প্রতিরোধ করতে। আক্রমণ গেছে চুলোয়।

ফের ওই দশ নম্বর লোকটা বল পেল। পেয়েই এক আশ্চর্য পায়ের জাদুতে ক দলের তিনজন খেলোয়াড়কে পর পর কাটিয়ে নিয়ে চিতা বাঘের মতো মাঝমাঠ পেরিয়ে ছুটছে। লোকটা একা। পতিতও তাই লঘু পায়ে তীব্র গতিতে বাঁ ধার ধরে ছুটতে লাগল।

দশ নম্বরের সামনে প্রতিপক্ষের তিনজন পজিশন নিচ্ছে, দু'জন পাশে পাশে দৌড়ে আসছে, আর একজন ডিপ ডিফেন্স থেকে আসছে কোনাকুনি। লোকটার পক্ষে অতিমানব হলেও এই জাল কেটে বেরনো অসম্ভব।

পতিত যা আশা করেছিল তাই হল, লোকটা হঠাৎ বলটা তার দিকে ঠেলে দিল। পতিত বা পাঁয়ে বলটা নামিয়ে লাইন বরাবর একটু ছুটতেই গোটা ডিফেন্স তার দিকে ধেয়ে আসছিল। পতিত দেওয়াল টপকে বলটা ফেলল দশ নম্বরের পায়ে। দশ নম্বর বলটা ধরলই না, চলতি বলে বাঁ পায়ে চকিতে একটা ভলি মারল, যে ভলি দেখার জন্য লাখ টাকা খরচ করা যায়। বলটা যেন একটা বিদ্যুৎঝলকের মতো গোলে ঢুকে জালে ঢেউ তুলে দিল। ৩—১।

দশ নম্বর এগিয়ে এসে তার হাতটা নেড়ে দিয়ে বলল, 'ওয়েল ডান।'

লোকটা কে বুঝতে পারছিল না সে। কিন্তু মুখটা চেনা-চেনা ঠেকছে।

দশ নম্বর দ্বিতীয় গোলটা করল ভগবানের মতো। প্রতিপক্ষ সেন্টার করার পরই লোকটা একজন প্রতিপক্ষের পা থেকে বলটা আলতো টোকায় তুলে নিল, তারপর বুক আর কাঁধের ওপর বলটাকে এক অলৌকিক দক্ষতায় নাচাতে-নাচাতে দৌড়ে যেতে লাগল। তারপর ডান আর বাঁ পায়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ডজ। ইনস্টেপ, আউটস্টেপ দিয়ে নৃত্যের ভঙ্গিতে লোকটা একা টেনে নিয়ে গেল বলটাকে। তারপর অত্যাশ্চর্য সেই গোলটা করল বলটা বাঁ পায়ে একটু তুলে কোমরের সমান উঁচু থেকে চাঁটানো শটে। সেই শটের এত জোর যে বলটা প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু জালটা অনেকটা ফুলে উঠল সেই বলের গতিতে।

দু'গোলের পর খ দলের বিপর্যস্ত ভাবটা কেটে একটা ছন্দ এল। ধীরে ধীরে খেলাটা ধরতে পারছে তারা।

পতিত বলটা পেল দ্বিতীয় গোলের পাঁচ মিনিটের মধ্যে। মাঝমাঠ থেকে সে বল ধরে ছুটতে-ছুটতে দশ নম্বরকে বল বাড়াল। কিন্তু দশ নম্বরকে ওরা প্রায় ঘিরে ফেলেছে। বুঝতে পেরেছে, এ অতি বিপজ্জনক খেলোয়াড়। দশ নম্বর তাই বলটা ফের ফিরিয়ে দিল পতিতকে। আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে বলে পতিত বলটা ছাড়ল না। লাইন ছেড়ে হঠাৎ ডান দিকে একটা প্যারাবোলা রচনা করে সে হরিণের গতিতে তিনজন

প্রতিপক্ষকে কাটিয়ে নিল। সহজ শট নিতে একটু দ্বিধা করল সে। গোলরক্ষকটি বুদ্ধিমান। সুতরাং সে বলটা একটু তুলল, মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিল একটা বিপজ্জনক হাফভলি। এ শট সে ভালোই মারে। গোলকিপার হাঁ করে দেখল, বল জালে।

ছ'নম্বর গোলটা এল ঠিক দু'মিনিট পর। সেই দশ নম্বর। রাইট আউটের সঙ্গে পাস খেলে এগিয়ে সেন্টার থেকে ডাইভিং হেড-এ।

খেলা শেষ। কোনও হাফটাইমের বালাই নেই। খেলা শেষ হতেই ক দলের খেলোয়াড়রা কোন রন্ধ্রপথে বেরিয়ে গেল কে জানে। দাঁড়িয়ে শুধু খ দলের খেলোয়াড়রা।

নির্জন সেন এগিয়ে এসে তাদের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। একটু হেসে বললেন, 'আপনাদের একটু কষ্ট দিয়েছি। এ খেলাটা হল আপনাদের সময়ের বহু বহু বছর পর। বিভিন্ন যুগ থেকে আমরা এক-একজন খেলোয়াড়কে তুলে এনেছি। কাউকে একশো, কাউকে দেড়শো, কাউকে দুশো বা আড়াইশো-তিনশো বছর আগে থেকে। এই দু'হাজার তিনশো এক খ্রিস্টাব্দে আপনাদের খেলা আমরা রেকর্ড করে নিলাম। ফুটবলকে উন্নত করার জন্য এই ঘটনাটার দরকার ছিল।'

সবাই নির্বাক। বলে কী লোকটা!

নির্জন সেন এগিয়ে এসে দশ নম্বর খেলোয়াড়ের হাত ধরে বললেন, 'ধন্যবাদ পেলে, আপনার খেলা আমাদের মুগ্ধ করেছে।'

পেলে! নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না পতিত।

নির্জন এগিয়ে এসে তাকে বললেন, 'তুমিও দারুণ খেলেছ, আমি যে-সময় থেকে তোমাকে তুলে এনেছি তখনও তোমার নামডাক তেমন হয়নি। কিন্তু পরবর্তী কালে তুমি বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় হয়েছিলে। আমরা তোমার ওই কম বয়সের খেলাই দেখতে চেয়েছিলাম। যাকগে, এবার তোমাদের ফেরার পালা। প্রত্যেক খেলোয়াড়কে তার সময়কার পাঁচ লক্ষ টাকা বা সমমানের ডলার বা পাউন্ড পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে। আশা করি আমাদের কথা সকলের মনে থাকবে।'

নির্জন সেন তার গাড়িতেই ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন পতিতকে। সেই মোড়ের কাছে।

'ওই তোমার সাইকেল। আর ওই তোমার সময়। নিজের সময়ে ফিরে যাও পতিত। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা কোরো।'

একটু রাত হয়ে গেছে। শিল্ডের ফাইনালে খেলতে পারেনি পতিত, কিন্তু তার জন্য দুঃখ নেই। তার বদলে অভিজ্ঞতা বড় কম হল না। কিট ব্যাগে পাঁচ লাখ টাকাও কি সোজা কথা।

সাইকেল চালিয়ে পতিত বাড়ি ফিরতে লাগল।

পায়রাডাঙায় রাতে

পায়রাডাঙা স্টেশনে নবকৃষ্ণ যখন ট্রেন থেকে নামল তখন রাত দশটা। গাঁ-গঞ্জ জায়গা, সন্ধেরাতেই ঝিমিয়ে পড়ে। শীতের রাত দশটায় চারদিক একেবারে সুনসান। ট্রেনটাও বেজায় ফাঁকা ছিল। দু-চারজন যাত্রীর কেউই পায়রাডাঙায় নামল না। নবকৃষ্ণ একা।

স্টেশনটা এতই নির্জন যে, গাড়ি ছাড়বার ঘন্টিটা পর্যন্ত কেউ বাজাল না। গাড়ি নবকৃষ্ণকে নামিয়ে দিয়ে নিজেই চলে গেল। টিকিটঘর আর অফিসঘরে উঁকি দিয়ে নবকৃষ্ণ দেখল, দরজায় তালা ঝুলছে, ভেতরে অন্ধকার।

গাটা একটু ছমছম করল নবকৃষ্ণর। কৃষ্ণপক্ষের রাত। চারদিক এমন কালিচাপা অন্ধকার যে, পথঘাট চেনার জো নেই। তার শ্বশুরবাড়িটাও বেশ দূর। মাইল দুই দূর তো হবেই। রাস্তাও বেশ প্যাঁচালো। এই অন্ধকারে সেখানে পৌঁছনো শক্ত। খবর একটা পাঠিয়েছিল বটে নবকৃষ্ণ, তবে পোস্টকার্ডটা বোধহয় সময়মতো এসে পৌঁছয়নি। পৌঁছলে স্টেশনে লোক থাকত।

সুটকেস হাতে স্টেশনের বাইরে এসে নবকৃষ্ণ হতাশ চোখে ইতিউতি তাকাতে লাগল। রাস্তাঘাট দেখা বা চেনার উপায় নেই। সেই বিয়ে করতে এসেছিল তিন মাস আগে, তারপর এই দ্বিতীয়বার আসা। পথঘাট চেনার কথাও নয় তার।

কে যেন খিক করে একটু হাসল।

নবকৃষ্ণ চমকে উঠে বলল, 'কে?'

একটি মিনমিনে গলা বলে উঠল, 'ঘাবড়ে গেলেন নাকি জামাইদাদা?'

নবকৃষ্ণ একটু ভরসা পেয়ে বলল, 'অ, তাহলে চিঠি পেয়েছে ওরা! তুমিই নিতে এসেছ নাকি আমাকে? সুমুখে এসো বাপু, অন্ধকারে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না যে!'

আবার খিক করে একটু হাসি।

'জামাইদাদার কথা শুনে হাসি পায়। সুমুখেই তো দাঁড়িয়ে আছি।'

'সে কী! দেখতে পাচ্ছি না যে! কে বলো তো তুমি!'

'আজ্ঞে, অধমের নাম শ্রীদাম। বিয়ে করতে যখন এয়েছিলেন তখন যারা আপনার পালকি ঘাড়ে করে নিয়ে গিয়েছিল আমি তাদের মধ্যে একজন। ওঃ, তোফা খাইয়েছিলেন বটে আপনার শ্বশুরমশাই। এই অ্যাত বড় মাছের ল্যাজা, পাঁঠার ঠ্যাং, বড় বড় রসগোল্লা, এই অ্যাত্ত বোঁদে। ওঃ, এখনও ভাবলে যেন প্রাণ ঠান্ডা হয়।'

'তা পালকিটালকি কিছু এনেছ নাকি?'

'পালকি! না মশাই, পালকিটালকি কোথায় পাব!'

'তাহলে কি হেঁটেই যেতে হবে! টর্চ বা হ্যারিকেন আনোনি?'

'ও বাবা, আলোটালো আমার মোটেই সহ্য হয় না।'

'তাহলে যাব কী করে?'

'তাড়াহুড়োর কী আছে। আপনার শালার বিয়ে তো পরশু। এখানে এই সিঁড়িতে চেপে বসে থাকুন, দুটো সুখ-দুঃখের কথা হোক। ভোর ভোর আলো ফুটলে রওনা হয়ে যাবেন। কপাল ভালো থাকলে ওদিকপানে যাওয়ার গোরুরগাড়িও পেয়ে যেতে পারেন।'

স্টেশনে বসে থাকব! বলো কী! খিদে-তেষ্টা বলেও তো কথা আছে।'

'আ, কী কথাই শোনালেন। কতকাল আমার খিদে নেই, তেষ্টাও নেই। খিদেতেষ্টা শুনলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়।'

'খিদে পায় না! আশ্চর্য। খিদে পায় না কেন হে? পেটে বায়ু হয় নাকি?'

'আজ্ঞে, বায়ুর কথা আর কবেন না। বায়ুই তো খেয়েছে আমাকে। শুধু পেট কেন, হাত-পা-মগজ সবই বায়ুভূত কি না।'

'বাপ রে! এত বায়ু কারও হয় বলে তো জানতুম না। যাক গে বাপু, আমার আর কথা কওয়ার সময় নেই। এখনই রওনা হতে হবে। তোমার খিদেতেষ্টা না থাকলেও আমার আছে। চলো, রওনা হওয়া যাক।'

'আমি! আমি কেন যাব? আমার কী ঠেকা মশাই?'

'তুমি কি আমাকে নিতে আসোনি?'

'না তো! শ্রীদাম দাস এখন আর কারও চাকর নয়, বুঝলেন?'

'অ। তাহলে বাপু আগড়ম বাগড়ম বকে আমার সময় নষ্ট করছ কেন? আর স্টেশনেই বা এসেছ কেন?'

'সে আমার ইচ্ছে। এখন আমি কারও খাইও না, পরিও না। হাতে দেদার সময়। ইদিক-সিদিক ঘুরেটুরে বেড়াই। বেশ লাগে।'

'তা তোমার চলে কিসে?'

'কেন, চলার অসুবিধে কী? আগে খিদেতেষ্টা ছিল, তাই সমস্যাও ছিল। এখন ওই আপদ-বালাই চুকে গিয়ে দিব্যি আছি।'

'হুঁ, বুঝলুম। কিন্তু তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন বলো তো!'

'দেখবেন কী করে? শরীর থাকলে তো দেখাদেখি! আমার সে বালাইও নেই যে!'

'অ্যাঁ!'

'এতক্ষণে বুঝলেন নাকি? তিন মাস হল, সন্ন্যাস রোগে পটল তুলেছি।'

নবকৃষ্ণর ভয় পাওয়রা কথা। পাচ্ছিলও সে। কিন্তু মুশকিল হল, অন্ধকার রাত, প্রচণ্ড খিদেতেষ্টা এবং শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছনোর অনিশ্চয়তায় তার ভয়ের চেয়ে বেশি হচ্ছিল রাগ। লোকটার কথা শুনে বুকটা একটু ধড়াস ধড়াস করল বটে, কিন্তু মাথাটাও গরম হয়ে গেল। সে একটু রাগের গলায় বলল, 'মরে মাথা কিনে নিয়েছ নাকি? খুব যে চ্যাটাং চ্যাটাং কতা কইছ!'

খিক করে একটু হেসে শ্রীদাম বলল, যাক, জামাইদাদা তাহলে ভয় খেয়েছেন। গলাটা কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে।'

নবকৃষ্ণ এবার একটা হুঙ্কার ছেড়ে বলল, 'কে বলে গলা কাঁপছে! কে বলে ভয় খেয়েছি?'

'খাননি! খুব খেয়েছেন। ভয় খাওয়ারই কথা কিনা।'

নবকৃষ্ণ এবার কঠিন গলায় বলল, 'আমি কার নাতি জানো?'

'কার?'

'বটকৃষ্ণ রায়ের নাম শুনেছ?'

'আজ্ঞে না।'

'বটকৃষ্ণ রায়ের নাম না শুনেই ভূতগিরি করে বেড়াচ্ছ? বলি এ-লাইনে থাকতে হলে নামটা জেনে রাখো।'

'জামাইদাদা যে বেজায় গরম খাচ্ছেন দেখছি। তা আপনার ঠাকুর্দা এমন কে লাট-বেলাট যে তাকে সেলাম বাজাতে হবে? কারও ধার ধারি না মশাই, এই বলে রাখছি।'

'তোমার যে পাখনা গজিয়েছে তা বেশ বুঝতে পারছি। তবে অত বাড় বেড়ো না হে। বলি বাদুড়বিদ্যে কাকে বলে জানো!'

'বাদুড়বিদ্যে! না মশাই, জন্মে শুনিনি।'

'সেইজন্যই অত চ্যাটাং ট্যাটাং কথা। আমার ঠাকুর্দার এখন আটানব্বই বছর বয়স। এখনও গাছের ডালে ঝুলে হেঁটমুণ্ডু হয়ে পাক্কা ছ'ঘণ্টা ধরে প্রতিদিন সাধনা করেন।'

খিক করে একটু হাসি, শ্রীদাম বলল, 'আহা, কী কথাই শোনালেন। আমি তো সারাদিন গাছে গাছে ঝুলে থাকি।'

'তোমার ঝোলা আর বটকৃষ্ণ রায়ের ঝোলা তো এক নয়। বাপু। তিনি ঝুলে বাদুড়বিদ্যে সাধনা করেন, আর তুমি ঝুলে সময় কাটাও। শোনো হে শ্রীদাম, আমার দাদুর পাঁচশো চাকরভূত আছে। তারা সব ভালো ভূত, ফাইফরমাস খাটে, দাদুকে ভালোওবাসে খুব। আবার কিছু ব্যাদড়া পাজি ভূতও আছে তোমার মতো। দাদু মস্ত কবরেজ। দূরারোগ্য নানা ব্যাধি নিয়ে লোকে তাঁর কাছে আসে। বিটকেল একটা বাতব্যাধি আছে যার ওষুধ আয়ুর্বেদে নেই। দাদু কী করেন জানো? পাজি ভূত গোটা দশ-বারো ধরে এনে ঘুরনযন্ত্রে ফেলে চটকে ভূতের রস নিংড়ে বের করে তাই দিয়ে ওষুধ বানান। দাদুর কাছেই শুনেছি, সে ওষুধ শুধু পাজি ভূতের রস দিয়েই তৈরি করতে হয়। ভালো ভূত দিয়ে হয় না।'

এবার শ্রীদামের হাসি শোনা গেল না। বরং একটা উদ্বেগের সঙ্গেই বলল, 'এ তো অন্যায় কথা!'

'কিসের অন্যায়? মানুষের উপকারে লেগে ভূতগুলোর তো পুণ্যই হচ্ছে। তবে রস বের করার পর ছিবড়ে ভূতগুলোর খুব কষ্ট।'

'তা ভূতের ছিবড়েরা তখন কী করে?'

'কী আর করবে? আঁস্তাকুড়ে পড়ে থাকে। কুকুর বেড়াল এসে শুঁকেটুকে অপকর্ম করে যায় তাদের গায়ে। ছিবড়েদের নড়াচড়ারও ক্ষমতা থাকে না কি না। আর সেই ঘুরনযন্ত্র দেখলে তুমি মূর্ছা যাবে। বড় বড় দাঁতওলা দুটো লোহার চাকায় যখন ভূত পেষাই হয় তখন তাদের চিৎকারে কান পাতা দায়।'

এবার শ্রীদামের গলা একটু কাহিল শোনাল, 'তা ইয়ে, তাদের ধরা হয় কী করে?'

'ওই বাদুড়মন্ত্র দিয়ে। সে এমন মন্ত্র যে ভূতেরা সব পড়ি মরি করে ছুটে এসে দাদুর সামনে ধড়াস ধড়াস করে পড়তে থাকে। বাদুড়মন্ত্র বড় সাংঘাতিক জিনিস হে। তাই বলছিলুম, ভূতগিরি করো বটে, কিন্তু এখনও অনেক কিছুই জানো না দেখছি। দাদুর ইদানীং সমস্যা হয়েছে কী জানো?'

'কী সমস্যা?'

'গদাধরপুরে আর পাজি ভূত বেশি পাওয়া যাচ্ছে না। সব পেষাই হয়ে গেছে। তাই দাদু বলছিলেন, ওরে, পাজি ভূতের সন্ধান পেলে আমাকে জানাস তো। গিয়ে ধরে নিয়ে আসব।'

'তা ইয়ে, জামাইদাদা, আপনার না খিদে পেয়েছিল!'

'তা তো পেয়েইছে।'

'তাহলে আর দেরি করা ঠিক হবে না। চলুন পথটা দেখিয়ে নিয়ে যাই। দিন, সুটকেসটা আমাকে দিন।'

'না হে, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না।'

'না, না, ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন। জামাই বলে কথা। আসুন, পৌঁছে দিচ্ছি, লহমাও লাগবে না।'

তা লাগল না। হঠাৎ যেন একটা বাতাসের ঘোড়া তাকে পিঠে চাপিয়ে একেবারে উড়িয়ে নিয়ে চলল। নবকৃষ্ণ ভালো করে টের পাওয়ার আগেই দেখতে পেল, সে শ্বশুরবাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

বিয়েবাড়িতে লোকজন সব জেগেই ছিল। তাকে দেখে হইচই পড়ে গেল খুব।

শুধু নবকৃষ্ণের কানে কানে কে যেন বলল, 'ঠাকুর্দাকে আমার হদিস আবার দিয়ে দেবেন না তো!'

নবকৃষ্ণ গম্ভীরভাবে বলল, 'ঠিক আছে। আর যেন...'

'আজ্ঞে, কী যে বলেন! আর কখনও বেয়াদবি দেখবেন না।'

দেখা হবে

নক্সীকাঁথার মতো বিচিত্র এক পৃথিবী ছিল আমাদের শৈশবে। এখনও পায়ের তলার পৃথিবীর মাটি, চারিদিকে গাছপালা, মাথার উপর আকাশ। বুক ভরে শ্বাস টেনে দেখি। না, শীতের সকালে কুয়াশায় ভেজা বাগান থেকে যে রহস্যময় বন্য গন্ধটি পাওয়া যেত তা আর পাওয়া যায় না। আমাদের সাঁওতাল মালী বিকেলের দিকে পাতা পুড়িয়ে আগুন জ্বালত। সেই গন্ধ কতবার আমাকে ভিন্ন এক জন্মের স্মৃতির দিকে টেনে নিয়ে গেছে। আর মনে আছে মায়ের গায়ের ঘ্রাণ। সে গন্ধে ঘুমের ভেতরেও টের পেতাম, মা অনেক রাতে বিছানায় এল। মার দিকে পাশ ফিরে শুতাম ঠিক। তখন নতুন ক্লাশে উঠে নতুন বই পেতাম ফি বছর। কী সুঘ্রাণ ছিল সেই নতুন বইয়ের পাতায়। মনে পড়ে বর্ষায় কদম ফুল কুড়িয়ে এনে বল খেলা। হাতে পায়ে কদমের রেণু লেগে থাকত বুঝি। কী ছিল! কী থাকে মানুষের শৈশবে! বিকেলের আলো মরে এল যেই অমনি পৃথিবীটা চলে যেত ভূতেদের হাতে। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়া ছিল ভারি শক্ত। বিশাল বাড়িতে কয়েকটি প্রাণী আমরা গায়ে গায়ে ঘেঁষে থাকতাম। ভোরের আলোটি ফুটতে না ফুটতে ঘুম ভেঙে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে ছুটতাম বাইরে। বাইরেটাই ছিল বিস্ময়ের। সূর্য উঠছে, আকাশটা নীল, গাছপালা সবুজ। সব ঠিক আগের দিনের মতোই। তবু অবাক হয়ে দেখতাম, মনে হত, গতকাল ঠিক এরকম দেখিনি তো। সেই আনন্দিত ছেলেবেলায় একটা দুঃখের ঘটনা ঘটে গেল। আমার ছোটকাকা মৃত্যুশয্যায়। মাত্র দেড় বছর আগে কাকীমা এসেছেন ঘরে। একটি ফুটফুটে মেয়েও হয়েছে! সে তখন হাত পা নেড়ে উপুড় হয়, কত আহ্লাদের শব্দ করে! তবু বৌ-মেয়ে রেখে ছোটকাকার মরণ ঘনিয়ে এল। বিকেলে শ্বাস উঠে গেছে। দাদু তখন বাইরের বারান্দায় বসে আছেন। বাঁ-হাতে ধরা তামাকের নল, কল্কেতে আগুন নিভে গেছে কখন। সন্ধের পর জ্যোৎস্না উঠেছে সেদিন। দাদু সেই জ্যোৎস্নায় পা মেলে বসে আছেন। ভিতর বাড়িতে কান্নার শব্দ উঠেছে। বাবা আর জ্যাঠামশাইরা এসে দাদুকে ডাকলেন।

—'আসুন, প্রিয়নাথকে একবার দেখবেন না?'

দাদু খড়মের শব্দ তুলে ভিতর বাড়িতে এলেন। তার মুখখানা একটু ভার দেখাচ্ছিল, আর কিছু নয়। ছোটকাকা তখন বড় বড় চোখে চারিদিকে তাকাচ্ছেন। কাকে যেন খুঁজছেন। কী যেন খুঁজে পাচ্ছেন না। বার-বার বলছেন—'তোমরা সব চুপ করে আছ কেন? কিছু বলো, আমাকে কিছু বলো।'

জ্যাঠামশাই নীচু হয়ে বললেন—কী শুনতে চাও প্রিয়নাথ?

ছোটকাকা ক্লান্ত, বিরক্ত হয়ে বললেন—আমি কি জানি! একটা ভালো কথা, একটা সুন্দর কথা কিছু আমাকে বলো, আমার কষ্ট ভুলিয়ে দাও। আমি কেন এই বয়সে সবাইকে ছেড়ে যাচ্ছি—আমার মেয়ে রইল, বৌ রইল—আমার এই কষ্টের সময় কেউ কোনো সুখের কথা বলতে পারো না?

বড়ো কঠিন সেই পরীক্ষা। কেউ কিছু বলতে পারে না। সবাই কেবল মরণোন্মুখ মানুষটার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, কথা খুঁজে পায় না। কিন্তু প্রত্যেকেরই ঠোঁট কাঁপে।

একজন অতি কষ্টে বলল—'তুমি ভালো হয়ে যাবে প্রিয়নাথ। শুনে ছোটকাকা থমকে বললেন—যাও যাও —।'

আর একজন বলল—'তোমার মেয়ে বৌকে আমরা দেখব, ভয় নেই।'

শুনে ছোটকাকা মুখ বিকৃত করে বললেন—'আঃ, তা তো জানিই, অন্য কিছু বলো।'

কেউ কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।

সেই সময় দাদু ঘরে এলেন। স্বাভাবিক ধীর পায়ে এসে বসলেন ছোটকাকার বিছানার পাশে। ছোটকাকা মুখ ফিরিয়ে তাঁকে দেখে বললেন—বাবা, সারাজীবন আপনি কোনো ভালো কথা বলেননি, কেবল শাসন করেছেন। এবার বলুন।

সবাই নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতায় একটা পাহাড়প্রমাণ ঢেউ অদৃশ্য থেকে এগিয়ে আসছে। ছোটকাকাকে জীবনের তীরভূমি থেকে অথৈ অন্ধকারে এক সমুদ্রের দিকে নিয়ে যাবে বলে ঢেউটা আসছে, আসছে। আর সময় নেই। ছোটকাকার জিভটা এলিয়ে পড়েছে, বার বার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, মুখ প্রবল ব্যথায় বিকৃত!

দাদু একটু ঝুঁকে শান্ত স্বরে বললেন—'প্রিয়নাথ, আবার দেখা হবে।'

কী ছিল সেই কথায়! কিছুই না। অতিথি অভ্যাগতকে বিদায় দেওয়ার সময় মানুষ যেমন বলে, তেমনি সাধারণভাবে বলা। তবু সেই কথা শুনে মৃত্যুপথযাত্রী ছোটকাকার মুখ হঠাৎ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে গেল। তিনি শান্তভাবে চোখ বুজলেন। ঘুমিয়ে পড়লেন।

এসব অনেকদিন আগেকার কথা। নক্সীকাঁথার মতো বিচিত্র সুন্দর শৈশবের পৃথিবী কোথায় হারিয়ে গেছে। সেই সুন্দর গন্ধগুলো আর পাই না, তেমন ভোর আর আসে না। মায়ের গায়ের সুঘ্রানের জন্য প্রাণ আনচান করে! পৃথিবী বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে ক্রমে। বুড়ো গাছের মতো শুকিয়ে যাচ্ছে আমার ডালপালা। খসে যাচ্ছে পাতা। মহাকালের অন্তঃস্থলে তৈরি হচ্ছে একটি ঢেউ। একদিন যে এই পৃথিবীর তীরভূমি থেকে আমায় নিয়ে যাবে।

বুকের মধ্যে শৈশবের একটি কথা তীরের মতো বিঁধে থরথর করে কাঁপছে আজও। সেই অমোঘ ঢেউটিকে যখনই প্রত্যক্ষ করি, মনে মনে তখনই ওই কথাটি বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। শৈশবের সব ঘ্রাণ, শব্দ ও স্পর্শ ফিরিয়ে আনে। মায়ের গায়ের ঘ্রাণ পেয়ে যেমন ছেলেবেলায় পাশ ফিরতাম তেমনি আবার পৃথিবীর দিকে পাশ ফিরে শুই। মনে হয়, দেখা হবে। আবার আমাদের দেখা হবে।

আকাশ গঙ্গা

লোকের সঙ্গে ভাব ভালোবাসা করতে নরহরি খুবই ভালোবাসে। ভাব জমানোর নানা ফিকিরও জানা আছে তার। শনিবার ডাউন বর্ধমান-কলকাতা লোকালে উঠে দেখল কামরাটা বড়ই ফাঁকা। জনমনিষ্যি নেই। এধার-ওধার খুঁজে সে দেখল জানালার কাছে একজন মাত্র বসে বসে ঝিমোচ্ছে। নরহরি গিয়ে তার পাশটিতেই বসল। একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বিনয়ের সঙ্গে দেখল মুখখানা খুব চেনা-চেনা ঠেকছে যে! লোকটা নিমীলিত চোখে তাকে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'চেনা লোককে তো চেনা-চেনা দেখবারই কথা!'

নরহরি কস্মিনকালেও এই মুশকো চেহারার ফ্যালা ভুঁড়ো গোঁফওয়ালা লোকটাকে দেখেনি। তবু খুশি হয়ে বলল, 'তা যা বলেছেন। কতকাল পরে দেখা!'

কিছু বলতে হয় বলেই বলা। কথা না কইলে নরহরির বড় হাঁসফাঁস লাগে। তবে ভাব জমাতে হলে ভুল ভাল, সত্যি-মিথ্যে যা হোক কিছু বললেই হল।

লোকটা ঝিমোতে ঝিমোতে বলল, 'হ্যাঁ, এক বছর তিনমাস সতেরো দিন পর।'

নরহরি এ-কথায় একটু হাঁ হল। ও বাবা! এ যে একেবারে দিনক্ষণ অবধি বলছে!

তবু নরহরি বেশ অমায়িকভাবেই বলল, 'হ্যাঁ, তা হবে। তা বাড়ির সবাই ভালো তো!'

লোকটা ফের নিমীলিত চোখে একবার নরহরিকে দেখে নিয়ে বলল, 'বাড়ি? বাড়ির কথা আর বলবেন না মশাই। তাদের হাল কী হয়েছে তা ভগবানই জানেন।'

'বাড়ির খবর পাচ্ছেন না বুঝি! তা গিয়ে ঘুরে আসুন না একবার। বাড়ি দূর তো আর নয়।'

'দূর! না, দূর আর এমন কি! আসলে ফুরসৎ পাচ্ছি কোথায় বলুন।'

'তা অবশ্যি ঠিক। আপনি তো কাজের লোক, তা সেই পুরোনো চাকরিই করছেন এখনও?'

'তাছাড়া আর কী? চাকরিটা তেমন খারাপ ছিল না মশাই। তবে এই বুড়ো মা-বাবা, বউ-বাচ্চাদের ছেড়ে বিদেশ বিভুঁইয়ে পড়ে থাকাটাই বড্ড খারাপ লাগে।'

একটা স্টেশনে ট্রেন থামতেই একটা চাওলা ছোকরা উঠল।

নরহরি বলল, 'একটু চা ইচ্ছে করবেন নাকি? ভাদ্র মাসের শেষে এবার একটু ঠান্ডাই পড়ে গেছে।'

'তা নিন একটু চা।'

চা খেতে খেতে নরহরি বলল, 'তা কতকাল বাড়ি যাওয়া হয়নি আপনার?'

'তা বেশ অনেকদিনই হয়ে গেল। দু-আড়াইশো বছর হবে।'

চা খেয়ে লোকটির ঝিমুনি কেটেছে। হাঃ হাঃ করে হেসে বলল, 'দু'আড়াই বছর হলে তো কথাই ছিল না মশাই। সে তো নস্যি। আমি কি তাই বললুম আপনাকে?'

'তাহলে?'

'দু'আড়াইশো বছরের কথাই বলছি। এতদিনে মা-বাবা আরও একটু বুড়ো হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। ছোট মেয়েটা তখন হামা দিয়ে বেড়াত, এখন নিশ্চয়ই হেঁটে চলে বেড়ায়। রাঙী গাইটার বিয়োনোর কথা ছিল, তা তার বাছুরটাও বোধহয় এতদিনে বড় হয়ে গেছে। গোয়ালঘরের পিছনে কলমের গাছটা ছোট ছিল, এখন নিশ্চয়ই ফল দিতে শুরু করেছে।'

লোকটা পাগলই হবে। তবে ভয়ঙ্কর পাগলকেই যা ভয়। অল্পস্বল্প পাগলকে নরহরি সামাল দিতে পারবে। তাই সে ভারি বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, অনেকদিনের পাল্লা তো, ওরকম হতেই পারে। তা আপনার গ্রামটি কি বাঁকড়ো না মেদিনীপুরে?'

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, 'কোনওটাই নয়, আমার জেলা হল হরেকেষ্টপুর, থানা শিকরগাছা, গাঁয়ের নাম কালীতলা।'

'হরেকেষ্টপুর! এরকম জেলার নাম তো শুনেছি বলে মনে পড়ছে না।'

'খুব বড় জেলা মশাই। আড়ে দীঘে এতই বড় যে আপনাদের এগারোটা বর্ধমান জেলা তাতে অনায়াসে ঢুকে যাবে।'

নরহরি অবাক হয়ে বলে, 'ওরে বাবা! তা কোন লাইনে যেতে হয় বলুন তো! একবার না হয় ঘুরেই আসা যাবে।'

'কাজটা শক্ত হবে। পরাণ মাঝির খেয়া ছয়মাসে একবার করে এখানে ক্ষেপ মারে। তা সে খেয়ায় সবসময়ে জায়গা পাওয়া যায় না। মোটে বারোশো লোক বসবার জায়গা আছে।'

চোখ কপালে তুলে নরহরি বলল, 'খেয়া নৌকোয় বারোশো লোক! সেটা কি নৌকো, না জাহাজ?'

'আদর করে খেয়া বলে বটে সবাই। তবে সেখানা বেশ বড়সড় ব্যাপারই বটে।'

'তা মশাই, খেয়া নৌকো তো আমাদের দামোদরেও ক্ষেপ মারে। দিনে অগুনতিবার এপার-ওপার করছে। কিন্তু আপনাদের পরাণ মাঝি ছ'মাসে একবার ক্ষেপ মারে কেন?'

'পাল্লাটাও তো দেখতে হবে। তা ধরুন এ মুড়ো ও মুড়ো ধরলে লক্ষ কোটি মাইলের তফাৎ।'

'এ যে দুনিয়াজোড়া কথা মশাই।'

'যে আজ্ঞে। দুনিয়াজোড়া কথাই তো।'

'নদীটার নাম কি বলুন তো।'

'আমরা তো বলি আকাশ গঙ্গা।'

'আকাশ গঙ্গা! না দাদা, এরকম নদীর নাম শুনিনি।'

'না শুনলেও দেখেছেন তো বটেই।'

'দেখেছি নাকি?'

'না দেখার কী আছে বলুন। চোখের সামনেই বুক চিতিয়ে পড়ে আছে। জলটল নেই অবশ্য, শুধু খাত।'

'বলেন কি, জলছাড়া নদী! তা তাতে আবার খেয়া! না দাদা, আমার মাথায় সেঁধোচ্ছে না।'

লোকটা ভারি হাঃ হাঃ করে হাসল। বলল, 'আকাশ গঙ্গা কি যে সে নদী! তার দেমাকই আলাদা।'

'নদীটা কি আমাদের বর্ধমানের লাইনেই পড়বে মশাই?'

'তা পড়বে না কেন? আকাশ গঙ্গার ঘাট সর্বত্র। ওপর পানে তাকালেই তো আকাশ গঙ্গা মশাই। একেবারে ভগবানের রাজ্যে। ও নদীর কোনও কূলকিনারা নেই। কোথাও শুরু হয় না, কোথাও শেষ হয় না।'

'আপনি বোধহয় ঠাট্টা করছেন।'

'আমি ঠাট্টা করার কে? ঠাট্টা যদি বলেন তো সেটা ভগবানেরই ঠাট্টা। অত বড় আকাশখানা আমাদের মুখের ওপর ছুঁড়ে দেওয়ার কোনও মানে হয় বলুন! আমরা ছোটখাটো মানুষ সব, আকাশখানার বহর দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ারই তো কথা।'

নরহরি এবার খুব সন্তর্পণে বলল, 'আপনার আকাশ গঙ্গা কি তাহলে আকাশের নদী মশাই?'

'তাই বটে।'

'সেটাকেই কি আকাশকুসুম বলে?'

'তাও বলতে পারেন। সন্ধেরাতের দিকে পুবমুখো দাঁড়িয়ে বাঁ হাতে কোনাকুনি যে লালচে তারাটাকে দেখতে পাবেন, ওরই কাছেপিঠে আমার গাঁ। ভারি ভালো গ্রাম মশাই। হপ্তায় তিন দিন হাট বসে। শিবরাত্তি, চড়ক, রথ, আরও সব পালে-পার্বণে বিরাট মেলা বসে। জাগ্রত রক্ষাকালীর থান আছে। লাগোয়া দ্বাদশ শিবের মন্দির। রথযাত্রায় দুশো ফুট উঁচু রথ বেরোয়।'

নরহরির বাক্য শেষ হয়ে গেল। এ পাগলের সঙ্গে কথা কওয়ার মানেই হয় না। সে পিছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজে ফেলল। মাথাটা ঘুরছে।

'মশাই কি ঘুমোলেন?'

'আজ্ঞে একটু ঝিমুনি আসছে বটে।'

'তাহলে ঘুমোন। আমি পরের স্টেশন মশাগ্রামেই নেমে যাব।'

'তা বেশ।'

'শুধু নামবার আগে একটা কথা।'

'কী বলুন তো।'

'এক বছর তিন মাস তেরো দিন আগে এই ট্রেনেই এমনি রাতের বেলা আপনি আমার ঘুম ভাঙিয়ে খেজুড়ে আলাপ জুড়েছিলেন, মনে আছে?'

নরহরি শশব্যস্তে বলল, 'তাই নাকি?'

'যে আজ্ঞে। তাই তক্কে তক্কে ছিলাম আজ সুযোগ পেয়ে একটু পাল্টি দিয়ে গেলাম আর কি। ভবিষ্যতে আর বোধহয় আপনি আমার ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করবেন না।'

নরহরি ভারি খুশি হয়ে হাত কচলে বলল, 'আজ্ঞে না। কস্মিনকালেও না।'

নতুন গ্রহ

এতদ্দ্বারা নভশ্চরদিগকে জানানো যাইতেছে যে, সম্প্রতি সতেরো নম্বর নভো মহাসড়কে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল হইতে মাত্র চারি লক্ষ মাইল দূরে একটি পুঞ্জীভূত কঠিন বস্তু আসিয়া পড়িয়াছে। ইহা কয়েকটি গ্রহাণুর একীভূত রূপ হইতে পারে। মহাকাশে চংক্রমণশীল আমাদের দূরবীক্ষণে ইহাকে গোলাকার বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। ব্যাস আনুমানিক পাঁচশত মাইল। নভশ্চরগণ, ইহার কিছু মাধ্যাকর্ষণও রহিয়াছে। সুতরাং আপনারা সতেরো নম্বর নভোসড়কে গতায়াতের সময় এই বস্তুটিকে লক্ষ রাখিবেন। আমরা এই বস্তুটি সম্পর্কে আগ্রহী, কৌতূহলী। অধিক নিকটে যাইবেন না, বিপদ ঘটিতে পারে।

যাদববাবু মহাকাশের একটি কূট অঞ্চল থেকে পৃথিবীতে ফিরছিলেন। তাঁর মন অত্যন্ত খারাপ। এই একান্ন বছর বয়সে তাঁর মনে হচ্ছে আর বেঁচে থাকার কোনও মানে নেই। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কেউই তাঁকে কোনও গুরুত্ব দেয় না। কাজেকর্মেও তিনি তেমন কৃতবিদ্য নন বলে কারও কাছে পাত্তা পান না। তিনি আজ অবধি কোনও পুরস্কার পাননি, প্রমোশনও জোটেনি। তিনি টের পাচ্ছেন, দিন-দিন তিনি আরও ভোঁতা এবং নির্বোধ হয়ে যাচ্ছেন। মহাকাশের যে অঞ্চলে তাঁকে প্রায়ই পাঠানো হয় সেটি একটি অন্ধকার বিটকেল অঞ্চল। একটি নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে নির্গত গামা রশ্মির পরিমাণ করাই তাঁর কাজ। সেই কাজটি যে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় তা তিনি ভালোই বোঝেন। কারণ গামা রশ্মি সম্পর্কিত তাঁর রিপোর্ট বেশিরভাগ সময় কম্পিউটারে ফিড করাও হয় না। অফিসে তাঁকে নিয়ে আড়ালে-আবডালে ঠাট্টা-মশকরাও হয় বলে তিনি জানেন।

তাঁর মহাকাশযানটিও সেকেলে। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি কিছুই প্রায় নেই। আজকাল যে আলোর চেয়েও পঞ্চাশগুণ গতিসম্পন্ন যান বেরিয়েছে তা তাঁকে দেওয়া হয়নি।

তিনি একবার তাঁর বস টম সাহেবকে বলেছিলেন, 'স্যার, আমাকে একটা ওরকম গাড়ি দিলে অনেকটা সময় বাঁচে।'

টম সাহেব ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'ও গাড়ি দিয়ে তোমার আবার কিসের কাজ? ওসব জিনিস তুমি হ্যান্ডেলই করতে পারবে না।'

'আজ্ঞে আমার নক্ষত্রপুঞ্জটা বেশ দূর।'

'তা হোক না দূর, তোমার তো সময়ের অভাব নেই।'

'একা একা অন্ধকারে দিনের পর দিন কাটানো বড় একঘেয়ে।'

'সব কাজই একঘেয়ে। ও কাজ করতে না চাও তো অফিসে বসে কেরানির কাজ করতে পারো।'

যাদববাবু জানেন, সেটা আরও খারাপ দেখাবে, লজ্জার ব্যাপার হবে। তাই তিনি পালিয়ে এলেন।

এই যে তিনি মহাকাশে মাসের পর মাস থেকে তারপর একদিন বাড়ি ফিরে আসেন তাতে যে বাড়ির লোক—অর্থাৎ স্ত্রী ও সন্তানেরা খুব যে উল্লসিত হয় তা নয়। বরং তাঁকে দেখে স্ত্রী এমন মুখভঙ্গি করেন তাতে বোঝা যায় যে বলতে চাইছেন, ওই এলেন! বড্ড অপমান লাগে যাদববাবুর। তিনি নিরীহ মানুষ বলে সবই সয়ে নেন। তিনি জানেন তাঁর ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই। তাঁকে কেউ পছন্দও করে না।

আজ তাঁর মন বড়ই বিমর্ষ। আকাশের কূট অঞ্চলে দিনের পর দিন নির্বাসন ভোগ করা, নিঃসঙ্গতা তাঁকে কাহিল করে ফেলেছে।

এবার যে তিনি তিন মাস ওই অঞ্চলে ছিলেন তার বেশিরভাগ সময়ই কাটিয়েছেন চিন্তা করে। নিজের জীবনের ব্যর্থতার কথাই ভেবেছেন। এই তিন মাস পৃথিবী থেকে কেউ তাঁর কোনও খোঁজ নেয়নি। বাঁচলেন না মরলেন, শরীর ভালো আছে কিনা, কোনওরকম অসুবিধে হচ্ছে কিনা তাও কেউ জানতে চায়নি। ঘোর অন্ধকার এবং ঘোর একাকীত্বের মধ্যে বসে তিনি ভেবেছেন, দেহযুক্ত এবং বস্তুযুক্ত জীবনই নানা দুঃখের আকর।

তিন মাস পর কাজের শেষে তিনি নিরানন্দভাবে পৃথিবীতে ফেরার পথে ঘোষণাটি শুনলেন। সতেরো নম্বর নভোসড়কে একটি বস্তুপিণ্ড এসে পড়েছে। তেমন গা করলেন না। তিনিও সতেরো নম্বর সড়কপথেই ফিরছেন। ভাবলেন যদি ধাক্কা খেয়ে মরেন তাহলে ভালোই হয়।

বেশ দূর থেকেই তিনি বস্তুটিকে দেখতে পেলেন। সৌরবলয়ের মধ্যেই ভেসে আছে গোলাকার ছোট্ট গ্রহাণুটি। একপাশে সূর্যের আলো পড়ে আধখানা দেখাচ্ছে। যাদববাবু যানের গতি কমিয়ে দিলেন এবং ধীরে ধীরে গ্রহাণুটির দিকে এগিয়ে গেলেন। গ্রহাণুটির চারপাশে চক্কর দিয়ে তাঁর বেশ পছন্দই হলো জায়গাটা। ছোটখাটো পাহাড় আছে, ছোট ছোট উপত্যকাও দেখা যাচ্ছে। স্ক্যান করে তাঁর মনে হল গ্রহাণুটিতে একসময়ে জল আর উদ্ভিদও ছিল। খুবই অবাক হলেন তিনি। এইটুকু একরত্তি একটা গ্রহে এসব হওয়ার তো কথা নয়!

তবে যাই হোক, মরার পক্ষে এই গ্রহটি ভারি ভালো। নভশ্চরদের মরতে বেশি সময় লাগে না। মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে গায়ের আকাশচারীর পোশাকটি খুলে ফেললেই মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যু।

মনটা স্থির করে ফেললেন যাদববাবু। এই ব্যর্থ জীবন আর রাখবেন না। মহাকাশযানটি ধীরে ধীরে নামিয়ে আনলেন। তারপর বহির্গমনের সুড়ঙ্গপথটি বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলেন। দরজাটি খুলে একটি লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন মাটিতে। চারদিকে চেয়ে একটু দেখে নিলেন। যা দেখলেন তাতে খুবই বিস্মিত হলেন তিনি। আপাত ঊষর বলে মনে হলেও, পাথরের খাঁজে খাঁজে সবজে এবং কালচে কিছু উদ্ভিদ যেন চোখে পড়ল তাঁর। আর চোখের ভুল কিনা কে জানে, একটা পাথরের চাঙারের নীচে তিনি একটু জলও দেখতে পেলেন কি?

মরার কথা ভুলে ব্যাপারটা ভালো করে দেখার জন্যই যাদববাবু তাড়াতাড়ি তাঁর মহাকাশের পোশাক খুলে ফেললেন। মাথার ঢাকনাটিও খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে দেখলেন, বাস্তবিকই, পাথরের খাঁজে জল জমে আছে। এক কোষ জল তুলে মুখে দিয়ে দেখলেন ভারি সুস্বাদু জল। গাছগুলোতে হাত দিয়ে দেখলেন সেগুলো বাস্তবিকই উদ্ভিদ এবং হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, মহাকাশচারীর পোশাক খুলে ফেলার পরও তিনি মরেননি এবং শ্বাসক্রিয়াও বন্ধ হয়নি অক্সিজেনের অভাবে।

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল, 'যাদব ঘোষাল নাকি হে?'

যাদববাবু চমকে উঠে পিছন ফিরে যাঁকে দেখলেন তিনি বহুকাল আগে মহাকাশে হারিয়ে যাওয়া বৈজ্ঞানিক হারাধন হালদার। হারাধনকে দেখে তাঁর ভিরমি খাওয়ার যোগাড়।

'আ-আপনি?'

'ভূত নই হে, সশরীরে হারাধন হালদারই বটে। তা তুমি কোত্থেকে এসে উদয় হলে?'

মাথাটা ঘুরছিল যাদববাবুর। মাথা চেপে ধরে বললেন, 'আপনি এখানে বেঁচে আছেন কি করে? এখানে কি আবহমণ্ডল আছে? জল? খাবার?'

'তা না হলে বাঁচব কি করে হে? এখানে সব আছে। আবহমণ্ডল না থাকলে মহাকাশের পোশাক খুলে ফেলার পরও তুমি বেঁচে আছ কি করে?'

'তাও তো বটে! বলে যাদববাবু মাথা চুলকোলেন।'

হারাধন হালদার হেসে বললেন, 'আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে মহাকাশে ক্ষেপ মারতে মারতে একদিন জীবনের ওপর ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। তখনই সৌরমণ্ডলের এই অজানা গ্রহটির সন্ধান পাই। ছোট বলে কারও নজরে পড়েনি কখনও। বিজ্ঞান-টিজ্ঞান ছেড়ে একটু আরামে বেঁচে থাকার জন্য এখানেই থানা গাড়ি। এখানে আমিই রাজা।'

আমতা-আমতা করে যাদববাবু বললেন, 'তা এখানে কি লোকজনও আছে নাকি?'

'তা থাকবে না কেন? দেড়-দুই ফুট লম্বা মানুষজন আছে। সংখ্যায় মেরেকেটে হাজার পাঁচেক। গরু-ছাগলের মতো জীবজন্তুও আছে। সবই ছোট মাপের।'

দেখতে দেখতে পাথরের নানা খানাখণ্ড থেকে পিল পিল করে ছোট ছোট পুতুলের মতো মানুষ বেরিয়ে এসে তাঁদের ঘিরে দাঁড়াল।

হারাধন বললেন, 'এরা লোকও ভালো। এখানে ফলমূল, শস্য সবই হয়। খুব শান্তির জায়গা।'

বলতে-বলতে হঠাৎ অন্ধকার হয়ে আসছিল। যাদববাবু বললেন, 'সন্ধে হয়ে এল নাকি?'

'হ্যাঁ। ছোট্ট গ্রহ, দু'ঘণ্টা রাত, দু'ঘণ্টা দিন। কিন্তু রাতের বেলা তেমন অন্ধকার হয় না বেশ আলো থাকে।'

'এখানে কি সমুদ্র-টমুদ্র আছে?'

'না রে ভাই। ওসব তো নেইই, এমনকী নদীনালা-পুকুরও নেই। এক ধরনের স্পঞ্জ পাথরের মধ্যে জল হয়। নরম পাথর, নিংড়োলে জল বেরোয়। মাটি খুঁড়লেও জল পাওয়া যায়। এখানে শীত-গ্রীষ্ম নেই, চির বসন্তের দেশ। খুব ভালো আছি হে ভায়া, দিব্যি আছি। বয়স প্রায় নব্বই হতে চলল, এখনও জরা-ব্যাধি বলে কিছু টের পাই না। এখানে সর্দি লাগে না কারো, অন্য অসুখ তো ক্যা কথা।'

'তা হারাধনদা, আমাকেও যদি এই গ্রহে একটু ঠাঁই দেন বড় ভালো হয় তবে।'

'পাগল নাকি? দিব্যি একা একা আছি, এখানে কাউকে ভাগ বসাতে দেব না।'

যাদববাবু বললেন, 'কিন্তু কতদিন একা থাকবেন দাদা, পৃথিবীর মানুষ যে এ গ্রহের সন্ধান পেয়ে গেছে! একটু আগেই ঘোষণা করা হয়েছে তারা এই গ্রহ সম্পর্কে আগ্রহী।'

হারাধনের মুখ শুকোলো, 'বলো কি?'

'আজ্ঞে সত্যি কথাই বলছি। তারা এল বলে!'

হারাধন একটু চুকচুক শব্দ করে বললেন, 'দুঃখের কথা। তবে সব জিনিসেরই ভালো-মন্দ দুটো দিক আছে। বহুকাল পায়েস খাইনি, ঢেঁকি শাক খাইনি, কড়াইশুঁটির কচুরি খাইনি। আমার গিন্নি চমৎকার মুড়িঘণ্ট রাঁধত— সেটারও স্বাদ ভুলতে বসেছি। তাছাড়া সমুদ্রের ধার বা নদীর কিনারা বা গাছতলা এসবও তো এখানে নেই। মনটা মাঝে মাঝে হু হু করে। আসল কথা কি জানো? পালিয়ে থাকা যায় বটে, কিন্তু পালিয়ে বাঁচা যায় না।'

'তাহলে কী করবেন?'

ফিরেই যাই চলো। এই গ্রহটাকে যাতে ওরা নষ্ট না করে তার ব্যবস্থাও করতে হবে। তুমি আর আমি মিলে ওদের বোঝাতে পারব। আর মাঝে মাঝে এসে হাঁফ ছেড়ে যাব।

হারাধন হালদারকে নিয়ে যাদব ঘোষাল পৃথিবীতে ফিরে আসার পর তুমুল হৈ-হৈ হল যাদববাবুকে নিয়ে। নতুন গ্রহের খোঁজ এনেছেন এবং হারাধন হালদারকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন বলে তাঁর গুরুত্ব খুবই

বেড়ে গেল। বাইরের জগতে গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ায় বাড়িতেও তাঁর কদর হল খুব। টম সাহেব তাঁকে নতুন মহাকাশযান তো দিলেনই, নবাবিষ্কৃত গ্রহটিতে গিয়ে ছুটি কাটিয়ে আসার ঢালাও অনুমতিও দিয়ে দিলেন।

পড়শি

ফটিকবাবু যে! নমস্কার।

নমস্কার। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না!

চেনার কথাও নয়। আমার নাম হরিদাস।

বাঃ বেশ। তা কী দরকার বলুন।

আজ্ঞে না, দরকার কিছু নেই। এমনি এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম তো, তাই একটু খোঁজ নিলাম আর কি। পাড়া-প্রতিবেশীদের সব খবর নেওয়াটা তো একটা কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে নাকি?

সে তো ঠিকই। কিন্তু আপনি কি আমার প্রতিবেশী? কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না!

প্রতিবেশী বৈকি। প্রতিবেশী ছাড়া কী কথা বলা যায়। কাছেপিঠেই থাকি।

আমি অবশ্য পাড়ায় বেশি যোগাযোগ করি না। তাহলেও প্রতিবেশীদের সবাইকেই চিনি। আপনাকে কিন্তু চেনা চেনা ঠেকছে না।

এই তো এবার থেকে ঠেকবে। কিন্তু ফটিকবাবু, আপনি প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশা করেন না কেন?

তার অনেক কারণ আছে মশাই। প্রতিবেশীরা বড্ড হাঁড়ির খবর নেয়, কূটকাচালি করে। এর কথা ওকে বলে বেড়ায়, ধার চায়, জিনিসপত্র নিয়ে ফেরত দেয় না, টিটকিরি মারে, আরও অনেক ব্যাপার আছে।

কিন্তু ফটিকবাবু, আপনার পুবদিকে যে জ্ঞানবাবু থাকেন তিনি তো মস্ত সজ্জন, ভীরু মানুষ, তাঁর বাড়ি থেকে ভিখিরি কখনও খালি হাতে ফেরে না।

জ্ঞানবাবু সজ্জন! কে আপনাকে কথাটা বলেছে বলুন তো! বাইরে অমন ভালোমানুষটি সেজে থাকলেই হল? সজ্জনই যদি হবে তাহলে ওর বাড়িতে চাকর টেঁকে না কেন বলুন তো! কেনই বা গয়লা আর মুদি এসে পাওনা টাকার জন্য চেঁচামেচি করে যায়! কেনই বা মাসে একবার করে কাবলিওয়ালা আসে! মুনসেফ কোর্টের কেরানি হয়েও ওঁর বউয়ের গা-ভর্তি গয়না কোত্থেকে আসছে বলুন তো। ওঁর ছেলেপুলেদের চেহারা অমন নধরকান্তি হয় কি করে তা কখনও ভেবে দেখেছেন? কি করেই বা উনি পুরোনো মেঝে চেঁছে মার্বেল বসালেন! শালা বিয়ে করল, উনি নতুন বৌকে নেকলেস দিয়ে আশীর্বাদ করার মুরোদ কোথায় পেলেন? ভিখিরিকে ভিক্ষে দেয় বলে আপনি গদগদ। কিন্তু এটা তো স্বীকার করবেন যে, ভিখিরিকে ভিক্ষে দেওয়ার মানে আলস্য ও অপদার্থকে প্রশ্রয় দেওয়া! আর এই প্রশ্রয়ের ফলে ভিখিরির সংখ্যা বাড়ছে!

না ফটিকবাবু, জ্ঞানবাবু সম্পর্কে এত গুপ্ত কথা আমার জানা ছিল না। এসব শুনে মনে হচ্ছে জ্ঞানবাবুকে যা ভেবেছিলাম বোধহয় তা নয়।

মোটেই নয় মশাই, মোটেই নয়, গভীর রাত অবধি দেখবেন ওর ওই চিলেকোঠার ঘরে আলো জ্বলে। খুটখাট শব্দ হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওখানে চোরাই কোনও কারবারের ঠেক করেছে। হয় স্মাগলিং, নয়তো ড্রাগ বা ওরকম কিছু। একটু ঠেকায় পড়ে শ পাঁচেক টাকা ধার নিয়েছিলাম, তা মশাই, বছর ঘুরতে দেয় না। তাগাদায় তাগাদায় অস্থির করে ফেলল! পিছনের বাগানের বেড়া বাঁধতে গিয়ে ওর বাড়ির দাটা চেয়ে এনেছিলাম, ফেরত দিতে দিন সাতেক দেরি হয়েছে বলে জ্ঞানের বউ কত কথা শুনিয়ে গেল। ওর বড় মেয়ের বিয়ের একটা সম্বন্ধ হয়ে হয়েও হল না, এখন বলে বেড়াচ্ছে আমরাই নাকি ভাঙচি দিয়েছি। জ্ঞান যদি সজ্জন হয় তাহলে রাবণরাজা, হিরণ্যকশিপু বা হিটলারও সজ্জন, বুঝলেন!

তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু আপনার পশ্চিম দিকে যে মনোরঞ্জন ঘোষ থাকেন তিনি তো উঁচুদরের মানুষ। নাকি!

কী দেখে ধারণাটা হল বলুন তো! গান গায় বলে বলছেন?

আজ্ঞে, গান নাকি খুবই ভালো গেয়ে থাকেন শুনেছি। বাজারে বেজায় নাকি নামডাক। চারদিক থেকে লোক এসে টানাটানি করে। পাড়ার ক্লাবে মোটা টাকা চাঁদা দিয়েছেন বলে শুনেছি। বন্যাত্রাণ তহবিলে এক লাখ টাকা ঝপাৎ করে ফেলে দিয়েছেন। দুটো গরিবের ছেলেকে নাকি পড়ার খরচ দেন।

দাঁড়ান মশাই দাঁড়ান। একসঙ্গে অনেক কথা বলে ফেললেন তো। ওসব হাওয়ায় অনেক কথা ওড়ে। ওই ওড়া কথা আবার বিশ্বাস করে বসবেন না যেন।

তাহলে কি ভিতরে অন্য কথাও আছে ফটিকবাবু?

তা আর নেই! মনো কত বড় গাইয়ে বলুন তো! কানাকেষ্ট, নাকি হেমন্ত না মান্না। তাদের পায়ের কাছে ও বসতে পারবে? আমার এক কালোয়াত বন্ধু তো বলে গেছে, ওর গলায় মোটে সুরই নেই। আমার বউ সংসারের জোয়াল কাঁধে নিয়ে আর রেওয়াজের সময় পেল না, তাই নইলে এতদিনে লতা, আশার কাছাকাছি পৌঁছে যেত। গীতশ্রী টাইটেলটা তো আর মুখ দেখে দেয়নি। বুঝলেন হরিদাসবাবু, গানবাজনা আমরা বুঝি। মনোর নামডাক তো হয়েছে স্রেফ পাবলিসিটি খাইয়ে। আর জায়গামতো তেল দিয়ে। নইলে ওই ফাটা বাঁশের মতো গলা কি বাজারে কলকে পেত! সাধনা বলে কিছু আছে নাকি ওর?

এত কথা তো জানা ছিল না ফটিকবাবু!

আরে জানবেন কি করে? ও তো ছুপা রুস্তম। ময়ূরটি সেজে ঘাড়ে পাউডার দিয়ে গিয়ে যখন স্টেজে বসে তখন আপনারা ওর কায়দাকানুন দেখেই গলে পড়েন। আর ওই ক্লাবের চাঁদা! তার পিছনের কাহিনী তো জানেন না। বটতলার জমিটা সস্তায় কিনে নিল গত আশ্বিনে। দখলদার উচ্ছেদ করতে ক্লাবের ছেলেদের ধরে পড়ল। তারা জমি থেকে দখলদার হটিয়ে দিয়েছিল বলে ওই টাকা। দানখয়রাতি বলে ধরে বসবেন না যেন। আর বন্যাত্রাণের টাকার কথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। সত্যি কথা শুনলে আপনার মাথা হেঁট হয়ে যাবে।

সত্যি কথাটা কী ফটিকবাবু?

শুনবেন? ওই লাখ টাকা বন্যাত্রাণে দিয়ে ছেলেকে এস ডি ও-র পোস্ট পাইয়ে দিয়েছে। ছেলে এখন গ্যাট হয়ে বসে দেদার ঘুষ খাচ্ছে। লাখ টাকার দশগুণ উশুল হয়ে গেছে কবে!

বটে ফটিকবাবু! এ তো সাঙ্ঘাতিক কথা!

আর ওই যে গরিব ছাত্রদের পড়ানোর ব্যাপারটা। লোকে খুব বাহবা দেয় বটে, সে আসল কথাটা জানে না বলে।

কী কথা মশাই?

খোঁজ নিলেই দেখবেন ও দুটি ছেলেই লেখাপড়ায় দারুণ ভালো। পরীক্ষায় দুর্দান্ত ফল করে থাকে। দুটিই কুলীন কায়েত, মনোরঞ্জনের পাল্টি ঘর। এবার বুঝেছেন খানিকটা?

আজ্ঞে না। ধোঁয়া ধোঁয়া লাগছে।

বুঝতে চাইলে ঠিকই বুঝতেন। মনোরঞ্জনের দুটি কালিকিস্তি ধুমসি, থলথলে মোটা হতকুচ্ছিৎ মেয়ে আছে। মনোরঞ্জন ভালোই জানে যে তাদের স্বাভাবিক নিয়মে বিয়ে দেওয়া মুশকিল হবে। তাই ওই ছেলেদুটিকে বেঁধে রাখছে। ওরা হল মনোরঞ্জনের হবু জামাই। ওটা দয়াধর্ম বলে মনে করবেন না যেন। ওটা আসলে দাদন।

কিন্তু আমি যে শুনেছি মনোরঞ্জনবাবুর মেয়েরা ভারি সুন্দরী। লেখাপড়ায় ভালো। গান জানে, সে কি তাহলে ভুল?

খুব ভুল মশাই, খুব ভুল শুনেছেন। দূর থেকে খারাপ দেখায় না বটে, মেকআপ করে থাকে তো। আসল চেহারা আমরা জানি।

তারা কি লেখাপড়া বা গান-বাজনায় ভালো নয়?

চৌদ্দটা মাস্টার রাখলে কি আমার তিন-তিনটে মেয়ে ফার্স্ট সেকেন্ড হতে পারত না হরিদাসবাবু? আর কলেজের সোশ্যাল আর পাড়ার ফাংশানে গাইলেই কি গায়িকা হওয়া যায়? সকালে যখন মেয়ে দুটো সা রে গা মা করে গলা সাধে তখন তো পাড়ার কাকগুলো চিল্লামিল্লি লাগিয়ে দেয়। তার ওপর দেমাক কম নাকি? আমার তিনটে মেয়ে তো ওদেরই প্রায় সমবয়সী, আগে বেশ যাতায়াতও ছিল। মিশতে চাস না বলে দিলেই পারিস। তা না বলে সোনার হার চুরির মিথ্যে অপবাদ দিয়ে আমার মেয়ে তিনটের যাতায়াত বন্ধ করে দিল। ওরাও ছাড়বার পাত্রী নয়, রোজ গলা তুলে ভালো-মন্দ শুনিয়ে দেয়। ওই যে দেখুন না মনোর বাড়ির যে জানলাগুলো আমার বাড়িমুখো সেগুলো সব কটকটে করে বন্ধ করে রেখেছে।

তাই তো বটে! তবে যাই বলুন, আপনার উলটো দিকের বাড়িতে যে রাইমোহনবাবু থাকেন এটা একটা সৌভাগ্যেরই ব্যাপার। কত বড় পণ্ডিত মানুষ। ইউনিভার্সিটিতে পড়ান। তার ওপর বিলেত আমেরিকাতেও নাকি লেকচার দিতে যান। এরকম প্রতিবেশী পাওয়া কি ভাগ্যের কথা নয়! গৌরবেরও তো ব্যাপার!

আপনার দোষ কি জানেন হরিদাসবাবু? আপনি বড় গুজবে বিশ্বাস করেন।

তাহলে কি রাইমোহনবাবু তেমন সুবিধের লোক নন?

দু'পাতা ইংরিজি পড়লেই কি আর মানুষ বদলে যায় হরিদাসবাবু? তাছাড়া রাইমোহনের সাবজেক্ট হল ফিলজফি। আপনি বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, ওটা একটা সাবজেক্ট? আজকাল ফিলজফির কোনও দাম আছে? আজকালকার ছেলেমেয়েরা তো ফিলজফি শুনলে ব্যঙ্গের হাসি হাসে, ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। আমি তো শুনেছি, ক্লাসে ছাত্রছাত্রী হয় না বলে রাইমোহন ফাঁকা ক্লাসে গিয়ে বসে বসে ঘুমোয়। আর বিলেত-আমেরিকা! আপনি কি ভেবেছেন ওকে কেউ খরচ করে নিয়ে যায়? না মশাই না ওর এক দাদা বোধহয় বিলেতে ফিটার মিস্ত্রির কাজ করে!

ফিটার মিস্ত্রি! আমরা যে শুনেছি, মস্ত ইঞ্জিনিয়ার!

ওই তো আপনার দোষ যা শোনেন তাই বিশ্বাস করেন। ওরকম বলতে হয়। আমি ভালোই জানি, কালিঝুলি মেখে যন্ত্রপাতি সারায়। তা সেই দাদাই একে ওকে ধরে প্যাসেজ মানি জোগাড় করে পাঠায়। বক্তৃতা দিতে যায় না হাতি। এসে ওসব গল্প মারে আর কি!

কিন্তু এই যে শুনি, রাইমোহনবাবু আমেরিকা থেকে একটা ডক্টরেটও পেয়েছেন!

আমেরিকা থেকে ডাকযোগেও ডক্টরেট ডিগ্রি আনা যায় বুঝলেন! তার কোনও দাম নেই। ওসব ডক্টরেট সার্টিফিকেটের দাম ঠোঙার কাগজের চেয়ে বেশি নয়।

রাইমোহনবাবুর মতো নিরীহ মানুষ এসব করেন নাকি?

নিরীহ! কিসে ওকে নিরীহ বলে মনে হল আপনার? আগে তো আমার সঙ্গে রাইমোহনের বেশ ভাবই ছিল। রোজই সকালের দিকে ওর বাড়িতে গিয়ে চা-চিঁড়েভাজা খেতাম। গল্পগুজবও হত। তখন তো আর স্বরূপ বুঝতে পারিনি। একদিন যেতেই রাইমোহন ফুঁসে উঠে বলল, আপনি আমার নামে লোকের কাছে যা তা বলে বেড়ান, নিন্দেমন্দ করেন আমি তো অবাক!

বলতেন নাকি?

আমি হলাম সত্যের পূজারী। যদি বলেও থাকি তাহলে দুটো চারটে সত্যি কথাই বলেছি। সেটা কি দোষের?

না না, দোষের হবে কেন? তারপর কী হল?

দু'চার কথায় হাওয়া গরম হয়ে উঠল। রাইমোহনের বউ আর ছেলেমেয়েরাও সঙ্গে জোট বেঁধে এল। তুমুল চেঁচামেচি কত বড় স্পর্ধা শুনবেন। রাইমোহন আমাকে ঘাড়ধাক্কা দিতে দিতে বাড়ি থেকে বের করে দিল।

বলেন কি?

তাই তো বলছি। নিরীহ বলে তকমা লাগালেই তো হবে না। সব মানুষের ভেতরেই জন্তু জানোয়ার থাকে।

আজ্ঞে, সেটা খুব বুঝতে পারছি। রাইমোহনবাবুকে আমি ভালো লোক বলে জানতাম।

আরও ভালো করে জানুন তাহলে দেখবেন ভালোর খোসা ছাড়িয়ে আসল রূপটা বেরিয়ে পড়বে। সেই ঝগড়ার পর আমার ছোট ছেলেটার হাত ফসকে একটা ঢিল গিয়ে রাইমোহনের বাড়ির একটা কাচ ভেঙে দেয়। তার জন্য কেউ থানা পুলিশ করে, বলুন তো!

ছেলেটা তখন খুব ছোট ছিল বুঝি।

ছোটই, বছর কুড়ি বয়স হতে পারে বড় জোর!

মোটে একটাই ঢিল মেরেছিল বলে উনি পুলিশ ডাকলেন?

ব্যাটাছেলেদের কি আর অত হিসেব থাকে? একটার জায়গায় দুটো বা তিনটেও হতে পারে। ওরা পুলিশকে কী বলেছিল জানেন? বলেছিল আমরা সবাই নাকি ইট পাটকেল জোগাড় করে রাতের অন্ধকারে ওদের বাড়িতে হামলা করি। আর পাড়া-প্রতিবেশীদের কথা বলছিলেন না? তারা সবাই আমার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে সাক্ষী দিয়েছিল। কত বড় অন্যায় বলুন।

অন্যায়ই তো, তাতে কী হল?

দেখুন, যে যাই বলুক আর করুক আমি সর্বদা ন্যায় আর সত্যের পথ ধরে চলি। পুলিশ আমাদের সবাইকে ধরে নিয়ে গেল বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারল যে, তারা ভুল করেছে। তাই ক্ষমা চেয়ে ছেড়ে দিল।

হ্যাঁ আমি জানি। তখন ওই থানার ওসি ছিল আমার শালা। আমার শালাও বলে ফটিকবাবুর মতো লোক হয় না। আপনি নাকি পুলিশকে মিষ্টি খাওয়ার জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, খুশি হয়েই দিয়েছিলাম। দেখলাম আমাকে অ্যারেস্ট করে ওরা খুবই অনুতপ্ত। সবাই মন খারাপ করে বসে আছে। তাই বললাম একটা ভুল না হয় করেই ফেলেছ, তাতে কি? এই নাও, সবাই মিষ্টি খাও।

তাতে পুলিশের মুখে হাসি ফুটল বুঝি?

হ্যাঁ, একেবারে গোলাপ ফুলের মতো ফুটে উঠল।

আপনি সত্যিই খুব ন্যায়নিষ্ঠ লোক দেখছি।

সত্য আর ন্যায়ের দীপ্তি আজকাল লোকে সইতে পারে না। বুঝলেন! আর সে জন্যই কেউ এখন আমার কাছে আসে না। কথা কইলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। লোকে বলে আমি নাকি একঘরে। আসলে তো তা নয়, আমার নীতি হল ওই যে কি বলে, একলা চলো রে!

অতি সত্যি কথা মশাই, অতি সত্যি কথা, আপনার দীপ্তিতে আমারও চোখ ঝলসে যাচ্ছে। আচ্ছা আসি তাহলে নমস্কার।

বিপিনবাবুর কাণ্ড

নন্দবাবু বাজারে চলেছেন। বাঁ-হাতে ছাতা, ডান হাতে বাজারের থলি, পকেটে টাকা আর ব্রহ্মতালুতে রাগ। তা রাগ হওয়ারই কথা। গতকাল বিকেল থেকে তাঁর প্রিয় দুধেল ছাগল রাইকিশোরীর খোঁজ নেই। ছোটো ছেলে মদন গতকাল সিংহীদের ছাদে মুড়ি ওড়াতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে ঠ্যাং ভেঙেছে। গিন্নির সোনার বালা চুরি হওয়ায় গিন্নি আজ সন্দেহবশে পুরোনো ঝি হীরামোতিকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন, পরে যদিও বালাটা বালিশের নীচে পাওয়া যায়। তাঁর বড় শালা ভুল করে তার পুরোনো চটি ছেড়ে রেখে নন্দবাবুর নতুন চটিজোড়া পায়ে গলিয়ে চলে গেছে। বাইরের ঘরের ঘড়িটা দশ মিনিট লেট চলছে বলে আজও তাঁর বাজারের বেরোতে দেরি হয়ে গেছে। আরও আছে। কিন্তু অত সব বলতে গেলে মহাভারত। রাগের চোটে নন্দবাবু একটু জোরেই হাঁটছেন।

হঠাৎ সামনে পথ আটকে একজন বিগলিত মুখের লোক দাঁত বের করে বলল, নন্দবাবু না? কী সৌভাগ্য!

লোকটা বেজায় বেঁটে, একটু রোগা, কালো এবং মুখে ধূর্তামির ছাপ আছে। নন্দবাবু লোকটাকে কস্মিনকালেও দেখেননি।

নন্দবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনি কে? কী চাই?

আজ্ঞে আমি হরিপদ, হরিপদ পাল।

ও, তা হরিপদবাবু, আমার খেজুরে আলাপ করার সময় নেই। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। যা বলার চটপট বলুন।

ছি ছি, দেরি করিয়ে দিলুম নাকি? তা চলুন, বাজারের দিকে যেতে যেতেই দুটো কথা বলি।

কী কথা?

বলছিলুম কি বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?

বিপিনবাবু কে?

আহা, বিপিনবাবু হলেন যোগেনবাবুর শালা।

যোগেনবাবু কে?

চিনলেন না! যোগেনবাবু হলেন নরেনবাবুর ভাইপো।

নরেনবাবু কে?

কী মুশকিল! নরেনবাবু যে সুধাংশুবাবুর নাতজামাই।

সুধাংশুবাবু কে?
ওই তো বললুম, উনি হলেন নরেনবাবুর দাদাশ্বশুর। আর নরেনবাবু হলেন যোগেনবাবুর জ্যাঠা। আর যোগেনবাবু হলেন বিপিনবাবুর ভগ্নীপতি। এবার বুঝলেন?
জলের মতো পরিষ্কার। এদের কাউকেই আমি চিনি না।
আহা চেনার দরকারটাই বা কী? কথাটা হল বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?
আজ্ঞে না।
উঃ সে সাংঘাতিক কাণ্ড। কাউকে না বলে কয়ে বিপিনবাবু যে বাড়ি থেকে হাওয়া হয়ে গেছেন।
তাই নাকি? তাহলে তো চিন্তার কথা। কিন্তু আমার যে বিপিনবাবুকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই।
মাথা ঘামাবেনই বা কেন? শুধু বলছি ভদ্রলোকের কাণ্ডটা দেখলেন? বলা নেই, কওয়া নেই, বাড়ি থেকে জলজ্যান্ত মানুষটা গায়েব!
তাহলে পুলিসে খবর দিন।
আহা, পুলিস তো তাঁকে আগে থেকেই খুঁজছিল।
তাই নাকি?
তা খুঁজবে না? তিনি যে ঢিল ছুঁড়ে নিত্যানন্দবাবুর অ্যালসেশিয়ান কুকুরের ঠ্যাং ভেঙে দিয়েছেন।
ও, তা হলে তো ভীষণ ব্যাপার! কিন্তু এই নিত্যানন্দবাবুটি আবার কে?
তিনি হলেন নবকৃষ্ণ দারোগার পিসেমশাই। আর নবকৃষ্ণ দারোগা হল শ্যামাপদর খুড়তুতো ভাই। আর শ্যামাপদ হল তো চারুবাবুর ভাগ্নে। আর চারুবাবু হলেন...
থাক থাক, ওতেই হবে।
তাহলে থাক। কথাটা হচ্ছে বিপিনবাবুকে নিয়ে।
হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিপিনবাবুর কথাটাই বরং হোক।
তাই বলছিলুম বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?
হ্যাঁ, বললেন তো, উনি নিরুদ্দেশ।
নিরুদ্দেশ বলতে নিরুদ্দেশ! একেবারে গায়েব। কোথাও তাঁর টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না। দিগন্তের চিলের মতো উড়তে উড়তে বিলীন হয়ে গেছেন।
বাঃ, এ তো কাব্য হয়ে গেল দেখছি।
লোকটা খুব লজ্জা টজ্জা পেয়ে হাতটাও কচলে বললে, একটু আধটু আসে আর কি। কবি তমাল রায়ের কাছে তালিম নিয়েছিলাম কিছুদিন।
বাঃ বাঃ। কবি তমাল রায়ের নামটা অবশ্য শুনিনি।
তিনি হলেন কবি সব্যসাচী কাব্যবিশারদের সাক্ষাৎ ভাইঝি জামাই। সব্যসাচী কাব্যবিশারদ হলেন গিয়ে নটবর বিদ্যাবিনোদের ভায়রাভাই। আর নটবর বিদ্যাবিনোদ হলেন গিয়ে...
থাক, থাক, কথাটা হচ্ছিল বিপিনবাবুকে নিয়ে।
হ্যাঁ, কথাটা বিপিনবাবুকে নিয়েই।
সেটাই হোক।
তাই বলছিলুম, বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?
হ্যাঁ, উনি দিগন্তে বিলীন হয়ে গেছেন।
বিলীন বলতে বিলীন! একেবারে কর্পূরের মতো উবে গেছেন। অথচ বাড়িতে ছেলে কাঁদছে, বউ কাঁদছে, মা কাঁদছে, পাওনাদারেরা কাঁদছে।
তাহলে তো খুবই খারাপ ব্যাপার।

খারাপ বলতে খারাপ! শিবু গয়লার দুধ বাবদ একশো বত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা পাওনা, পঞ্চানন মুদির পাওনা দুশো একান্ন টাকা পঁচিশ পয়সা, রহমত দর্জি পাবে একান্ন টাকা পঁচাত্তর পয়সা, পাড়ার মুচি পায় তেরো টাকা কুড়ি পয়সা, খবরের কাগজওয়ালার কাছে বাকি পড়ে আছে একাশি টাকা একান্ন পয়সা, বাড়িওয়ালা দু' মাসের ভাড়া তিনশো চল্লিশ টাকা, বনবিহারীর কাছে মাসকাবারে ধার নিয়েছিলেন আড়াইশো টাকা, গজপতির কাছে দেড়শো, সরখেলবাবুর কাছে ত্রিশ টাকা...

বিপিনবাবু বেশ ধারালো লোক ছিলেন দেখছি।

শুধু কি এই? ফুচকাওলা, বাদামওলা, অফিসের পিওন—তাদের হিসেব তো এখনও ধরিনি।

তাহলে আর ধরবেন না।

তাই বলছিলুম বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?

একটু একটু দেখতে পাচ্ছি।

সংসারটা ভেসে যাচ্ছে একেবারে। চাল নেই, ডাল নেই, নুন নেই, তেল নেই।

সত্যি খুব দুঃখের কথা, কিন্তু বিপিনবাবু গেলেন কোথায়? ভালো করে খুঁজে দেখেছেন?

গরু খোঁজা মশাই, গরু খোঁজা। এই তো সামতাবেড়ে তাঁর শ্বশুরবাড়ি, পিসির বাড়ি গাইঘাটা, ভাই থাকে কার্মাটারে, দাদা বিষুপুর, বড় শালা নবদ্বীপ, ছোট শালা দুর্গাচক, বড় শালী গয়েশপুর, মেজোজন হিঙ্গলগঞ্জ, ছোট শিমুলতলা, বড় কাকা রানাঘাট, ছোট কাকা পাঁশকুড়া, খুড়তুতো ভাই একজন কিশোরপুর, অন্য জন কওনঝড়, বড় মামা জলপাইগুড়ি...

থাক থাক। কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি তো!

এক্কেবারে না। রবি ঠাকুরের ভাষায় উনি একদম ভোঁ হয়ে গেছেন, না হয়ে গেছেন।

আহা, খুব দুঃখের কথা।

খুব, চোখের জল রাখা যায় না, মশাই। তাই আমরা সবাই মিলে নিখিল ভারত বিপিন বাঁচাও কমিটি তৈরি করেছি। বিপিনবাবু ভোঁ ভোঁ হলেও সংসারটা তো আছে। সেটাকে তো আর ভেসে যেতে দেওয়া যায় না।

সে তো ঠিকই।

কমিটির চেয়ারম্যান হলেন সতীশ ঘোষ। চিনলেন তো। এই যে সুরেনবাবুর বড় মেসো, সুরেনবাবু কে নিশ্চয়ই জানেন, হারান বোসের...

আচ্ছা, আচ্ছা, কথাটা হচ্ছিল বিপিনবাবুকে নিয়ে।

তা তো বটেই। তাই বলছিলুম, বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?

দেখছি মশাই, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

হ্যাঁ, সবাই দেখছে। তা সেই বিপিন বাঁচাও কমিটির সেক্রেটারি হলেন গিয়ে গিরিধারী হালদার, যার শালা মাধব রায় গঙ্গাবক্ষে সাত মাইল সাঁতার কেটে বিখ্যাত, সেই মাধব রায় যার তালুইমশাই হল গিয়ে গোবিন্দ বিশ্বাস...

থাক থাক, বিপিনবাবুর কথাটাই হোক।

তাই হোক। নিখিল ভারত বিপিন বাঁচাও কমিটির আজীবন সদস্যপদের চাঁদ মাত্র দু'হাজার টাকা, দশ বছরের হল দেড় হাজার, পাঁচ বছর হলে হাজার, এক বছরের জন্য মাত্র দুশো, ছ'মাসের সদস্যপদ...

থাক থাক। তা আমাকে কতো দিতে হবে?

লোকটা জিভ কেটে বলল, ছিঃ ছিঃ, আপনার কাছে। সেই উদ্দেশ্যে আসা নয়। তবে কি না সবাই শুনে দুঃখ পায়। দুঃখ পেলে লোকে ভাবতে বসে। ভাবতে বসলে লোকের চোখে জল আসে। চোখে জল এলে লোকের মন গলতে থাকে। আর মন গলতে শুরু করলে হাত গিয়ে পকেটে ঢোকে...

থাক থাক। কত?

কি যে বলেন? তা গোটা পাঁচেক যদি হয়, কোনও চাপাচাপি নেই কিন্তু।

নন্দবাবু টাকাটা দিয়ে বললেন, চাপাচাপি নেই বলছেন? ওরে বাবা!

লোকটা একটু লাজুক হেসে বলল, লোকে অবশ্য বিপিন বাঁচাও কমিটিকে খুবই গালমন্দ করছে, মামলা-মোকদ্দমা করবে বলে শাসাচ্ছে, ঝড়গা-ঝাঁটিও লেগে যাচ্ছে। তাই বলছিলুম বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?

বীরেনবাবুর প্রত্যাবর্তন

সকাল থেকে বীরেনবাবুকে ঘরে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বারান্দায় বা বাথরুমেও নেই। সদর দরজা ভিতর থেকেই বন্ধ। তিনি বাইরে গেলে ভিতরের ছিটকিনি আর বাটাম দেওয়া থাকত না। বীরেনবাবুর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা খুবই অবাক হলেন। যদি বাইরে গিয়েই থাকেন তাহলে কোথা দিয়ে বেরোলেন। খাটের তলা, আলমারি এবং রান্নাঘরের কাবার্ড অবধি খুঁজতে বাকি রাখেনি কেউ। বীরেনবাবু বেশ লম্বা চওড়া মানুষ, ছোটখাটো জায়গায় লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়।

যথারীতি পাড়া-প্রতিবেশী এবং তারপর পুলিশ এল। বহু প্রশ্ন উঠল, বহু জবাবও উঠল। কিন্তু সমস্যার কোনও সমাধান দেখা গেল না। কেউ কেউ বলল, হয় উনি অদৃশ্য হয়ে বা মলিকিউলে রূপান্তরিত হয়ে এখানেই আছেন, নইলে পঞ্চভূতে মিলিয়ে গিয়েছেন।

বাড়িতে কান্নাকাটি শুরু হল। দু'চারজন বলল, তোমাদের এখন অশৌচ পালন করা উচিত। এগারো দিনে শ্রাদ্ধটাও করে ফেল। এই মতের বিরুদ্ধেও মত দেখা দিল, লোক পাওয়া না গেলে মৃত্যু প্রমাণিত হয় না।

বীরেনবাবু কিন্তু এসব ঘটনার বিন্দু-বিসর্গও জানেন না। তিনি যথারীতি সকালে বিছানা থেকে উঠে বাথরুমে গেছেন। প্রাতঃকৃত্য সেরে ঘরে এসে হঠাৎ তাঁর মনে হল, ঘরের জিনিসপত্রগুলো যেন অন্যরকম। পুবের জানালাটা দিয়ে সূর্যের আলো দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে উত্তরের জানালা দিয়ে। জানালার বাইরে কদম গাছটা নেই। যে মহিলা চা নিয়ে এল তাকে তিনি চিনতে পারলেন না। কয়েকটা অচেনা ছেলেমেয়েকেও দেখতে পেলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, এসব কী হচ্ছে?

একটা বাচ্চা ছেলে ঘরে ঢুকে জিগ্যেস করল, ভালো লাগছে?

বীরেনবাবু বললেন, তুমি কে?

আমি! আমি এখানে থাকি।

আমি এখানে কেন?

আপনাকে এখানে আনা হয়েছে।

কিভাবে?

একটা বিশেষ পদ্ধতিতে আপনার শরীরটাকে একটা নলের ভিতর দিয়ে বের করে আনা হয়েছে।

কিন্তু কেন?

আপনার বায়ু পরিবর্তনের জন্য। অনেকদিন আপনি কোথাও বেড়াতে টেড়াতে যাননি। আমরা ভাবলাম আপনাকে কাছেপিঠে কোথাও ঘুরিয়ে আনি।
তা এ জায়গাটার নাম কি?
নজম।
নজম! এ নামটা তো শুনিনি। কোন জেলা?
ছেলেটা হাসল, বলল, আমাদের জেলা নেই। নজম একটা আলাদা জগৎ।
বীরেনবাবু বললেন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এখানে কি উত্তরদিকে সূর্য ওঠে?
হ্যাঁ।
আমি কি গ্রহান্তরে?
হ্যাঁ।
তুমি আসলে কে?
আমি নজমের চর। চারদিকে ঘুরে বেড়াই। মাঝে মাঝে বিভিন্ন জগৎ থেকে এক-আধজনকে নিয়ে আসি।
তারপর কি করো?
সাতদিন পর রেখে আসি।
মাত্র সাত দিন?
হ্যাঁ। তবে আমাদের এই গ্রহের একটা দিন কিন্তু অনেক লম্বা।
কত লম্বা?
আপনাদের দশ বছরের সমান।
ও বাবা। তাহলে আমি কবে ফিরব? সত্তর বছর পর?
হ্যাঁ।
ততদিনে তো আমার ছেলেপুলেরা বুড়ো হয়ে যাবে। আমি মরেই যাব।
না, আপনি যেমন আছেন তেমনি থাকবেন। এখানে বয়স বাড়ে না। আমার বয়স কত জানেন?
কত? আপনাদের হিসেবে আটশো বছর। এখানকার হিসেবে মাত্র আশি দিন। অর্থাৎ দেড় মাসের কিছু বেশি।
আমার যে বাড়ির জন্য মন কেমন করছে।
ছেলেটি মিষ্টি হেসে বলল, সকলেরই করে। কিন্তু এখানে এত আনন্দের আয়োজন, এত উৎসব, এত খাদ্য পানীয়, এত উদ্বৃত্ত যে আপনি বাড়ির কথা ভুলে যাবেন। এ ঘর থেকে কিছু বোঝা যায় না। তবু জানালার কাছে এসে বাইরে একটু তাকান।
বীরেনবাবু জানালার কাছে এসে বাইরে তাকিয়ে হাঁ হয়ে গেলেন। এরকম গভীর নীল আকাশ, চারদিকে অফুরান এত সবুজ, এত সুন্দর বিশাল-উপত্যকা আর প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়া বাড়ি-ঘর তিনি আর কখনও দেখেননি।
ছেলেটি বলল, এখানে শীত-গ্রীষ্ম নেই। শুধু মনোরম একটিই ঋতু। গ্রহটি পৃথিবীর চেয়ে এক হাজার গুণ বড়। এখানে অভাব নেই, ক্ষুধা নেই, অসুখ নেই, মৃত্যু নেই।
বীরেনবাবু মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তবু চোখে জল এল। বললেন, তবু আমি ফিরে যেতে চাই।
কেন?
আমার ওই নোংরা পৃথিবীই ভালো।
ছেলেটি হেসে হঠাৎ হাত নাড়তেই ঘরের মাঝখানে একটা দেয়াল উঠে এল। তাতে একটা দরজা। ছেলেটি বলল, যান, ফিরে যান।

বীরেনবাবু দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই দেয়াল অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি দেখলেন, নিজের শোওয়ার ঘরেই দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

তাঁর বউ ছেলে-মেয়ে ছুটে এসে ঘিরে ধরল তাঁকে।

এ কী কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ?

বীরেনবাবু সারা জীবন এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি।

ওর হবে

কালীকিঙ্কর তার কালী মন্দিরের নাটমন্ডপে বসে ভক্তদের চরণামৃত বিলি করছিল। পরণে রক্তাম্বর, মাথায় ঝুঁটি, কপালে তেল সিঁন্দুরের ফোঁটা। চেহারা এই বুড়ো বয়সেও ভয়ঙ্কর। দেখলেই বোঝা যায় সে সোজা পাত্র নয়।

তা কালীকিঙ্কর সোজা পাত্র ছিলও না। কোনওকালে। ডাকাত কালীর নামে এলাকায় থরহরি কম্প হত। আবার তার বীরত্বের কথাও বলত মানুষ।

কিন্তু কালীর এখন আর সেই দিন নেই। এখন সারাদিনই প্রায় সে এই কালীমন্দিরে পড়ে থাকে। হরিপদ একটু দূরে উবু হয়ে বসা। একসময়ে সে কালী ডাকাতের সাকরেদ ছিল। হরিপদ বলছিল, দীনু ডাকাত কিন্তু তোমাকে ছাড়িয়ে যাবে কালীদা। খুব নাম হয়েছে ইদানীং। পরশুদিন মকরগঞ্জের কাছাড়ি লুট করল। কী সাহস! চারটে দোনালা বন্দুক আর সড়কি বল্লমধারী পাইকদের মুখে কাছারি লুট করা চাট্টিখানি কথা নয়।

কালী এক থুত্থুড়ে বুড়ির হাতে চরণামৃত দিয়ে বল, হুঁ।

হরিপদ বুঝছিল এসব কথায় কালী খুশি হচ্ছে না। কিন্তু সে আজ একটু উত্তেজিত। বলল, আর কাজটাও করে গেল নিখুঁত। ভোর রাতে পাহারায় একটু ঢিলেমি আসেই। সেই সময়ে রণপায়ে করে মাঠ ভেঙে এসে একবারে নিঃশব্দে সব কটা অস্ত্রধারীকে চোখের নিমেষে বেঁধে ফেলে কাজ হাসিল করে চলে গেল। খুন খারাপী রক্তপাত কিছু করেনি। নয়ন দারোগা অবধি কাজ দেখে বলেছে, নাঃ এ তো দেখছি চ্যাম্পিয়ন ডাকাত। একটা সূত্রও ফেলে যায়নি। সাবাস!

কালী একটু দাঁত কিড়মিড় করে বলে, বাজপুরে দারোগা শিবু হালদার যে আমাকে মেডেল দিতে চেয়েছিল সেটা কি ভুলে গেছিস?

হরিপদ বলে আরে না, সে কি ভোলা যায়? সেবারে তুমি নন্দকিশোর মহাজনের গদিতে ডাকাতি করেছিলে, দলে আমিও ছিলাম। নন্দকিশোরের বাড়ির কাছে সে রাতে যাত্রাগানের আয়োজন। তুমিই করেছিলে। চারটে পাইককে সিদ্ধি খাওয়ানো হল সন্ধেবেলা। সব মনে আছে। যখন ডাকাতি হচ্ছে তখন স্টেজে রাবণ বধ হচ্ছে। হনুমান আর রাক্ষসদের চেঁচামেচির চোটে নন্দকিশোরের বাড়ির লোকদের চেঁচামেচি কেউ শুনতেই পায়নি।

তবে?

না, তুমিও তোমার আমলে ডাকাতের রাজা ছিলে বটে, কিন্তু এই দীনুও কম যাচ্ছে না। গত মঙ্গলবার নাটুবাবুর বাড়িতে কী কাণ্ডটাই করল বলো তো! ভোর রাতে কীর্তনের দল নিয়ে পাড়া টহল দিয়ে নাটুবাবুর বাড়ির সামনে এসে সে কী 'হরিবোল, রাধাবোল' কীর্তন! সঙ্গে ঢাক ঢোল কাঁসি ঘণ্টা। নাটুবাবু ধর্মভীরু মানুষ। বেরিয়ে কীর্তনের দলকে পয়সা দিতে যাচ্ছিলেন, তখন হুড়মুড় করে গোটা কীর্তনের দলটাই বাড়িতে ঢুকে সব চেঁছেপুঁছে নিয়ে গেল। তা ধরো লাখ তিনেক টাকা তো হবেই, সঙ্গে আরও লাখ খানেক টাকার গয়না।

কালী এক বুড়োকে চরণামৃত দিয়ে বলল, এ আর এমন কি? আমি তো গড়ানহাটার বিভূতিবাবুর বাড়িতে ঢুকেছিলাম তার জামাইয়ের গলা নকল করে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব মনে আছে। জামাইয়ের নৌকো আমরা আখেরগঞ্জের ঘাটে আটকে রেখেছিলাম। তুমি গিয়ে জামাইয়ের গলা নকল করে ডাকতেই—

তবেই বোঝ দীনু আর এমন কী করেছে।

সে কথা সত্যি, তোমার এলেম তো দুনিয়াসুদ্ধ লোকে জানে। তবে ধরো এই গত অমাবস্যায় কুঞ্জপুকুরের চণ্ডীমণ্ডপে ভর সন্ধেবেলা একদল বিধবা বসে গোবিন্দ গোসাঁইয়ের কথকথা শুনছিল আর ভক্তিতে চোখের জল ফেলছিল তারাই যে কথকথার আসর থেকে ফুলুবাবুর ঠাকুমার পিছু পিছু তার বাড়িতে গিয়ে সেঁধোবে আর সেঁধিয়েই নিজের মূর্তি ধরবে তা কি কেউ ভেবেছিল। শুনলুম তারাই নাকি ফুলুবাবুর ঠাকুমার কাছ থেকে কথায় কথায় ফুলুবাবুর বউয়ের কয় ভরি গয়না আছে তা জেনে নেয়। আর বুদ্ধিরও বলিহারি। অতগুলো বিধবা দেখে বাড়ির লোক এমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায় যে ডাকাতিটা ভালো করে বুঝেই উঠতে পারেনি।

ফু^ঃ ও কি একটা মরদের মতো কাজ হল? আমিও তো দীনবন্ধুর বাড়িতে দলবল নিয়ে তার মেয়ের বিয়ের দিন বরযাত্রী সেজে ঢুকেছিলুম। সে কথা লোকের মুখে মুখে ফেরে।

তবে যাই বলো দাদা দীনুও কিন্তু কম যাচ্ছে না।

ওরে অত ঘাবড়াস কেন? কালী ডাকাত বুড়ো হয়েছে বটে, কিন্তু তাকে ছাড়ানো মুখের কথা নয়। আগে দশ-বিশ লাখ টাকা কামাক, আমার মতো একটা কালী মন্দির বানাক, তবে বুঝব, যে ডাকাতের কালী মন্দিরই নেই সে আবার কিসের ডাকাত?

তা সত্যি কথা, তবে শুনেছি, দীনু নাকি কালীর তেমন ভক্ত নয়। সে খুব শিবের ভক্ত।

বলিস কী? ডাকাত হয়ে কালীসাধনা করে না?

কিন্তু দাদা, শিবও তো দেখছি কম যাচ্ছে না।

দূর দূর। ওর তাহলে কিছু হবে না। যে ডাকাত কালী সাধনা করে না সে উচ্ছন্নে যায়।

তা কথাটা তুমি বোধহয় মন্দ বলোনি। কানাঘুঁষো শুনতে পাই, দীনু নাকি কখনও খুন খারাপি পছন্দ করে না। তার নামে ডাকাতির অনেকগুলো নালিশ আছে বটে, কিন্তু একটাও খুনের মামলা নেই।

ছ্যাঃ ছ্যাঃ! বলিস কী! খুনখারাপি না করলে আবার ডাকাত কিসের রে? এর তো তবে ডাকাতির দুধের 'দাঁত' ওঠেনি!

উঁহু, কথাটা মানতে পারছি না। খুন খারাপি করার তাকাত তার খুবই আছে। কিন্তু সে বলে, ওসব হল অধর্মের কাজ। রক্তপাত না ঘটিয়ে ডাকাতি করাটাই নাকি সত্যিকারের মরদের মতো কাজ।

দ্যাখ হরিপদ, দীনু কিন্তু তোর মাথাটা খেয়েছে। বয়স তো তোর মেরে কেটে ষাট-বাষট্টি, আমার চেয়ে অন্তত দশ বছরের ছোট। এই বয়সে কি সব বোঝা যায়?

বলো কী কালীদা? ষাট-বাষট্টি কি কম বয়স হল? পাকা চুলে ভরা মাথা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বোঝার আর বাকি কী আছে?

অনেক আছে। দীনুর নামে কেউ নানা গল্প রটাচ্ছে। ওসব বিশ্বাস করিসনি। এখনও কালী ডাকাতের নাম শুনলে লোকে সেলাম ঠোকে।

তা তো বটেই। দেশের তুমি একজন গণমান্য লোক।

তবে? দীনু তো সবে হামা দিচ্ছে। আগে দাঁড়াক তবে দেখা যাবে।

সেটা অবশ্য ন্যায্যই বলেছ। তোমার নামে এখনও লোকে ছড়া কাটে, গান বাঁধে, তোমার গল্প বলে বাচ্চাদের ঘুম পাড়ায়।

তবেই বোঝ দীনু কোথায় পড়ে আছে।

তা বলতেই হবে, তোমার কাছে দীনু কিছু নয়। তোমার কালীমন্দিরেও দিন দিন ভিড় বেড়েই চলেছে দেখছি। আজ তো লম্বা লাইন পড়ে গেছে দাদা।

বাস্তবিক আজ কালীমন্দিরে লোকে একেবারে লোকারণ্য। চরণামৃত দিতে দিতে কালীর হাত ভেঙে যাওয়ার জোগাড়। যত ভিড় বাড়ে, ততই কালীর আনন্দ, হ্যাঁ, তার জাগ্রত কালীর মহিমা চারদিকে খুব ছড়িয়ে পড়েছে বটে।

বুড়ো-বুড়ি, পুরুষ-মেয়ে, বাচ্চা-কাচ্চা, বাঙালি হিন্দুস্থানিতে মিলে একেবারে সাংঘাতিক অবস্থা।

কালী চরণামৃত দিতে দিতে বলে, দ্যাখ রে হরিপদ, ভালো করে চেয়ে দ্যাখ। পারবে দীনু এরকম মায়ের মহিমা প্রচার করতে?

ভিড়টা বড্ড চাপাচাপি হচ্ছে এখন। উঠোনে যেন তিল ধারণের জায়গা নেই। হরিপদ ভিড়ের আড়ালে পড়ে গেছে। খুব ক্ষীণ গলা পাওয়া গেল হরিপদর, সবই মানছি দাদা, তবে ভিড়টা যে বড্ড চেপে এসেছে। এত ভিড় কি ভালো?

কালী একটা হুঙ্কার ছেড়ে বলে, ভালো নয়, মানে? এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে? দেখছিস না ভক্তের পায়ের ধুলোয় একেবার তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠছে জায়গাটা!

বুড়ো পুরুতমশাই রোগাভোগা মানুষ। এতক্ষণ মন্দিরের বারান্দায় চুপচাপ বসে ছিলেন। তা ভিড় সেখানেও ঠেলে ওঠায় তিনি আসন গুটিয়ে বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে জবা গাছটার তলায় দাঁড়ালেন। না আজ ভিড়টা যেন বড্ড বেশি। অথচ আজ কোনও বিশেষ তিথি নক্ষত্রের যোগ নেই, কোনও বিশেষ ছুটির দিনও নয়। ভিড়ে ভিড় মন্দির চত্বর, মন্দির, কালীমূর্তি সবই যেন চাপা পড়ে গেল।

কালীর চারদিকে এত লোক আর এত হাত এগিয়ে আসছে যে কালী হিমসিম খাচ্ছে। 'এই যে আমাকে!' 'এই যে এধারে' বলে ভীষণ চিল্লামিল্লি হচ্ছে। দু'একটা হাতের আঙুলের খোঁচাও এসে লাগছে কালীর পেটে বা কোমরে, তার ভীষণ কাতকুতু লাগে।

ওরে বাপু, একটু সরে লাইন দাও না তোমরা? অমন গায়ে এসে পড়ছ কেন? ভয় নেই, সবাই পাবে। চরণামৃত না দিয়ে আমি যাচ্ছি না।

একজন বলল, সেই কখন থেকে লাইন দিয়েছি মশাই। একটু চরণামৃত পেতে এক ঘণ্টার ওপর লাগছে!

আর একজন বলল, ওঃ, আমি তো দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে—কালীর ঝুঁটি খুলে পড়েছে, রক্তাম্বর সরে গেছে গা থেকে। সাঙ্ঘাতিক অবস্থা।

তারপর হঠাৎ যেমন ভিড়টা জমে উঠেছিল তেমনি আবার হঠাৎ করে ভিড় পাতলা হয়ে গেল। তারপর সব ভোঁ ভাঁ, সুনসান।

প্রথম দেখে পুরুতমশাই, ও কালীবাবু, 'সর্বনাশ! মায়ের গায়ের সব সোনার গয়না যে গায়েব! মাথার হীরে বসানো টিকলিটাও যে নেই!'

অ্যাঁ!

কালী হাঁ। মা কালীর গায়ের অন্তত বিশ ভরি সোনা, হীরে-মুক্তো, স্ফটিকের মালা, রূপোর মালা, বাটি-গেলাস, সোনার ঘণ্টা সব গায়েব।

হরিপদ একগাল হাসল, বললুম কিনা কালীদা, দীনু অনেক ওপরে যাবে। তোমাকেই না টেক্কা দিয়ে দেয়। কালী কিছুক্ষণ ব্যোম হয়ে থেকে বলল, ওর হবে।

সংবর্ধনা

এই যে বিশুবাবু, নমস্কার। শুনলুম আপনার মামাশ্বশুর নাকি লটারি পেয়েছেন!

ঠিকই শুনেছেন।

তা কত টাকা পেলেন তিনি?

ভালোই পেয়ে থাকবেন। পাঁচ-দশ লাখ পেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

তাহলে বিশুবাবু এ তো বেশ গৌরবের কথাই, কী বলেন? লটারি ক'জন পায় বলুন! লটারি পাওয়া মানে তো দশজনের একজন হয়ে ওঠা। এই গৌরবজনক ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে কি আপনার কিছু করা উচিত নয়? মামা শ্বশুর তো আর পর নয়। আমাদের সকলেরই তো মামাশ্বশুর আছে, কেউ তো এমন বিরল কৃতিত্ব দেখাতে পারিনি। আমার মামাশ্বশুর তো হাড়হাভাতে। আপনার কি মনে হয় না যে লটারি জেতার জন্য ওঁকে প্রথমে একটা গণ ও পরে একটা নাগরিক ও তারও পরে একটা পুর সংবর্ধনা দেওয়া উচিত!

তা তো বটেই।

এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা প্রায় ত্রিশ বছরের। ত্রিশ বছরে মোট সাতশো একত্রিশজনকে নানারকম কৃতিত্বের জন্য সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা আমিই করেছি। ব্যায়ামবীর বলরাম শীল, নৃত্যশিল্পী কল্লোলিনী কয়াল, জাদুকর পি পাল, সাঁতারু বিপ্লব বসু'র মতো বিখ্যাত লোকরা তো আছেই। তাছাড়া ধরুন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরল কৃতিত্বের জন্য আমরা পাঁচু চোর, পরেশ পকেটমার, গুল মারার জন্য গয়েশ গায়েন—এদেরও বাদ দিইনি। সংবর্ধনায় আমার খুব হাতযশ।

শুনে বড্ড খুশি হলাম। আপনি করিতকর্মা লোক।

আজ্ঞে সবাই তাই বলে, তবে এটাকে আমি দেশ বা দশের সেবা বলেই মনে করি। অনেকেই বলে বটে, নিতাইবাবুর মতো এরকম আত্মত্যাগ, এরকম কর্মোদ্যোগী, এত বড় সংগঠন বড় একটা দেখা যায় না, কিন্তু আমি ভাবি, এটা তো আমার পবিত্র কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। কী বলেন?

না না, তা বললে হবে কেন? আপনি বিনয়ী মানুষ বলেই কৃতিত্ব স্বীকার করতে চাইছেন না। কিন্তু আত্মত্যাগ কটা লোক আর করছে বলুন।

সে অবশ্য ঠিক কথা। সেদিন নবীনবাবু তো বলেই ফেললেন, নিতাইবাবু, আপনি দেশের যুবসমাজের কাছে এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

নবীনবাবু ঠিকই বলেছেন।

আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে এভাবে জনগণের সেবা যেন আজীবন করে যেতে পারি।

সে তো বটেই। সেবাটা চালিয়ে যাওয়াই উচিত।

তবে কি না সেবা করতে করতেই জীবনটা কেটে যাচ্ছে, নিজের দিকে আর তাকাতে পারলুম কই বলুন।

দেশসেবকরা, জনগণের সেবার্তরা নিজের দিকে তো তাকায় না। তাকাতে নেইও।

এই আপনার মামাশ্বশুরের কথাই ধরুন, আমরা পাঁচজন তাঁর কৃতিত্বের কথা সর্বসমক্ষে তুলে না ধরলে একটা জাতীয় কর্তব্যকেই কি অবহেলা করা হবে না? আগামী রোববারই আমরা সংবর্ধনা কমিটি তৈরি করছি। লোকের অনুরোধে আমি সভাপতি হতে অনিচ্ছে সত্ত্বেও রাজি হয়েছি।

আপনার মতো কৃতী লোক থাকতে অন্য কাউকে সভাপতি করা হবেই বা কেন বলুন। সেটা যে গুরুতর অন্যায় হবে।

হেঃ হেঃ, সেইজন্যই রাজি হতে হল। সংবর্ধনা তো চাট্টিখানি কথা নয়! হল ভাড়া করা, ফুলের তোড়া, মালা ইত্যাদির জোগাড়, তারপর ধরুন উদ্বোধনী সঙ্গীতের আর্টিস্ট এসব তো লাগবেই। সংবর্ধনার পর জনগণের মনোরঞ্জনেরও তো একটু ব্যবস্থা রাখতে হবে, না কি? তার জন্য কিশোরকণ্ঠী, মুকেশকণ্ঠী, হেমন্তকণ্ঠী কয়েকজন আর্টিস্টকে আনা, একটা মূকাভিনয়, একটু ম্যাজিক ট্যাজিক, তারপরে একখানা নাটক, হরবোলা, অর্কেস্ট্রা কোনটা না হলে চলে বলুন। মাইকের ভাড়া জলযোগের ব্যবস্থা এসবও তো না করলেই নয়।

যে আজ্ঞে। এসব তো সংবর্ধনার চিরকালীন অঙ্গ, বাদ দিলে অঙ্গহানি হবে।

খরচাপাতিও আছে, তা ধরুন গিয়ে হাজার বিশেক টাকা হলে ম্যানেজ করে নেওয়া যায়।

বিশ হাজার তো আজকালকার বাজারে কিছুই নয়! আপনি ভালো সংগঠক বলেই হয়তো ম্যানেজ করতে পারবেন।

যে আজ্ঞে, তবে ওটা জনগণের চাঁদা থেকেই তুলে নিতে হবে। আর বাকি হাজার বিশেক টাকা যদি আপনার মামাশ্বশুরকে বলে একটা ডোনেশনের ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে আর ভাবনা থাকে না। লটারিটা তো হেলায় জয় করেছেন, ওই সামান্য টাকা ওঁর গায়েই লাগবে না।

সে আর বেশি কথা কী? যিনি লটারি মেরেছেন তার তো আর টাকার অভাব নেই। ও নিয়ে আপনি ভাববেন না।

নিশ্চিন্ত হতে পারি তো?

নিশ্চয়ই। তবে মামাশ্বশুরকে বলে টাকা আদায় করতে একটু সময় লাগবে।

কেন বলুন তো, উনি কি খুব ব্যস্ত?

তা ব্যস্তই বোধহয়। লটারি পেলে সকলেই তো খুব ভি আই পি হয়ে ওঠে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো ঠিকই। আপনি বরং আমাকে একবার তাঁর কাছে নিয়ে চলুন।

সেটাও শক্ত নয়, তবে দেরি হবে।

আচ্ছা, এই দেরিটার কথা বারবার বলছেন কেন বলুন তো! নিজের মামাশ্বশুরের সঙ্গে কি আপনার সৎভাব নেই?

আজ্ঞে সৎভাব থাকারই তো কথা ছিল।

তবে দেরি হবে কেন?

লজ্জার কথা হল তাঁকে খুঁজে বার করতে একটু সময় লাগবে।

বলেন কি? তিনি কি লটারি পেয়ে সাধু বা পাগল বা বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়েছেন? লটারি পাওয়ার শক অবশ্য অনেকে ঠিক সামলাতে পারে না।

সেরকমও হতে পারে। আমার কাছে সঠিক তথ্য নেই। তবে সময় দিলে আমি তাকে ঠিকই খুঁজে বের করব?

হ্যাঁ হ্যাঁ, সাক্ষাৎ মামাশ্বশুর বলে কথা। তার ওপর শাঁসালো মানুষ। এরকম মানুষ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে আমাদের কাজকারবারই চলবে কিসে?

ঠিক কথাই, তবে আপনার অনুরোধ আমার মনে থাকবে। আমি তাকে খুঁজে বের করবই।

কত দেরি হবে বলতে পারেন?

তা দু'চার বছর ধরে রাখুন।

অ্যাঁ! সর্বনাশ! দু'চার বছর কী বলছেন মশাই? তাহলে সংবর্ধনার কী হবে? পাড়ার ক্লাবের ছোকরারা যে আমাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে। বলি পুলিশে খবর দিয়েছেন তো!

আজ্ঞে না, পুলিশকে এখনও জানানো হয়নি অবিশ্যি। তবে ঘটককে বলা হয়েছে বলে শুনলাম।

ঘটক! এর মধ্যে ঘটক আসছে কেন? লটারি পেয়ে আপনার মামাশ্বশুর কি আরও বিয়ে করতে চান নাকি?

তা চাইতেও পারেন। আমার ঠিক জানা নেই, তবে ঘটক ছাড়া তাকে খুঁজে বার করা মুশকিল।

কেন বলুন তো! ঘটকের ভূমিকাটা কী?

উনিই খুঁজে আনবেন কিনা, অবিশ্যি মামাশ্বশুরের আগে তার ভাগ্নীকেই খুঁজে পাওয়া দরকার।

ভাগ্নী! আচ্ছা মশাই, ভাগ্নীর কথা উঠছে কেন?

যার ভাগ্নী নেই তার যে মামাশ্বশুর হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতাই নেই, এটা তো মানবেন!

সে তো ঠিকই, কিন্তু আপনার মামাশ্বশুরের অসুবিধাটা কী?

সেটা তাকেই জিজ্ঞেস করা যেতে পারত যদি তিনি বিধিমতো আমার মামাশ্বশুর হতেন। বাধাটা কোথায়?

মামাশ্বশুর হননি বলেই বাধা, যার মামাশ্বশুর থাকে না সে যে অতি হতভাগ্য তা আজ আপনার কথা শুনেই বুঝলাম। ব্যাপারটা হল আপনার কথামতো লটারিজেতা মামাশ্বশুর খুঁজতে হলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

সবই যে গুলিয়ে দিচ্ছেন মশাই।

ব্যাপারটা গোলমেলে ঠিকই, কথাটা হল মামাশ্বশুর বা নিদেন তার ভাগ্নীটিকে যদি খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে সমস্যাটা জটিলই থেকে যাবে। প্রথম তার ভাগ্নীকে খুঁজে বের করা, পাত্রী দেখা, বিয়ের জোগাড়যন্তর করা, বিয়ে হওয়া—এই এতসব কাণ্ডের পর তবে না আপনি আমার মামাশ্বশুরের নাগাল পাবেন?

তার মানে কি আপনার মামাশ্বশুরই নেই বিশুবাবু?

আজ্ঞে না। মামাশ্বশুর নেই, তার ভাগ্নীর সঙ্গে আমার বিয়েটাই যে হয়নি এখনও, আর আমি বিশুবাবুও নই।

তাহলে তো মুশকিলে ফেললেন মশাই। সংবর্ধনাটা কি ভেস্তে যাবে তাহলে? সংবর্ধনার জন্য যে পাড়ার ছেলেগুলো ক্ষেপে উঠেছে।

আহা, তাতে আটকাচ্ছে কেন? আপনার মতো একজন কৃতী মানুষকেও তো জনগণের সংবর্ধনা দেওয়া উচিত।

তা অবশ্য খুব একটা খারাপ বলেননি, তাহলে দিন তো মশাই, শতখানেক টাকা চাঁদা দিন, নিজের সংবর্ধনাটা সেরে ফেলি।

সেই ভালো, কিন্তু ওই যাঃ, অত টাকা যে সঙ্গে নেই!

কত আছে?

দাঁড়ান, বোধহয় টাকা পাঁচেক হতে পারে।

তাই বা মন্দ কী! কাঁটছাঁট করে ওতেও সংবর্ধনা হয়ে যাবে। দিন, পাঁচ টাকাই দিন।

নীল গ্রহের বেঁটে লোকটা

কেলোকে সুবলবাবুর কুকুর বললে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। তবে একথা ঠিক যে সুবলবাবু রোজ রাতে মাংস দিয়ে রুটি খান। আর পাতের আধখানা রুটি, মাংসের হাড়-টাড় আর ঝোল কেলোর বরাতে জোটে। বলা যায় কেলো তার ডিনারটা সুবলবাবুর বাড়িতেই সারে। তবে লাঞ্চ খেতে সে সুবলবাবুর বাড়িতে নয়, যায় হারাধনবাবুর বাড়িতে। হারাধনের বাড়িতে দুপুরবেলা হরেকরকম মাছ রান্না হয়, ফলে কেলোর লাঞ্চটা সেখানেই বাঁধা। কেলোর অবশ্য আরও দু'একজন স্পনসর আছে, যেমন ভূতনাথবাবু। তিনি সকালে লেড়ো বিস্কুট দিয়ে চা খেতে ভালোবাসেন। তা কেলো গিয়ে ভূতনাথবাবুর বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ লেজ নাড়লেই তিনি দু'খানা বিস্কুট ছুঁড়ে দেন। তাছাড়া সারাদিনই কেলোর বরাতে টুকটাক জুটে যায়। কাজেই কেলোর কোনও মালিকানা নেই, সে কারও বাঁধা কুকুর নয়। সে আছে দিব্যি আরামে। শীতকালে সে রাখালবাবুর গোয়ালঘরে রাতে গিয়ে শোয়, সেখানে রাখালবাবু ঝুড়িতে খড় বিছিয়ে রাখেন কেলোর জন্যেই। তবে গ্রীষ্মকালে সে রাত্রিবাস করে মদনবাবুর বারান্দায়, সেখানে মদনবাবু তার জন্যই একটা ছেঁড়া চট পেতে রাখেন।

তা গাঁয়ে কেলো ছাড়াও অন্যান্য কুকুর আছে। তারা না খেয়ে থাকে না ঠিকই, কিন্তু কেলোর মতো এমন খাতিরও পায় না। তার কারণ হল, কেলো ঠিক দিশি কুকুর নয়। তার গায়ে বড় বড় লোম, কান দুটো ঝোলা এবং বেশ বড়বড় আর আকার-প্রকারেও সে অন্য সব কুকুরের চেয়ে অন্তত দেড়গুণ লম্বা চওড়া। কেলোর হাঁক-ডাক শোনা যায় না। গাঁয়ে গুজব আছে, কেলো আসলে বোবা এবং কালা। তার হাঁকডাক যেমন শোনা যায় না, তেমনি কেউ কেলো বলে ডাকলে সে ফিরেও তাকায় না। কাছে আসা দূরে থাকুক, অন্য কুকুর ডাকলে যেমন সব কুকুরই সাড়া দেয়, কেলো কখনও তা করে না। আগে অনেকের ধারণা ছিল, কেলো দেমাকি কুকুর, অন্য কুকুরদের কুকুর বলেই গ্রাহ্য করে না। কিন্তু গাঁয়ের প্রবীণ মানুষ গোবর্ধন সাহা বলেন, বছর দশেক আগে বর্ষাকালে একবার ভয়ংকর একটা বাজ পড়ার শব্দেই নাকি ছানা অবস্থাতেই কেলো বাক ও শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলে।

প্রাণগোবিন্দ এ কথা শুনে বলল, সে তো বুঝলুম, কিন্তু কেলো এ গাঁয়ে এল কোত্থেকে? আর সব তো নেড়ি কুকুর, কেলোর মতো বিলিতি চেহারার কুকুর তো এখানে জন্মাতে পারে না।

গোবর্ধন সাহা বললেন, তা ঠিক। তবে সেই বৃত্তান্ত আমার জানা নেই। একদিন সকালে ঝোলা কানওয়ালা একটা কুকুরছানাকে রাস্তায় কুঁইকুঁই করতে দেখে পাগলা পটল সেটাকে তুলে নেয়। পটলা ভিক্ষে-সিক্ষে করে যা পেত তা-ই কুকুরটার সঙ্গে ভাগাভাগি করে খেত। বছর তিনেক বাদে পটলা মারা যাওয়ার পর থেকে কেলো একা। কুকুরছানাটাকে কে যে এখানে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল তা কেউ জানে না।

কেলোর যেমন সুনাম আছে যে, সে কাউকে তাড়া করে না বা কামড়ায় না, সে কখনও ঘেউ-ঘেউ করে কারও ঘুম ভাঙায় না, অন্য কুকুরদের সঙ্গে ঝগড়া-কাজিয়া বা লড়াই করে না, তেমনি তার বদনামও আছে, যেমন সে কারও কোথাও উপকারে আসে না, চোরেরা তাকে ভয় পায় না, কারও বাড়ি পাহারা দেয় না, ইত্যাদি।

রোজ দুপুরবেলায় কদমতলার মাঠে চোরেদের একটা মিটিং হয়। এই তল্লাটের চোরদের সর্দার হল বুড়ো পীতাম্বর। আজ কে কোন গাঁয়ে কোন গেরস্তের বাড়ি হানা দেবে তা সে-ই ঠিক করে দেয়। কার বাড়িতে মেয়ের বিয়ের গয়না কেনা হয়েছে, কে ধান বা পাট বেচে টাকা পেয়েছে, কার বউ নতুন সোনার হার পরে পাড়া-প্রতিবেশীকে দেখিয়ে বেড়িয়েছে, সব তার নখদর্পণে। ছোট ছোট কাগজের টুকরোয় 'ট্যারা কুণ্ডু' 'পবনবাবু' 'চরণডাঙার সুধীর ঘোষ' 'কালীতলার সূর্য দাস'—এইসব লিখে যার যার টিকিট দিয়ে দেয়।

আজ গেনুর ভাগে পড়েছে 'রাখালবাবুর বাড়ি'। সে নতুন চোর, তাই প্রথমে বড় বড় কাজ দেওয়া হচ্ছে না। রাখালবাবু সাদামাটা গেরস্ত, তার বাড়িতে যে দাঁও মারার সুযোগ নেই তা গেনু জানে। হাত পাকানোর জন্য প্রথমে এইসব ছোটখাটো বাড়িই বরাদ্দ করা হয়। নতুন চোর বলেই তার উৎসাহ বেশি। সে সন্ধেবেলাতেই সিঁধকাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। চারপাশটা একটু ঘুরে ফিরে দেখে, রাত একটু বাড়লে আসল কাজে হাত দেবে।

শীতলপাটি গাঁ সন্ধের পরেই শুনশান, গাঁয়ের লোক বেশি রাত অবধি জাগে না, বেশিরভাগই সন্ধেরাত্তিরেই শুয়ে পড়ে। গেনু গাঁয়ে একটা কাজ পেয়ে বেশ খুশিই হল। আজ চেপে শীত পড়েছে, চারদিকে যেন কুয়াশা, তার ওপর ঘোর কৃষ্ণপক্ষ চলছে। এরকম রাতেই কাজের সুবিধে।

গেনু রাত দশটা নাগাদ যখন রাখালবাবুর বাড়িতে পৌঁছোল তখন রাখালবাবুদের মধ্যরাত। গেনু কান পেতে শুনল, কোথাও কোনও শব্দ নেই। শ্বাস-প্রশ্বাস শুনে বুঝল, শীতের রাতে লেপের তলায় সবাই আরামসে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। গেনু চারদিকে ঘুরে সুলুক সন্ধান নিয়ে দেখল, এ বাড়িতে ঢুকতে হলে জানালার শিক বাঁকিয়ে ঢুকতে হবে। পাকা বাড়িতে সিঁধ দেওয়ার উপায় নেই। খুঁজে খুঁজে সে বাড়ির পিছন দিকে ভাঁড়ার ঘরে একটা দুর্বল জানালা আবিষ্কার করল। তার মতো আনাড়ি চোরের কাছেও বেজায় সহজ কাজ।

গেনু উবু হয়ে বসে যখন থলি থেকে তার যন্ত্রপাতি বের করছিল তখন হঠাৎ কাছেপিঠে খুব চাপা গলায় কারও কথাবার্তা শুনতে পেল হঠাৎ। গেনু কাজ থামিয়ে চারদিকে চাইল, কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু কথাবার্তা যে হচ্ছে তাতে ভুল নেই। কিন্তু কথাটা বাড়ির ভিতরে হচ্ছে না বাইরে সেটা বুঝতে একটু সময় লাগল তার।

খুব খেয়াল করে মন দিয়ে শোনার পর তার মনে হল, কথাবার্তার শব্দ আসছে গোয়ালঘর থেকে। তবে কি কোনও গরুচোর এসে হানা দিয়েছে! সেরকম হওয়ার তো কথা নয়। পীতাম্বর সর্দার কখনও এক বাড়িতে দুটো চোরকে পাঠায় না। তার নিয়ম খুব কড়া। তাহলে এত রাতে গোয়ালঘরে কথা কইছে কে? রাখালবাবু কি রাত পাহারার ব্যবস্থা করেছে?

চিন্তিত গেনু যন্ত্রপাতি ফেলে রেখে বেড়াল-পায়ে হেঁটে গিয়ে গোয়ালঘরের দরজায় কান পাতল। হ্যাঁ, ভিতর থেকে পরিষ্কার কথাবার্তার শব্দ আসছে, তবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, কারণ ভাষাটা বাংলা নয়। কিন্তু এই গাঁয়ে বাংলা ছাড়া অন্য বুলিতে কথা কওয়ার লোকই বা কে আছে?

গেনু ভারি ফ্যাসাদে পড়ল। যারা কথা কইছে তারা যে ভালো লোক নয় তাতে সন্দেহ নেই। তবে কি বাইরের চোর এসে গাঁয়ে ঢুকেছে?

চিন্তিত গেনু গোয়ালঘরের ভাঙা পাল্লার জানালাটা দিয়ে খুব সাবধানে ভিতরে উঁকি দিল। ভিতরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। রাখালবাবুর গোয়ালঘরে গরু নেই। যে গরুটা ছিল সেটা মাসকয়েক আগে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। এখন বোবা-কালা কুকুর কেলোটাই রাতে এসে শুয়ে থাকে। নড়বড়ে একটা দরজা অছে বটে তবে তার পাল্লার তলায় বিশাল ফোঁকর, উইয়ে খেয়ে গেছে।

ভিতরে দুটো গলা শোনা যাচ্ছে। তার মানে চোর একজন নয়, দু'জন, এবং এরা এ তল্লাটের লোক নয়। ভাষাটা হিন্দি হলেও গেনু বুঝতে পারত। কিন্তু এরা কথা কইছে ভারি অদ্ভুত ভাষায়, অং-বং-ডিং-গুবগুব-টুংটাং-পিড়িং— এইসব শব্দ।

তাজ্জব হয়ে গেনু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কী করবে তা বুঝে উঠতে পারল না। চোরে চোরে কাজিয়া-বিবাদ মোটেই ভালো কথা নয়। তার ওপর ওরকম অদ্ভুত ভাষায় যারা কথা কয় তারা কেমন লোক কে জানে।

ঠায় চেয়ে থাকলে কিছুক্ষণ পর অন্ধকার চোখে সয়ে যায়, আর তখন একটু-আধটু দেখাও যায়। চোরের কাজই তো অন্ধকারে, কাজেই চোখের ক্ষমতা অন্যদের চেয়ে গেনুর একটু বেশি। বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর সে দেখতে পেল একটা সাদা পোশাক পরা বেঁটে মতো লোক একটু নীচু হয়ে যার সঙ্গে কথা কইছে সে বোবা-কালা কেলো। আশ্চর্যের বিষয় হল, কেলোও লোকটার সঙ্গে কথা কইছে বলে গেনুর মনে হল। কিন্তু মনে হলেই তো হবে না, মানুষের তো কত ভুলভাল কথা মনে হয়। সবাই জানে কুকুরেরা কখনও কথা কয় না, তার ওপর কেলো হল বোবা আর কালা, জীবনে তার একটা ঘেউ অবধি কেউ শুনতে পায়নি। তাহলে গেনু ভুলই দেখছে! তাই সে আরও একাগ্র হয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করল।

চোখটা আরও একটু সইয়ে নেওয়ার পর গেনু এবার স্পষ্টই দেখতে পেল, কেলো পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে একেবারে মানুষ সমান খাড়া হয়ে আছে। শুধু তাই নয় কেলো সত্যিই কথাও কইছে! ভাষাটা বেজায় বিঘুকুটে বটে, কিন্তু কথা তো বটে। ভাষাটা আর যাই হোক, কুকুরের ভাষা নয়। নিজের চোখেকে অবিশ্বাস হচ্ছে গেনুর, মাথাটাও গোলমাল লাগছে, কিন্তু ব্যাপারটা অস্বীকারই বা করে কী করে?

ব্যাপারটা ভূতুড়ে কিনা তা বুঝতে পারল না গেনু, তবে সে বড্ড ভয় পেয়ে গেল। আর ভয় খেলে তো কারও কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। তাই সে হঠাৎ উত্তেজনা চাপতে জানালার পাল্লাটা চেপে ধরতেই ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল। চোখের পলকে বেঁটে লোকটা ফিরে তাকাল।

গেনুর হাত-পা এমন কাঁপছিল যে পালানোর চেষ্টাই করতে পারল না। তার আগেই লোকটা বিদ্যুতের গতিতে এসে তার ঘাড়টা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নেংটি ইঁদুরের মতো তুলে গোয়ালঘরের ভিতরে নিয়ে গেল। লোকটার গায়ে আসুরিক জোর, গেনু নড়তে অবধি পারল না।

লোকটা তাকে দাঁড় করিয়ে টক করে একটা থলি থেকে টুপি গোছের একটা জিনিস বের করে মাথায় পরিয়ে দিল। মাথাটা যেন কেমন টালমাটাল হয়ে যাচ্ছিল গেনুর। একবার মনে হল অজ্ঞান হয়ে যবে, কিংবা মরেই যাবে হয়তো। কিন্তু একটু বাদে সামলেও গেল। তাকিয়ে দেখল, বেঁটে লোকটার পরনে একটা সাদা পোশাক, মাথায় তার টুপির মতোই একটা টুপি, লোকটা তার দিকে চেয়ে সেই অদ্ভুত ভাষায় কিছু বলল, কিন্তু কথাটা স্পষ্ট বুঝতে পারল গেনু।

তুই কে?

আমি একজন চোর। আমার নাম গেনু।

চোর কাকে বলে?

যে অন্যের জিনিস সরায়।

বাঃ, বেশ মজার কাজ তো! কাজটা কি ভালো?

পেটের দায়ে করতে হয়। চুরি না করলে খাব কী?

কেন, এখানে কি লোকে খেতে পায় না?

আমরা গরিব।

গরিব কাকে বলে?

যাদের পয়সা নেই।

পয়সা কী জিনিস?

আপনি কোন দেশ থেকে আসছেন যে পয়সা চেনেন না!

আমরা যেখানে থাকি সেখানে কেউ চুরি করে না, কারও খাবারের অভাব নেই, আমরা পয়সা বলে কিছু জানি না।

বাপ রে, তাহলে তো সেটা স্বর্গ।

না, আমাদের গ্রহের নাম নীল গ্রহ।

কেলো বোবা কুকুর, ও কথা কইছে কি করে?

ও সাধারণ কুকুর নয়। দশ বছর আগে ওকে আমরা এখানে রেখে গিয়েছিলাম। ও এখানকার সব খবর সংগ্রহ করেছে। আজ ওকে আমি নিয়ে যাব।

এই শীতলপাটি গাঁয়ের কি কোথাও গুরুতর খবর আছে?

আছে! একানকার মাটি, জল, বাতাস, জীবাণু আর গাছপালা সম্পর্কে আমরা আগ্রহী। আমাদের নীল গ্রহে আমরা এসব জিনিস সৃষ্টি করতে চাই। আমাদের কুকুর খানিকটা যন্ত্র, খানিকটা জীব। ওর নাম ডিংডং, ওর মস্তিষ্কে সব খবর রেকর্ড করা আছে।

আমাকে আপনাদের দেশে নিয়ে যাবেন? এখানে বড় কষ্টে আছি।

কষ্ট! কষ্ট কী জিনিস?

ও আপনি বুঝবেন না। নিয়ে যাবেন?

না, আমাদের গ্রহে চোরের কোনও দরকার নেই। তুইও আর চুরি করবি না।

তাহলে আমার চলবে কি করে?

লোকটা তার ঝোলা থেকে একটা ছোট্ট টর্চের মতো জিনিস বের করে গেনুর কপালের মাঝখানটায় একটু চেপে ধরেই সরিয়ে নিল। বলল, যাও, আর তোমাকে চুরি করতে হবে না। আচ্ছা আসি।

কেলো আর বেঁটে লোকটা তার দিকে আর দৃকপাত না করে গটগট করে বেরিয়ে কুয়াশা আর অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পরদিন থেকে শীতলপাটি গাঁয়ে আর কেলোকে দেখা যায়নি। আর অন্যদিকে গেনুকেও আর কদমতলার মাঠে চোরেদের মিটিঙে দেখা যেত না। সে গাঁয়ের ইস্কুলে গিয়ে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শিখছে দেখে সবাই অবাক, আরও অবাক হল যখন যে পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে অনেক নম্বর পেয়ে ফার্স্ট হতে লাগল। কালীতলার জমিদার মহেন্দ্রপ্রতাপ এ খবর পেয়ে খুশি হয়ে তার জন্য মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিলেন।

গেনু রোজ ঠাকুরদেবতাকে পেন্নাম করার সময় আজকাল ওই বেঁটে লোকটাকেও মনে মনে পেন্নাম করে।

গঙ্গারামের রাগ

গঙ্গারামের সবই ভালো, শুধু রেগে গেলে তার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। আর না রাগলে গঙ্গারামের মতো মানুষ দুটো খুঁজে পাওয়া ভার। নিজের রাগকে ভালোই চেনে গঙ্গারাম, তাই সবাইকে সে সাবধানও করে দেয়, যা করো তা করো ভাই, আমাকে রাগিয়ে দিও না। তাহলেই রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যাবে ভাই।

সবাই তাই একটু সাবধানেই থাকে। গঙ্গারামকে কেউ পারতপক্ষে রাগিয়ে দেয় না।

গঙ্গারাম টের পায়, তার রাগটা প্রথমে শুরু হয় হাঁটুর কাছ থেকে। কেমন যেন টনটনিয়ে ওঠে প্রথমে, তারপর সেটা একলাফে উঠে আসে কোমরে। সেখানে কিছুক্ষণ ঘাপটি মেরে থেকে ঝাঁ করে শিরদাঁড়া ধরে একেবারে বানরের মতো উঠে আসে ঘাড়ে। সেখানে একটু জিরোয়। তারপর একলম্ফে মাথায় উঠে যায়। আর তখনই সর্বনাশ।

প্রতিবেশী রমেশবাবু লোক সুবিধের নন। ঝগড়া কাজিয়ায় খুব পারদর্শী! মামলা মোকদ্দমায় খুব ঝোঁক। তা তিনি গেল বছর বাগানের বেড়া নতুন করে বাঁধতে গিয়ে গঙ্গারামের জমির মধ্যে দু'হাত পরিমাণ ঢুকিয়ে বেড়া দিলেন, বললেন, এ জমি আসলে আমারই ছিল, দলিলেও আছে।

গঙ্গারাম একথা শুনেই টের পেল তার হাঁটু টনটন করছে। সে বলল, দেখুন রমেশবাবু, আপনি বয়সে বড়, আপনার সঙ্গে ঝগড়া কাজিয়া চাইছি না। তবে যাই করুন, আমাকে রাগিয়ে দেবেন না কিন্তু।

রমেশবাবু খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, তোমার রাগের তোয়াক্কা কে করছে হ্যাঁ!

গঙ্গারামের রাগ তখন হাঁটু ছেড়ে কোমরে উঠল। সে কাঁপতে কাঁপতে বলল, রমেশবাবু, আমার কিন্তু রাগ কোমর অবধি এসে গেছে।

রমেশবাবু গঙ্গারামের রাগের কথা মোটেই জানেন বলে মনে হল না। তিনি আরও একটু মাথা উঁচু করে বললেন, যাও, যাও, রাগ দেখাতে এসেছে!

গঙ্গারামের রাগ তখন কোমর ছেড়ে শিরদাঁড়া ধরে ফেলেছে এবং দিব্যি বাঁই বাঁই করে ওপরে উঠছে। ভাগ্য ভালো ঠিক এইসময়ে রমেশবাবুর বাড়ি কাজের মেয়েটা একটা প্লেট ভেঙে ফেলায় সেখানে তুমুল চেঁচামেচি লেগে গেল এবং রমেশবাবু তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

গঙ্গারামের রাগ ঘাড়ে বসে কিছুক্ষণ ল্যাজ দুলিয়ে ফের গুটিগুটি নেমে গেল। গঙ্গারাম হাঁফ ছেড়ে বলল, যাক অল্পের জন্য রমেশবাবুর ফাঁড়াটা কেটে গেল দেখছি।

সেদিন বাজারে এক মাছওয়ালা গঙ্গারামের পছন্দ করা আটখানা কৈ মাছ তার নাকের ডগা দিয়েই আর একজন শাঁসালো খদ্দেরকে দু'টাকা বেশি দরে বেচে দিল। গঙ্গারামকে গ্রাহ্যই করল না। গঙ্গারাম মাছওলাকে খুব শান্তভাবে বলল, এটা কি ভালো হল যতীন?

যতীন বেশ ডাঁটের সঙ্গে বলল, উনি কে জানেন! সাবজজ, সাবজজকে না দিয়ে আপনাকে দেব নাকি?

গঙ্গারাম তখনই টের পেল, হাঁটু ছেড়ে তার রাগ কোমরে উঠে পড়েছে। সে বলল, কিন্তু এটা কি অভদ্রতা নয়? না হয় দু'টাকা আমি বেশিই দিতুম।

আপনি! বলে হাঃ হাঃ করে বাজারশুদ্ধ লোককে শুনিয়ে যতীন হেসে উঠল। বলল, আপনি দেবেন বেশি? দরদাম না করে একদিনও মাছ কিনেছেন জীবনে? বড় মানুষেরা দরাদরির ধারই ধারে না।

গঙ্গারামের রাগ তখন ঘাড়ে উঠে মাথার দিকে লাফ দেবে কিনা ভাবছে। গঙ্গারাম ঘাড় চেপে ধরে যতীনকে বলল ঠিক আছে, যা হওয়ার হয়ে গেছে। আমাকে রাগিয়ে দিও না। রাগলেই কিন্তু সর্বনাশ।

যতীন ফের উচ্চকণ্ঠে বিদ্রূপাত্মক হাসি হেসে উঠল। গঙ্গারামের রাগ তখন আর সামলাতে না পেরে, হনুমানের মতো লঙ্কার দিকে লাফ দিয়ে ফেলেছে, লঙ্কাকাণ্ড বাঁধতে বাকি নেই। গঙ্গারাম আর তিলেক না দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল আলুওয়ালার কাছে। মনে মনে বলল, খুব বেঁচে গেল যতীন!

দুর্গাপুজোর চাঁদা চাইতে এসে কয়েকটা ছেলে বেশ চোখ রাঙিয়েই বলল, আপনার নামে পাঁচশো টাকা চাঁদা ধরা হয়েছে। কম করেই ধরেছি।

গঙ্গারাম যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে বলল, আমি পাঁচশো টাকা দিতে পারব না।

ছেলেগুলো বেশ গরম খেয়ে বলল, দেবেন না মানে? এ পাড়ায় বাস করতে হবে না আপনাকে?

গঙ্গারামের রাগ তখন হাঁটু কামড়ে ধরল, গঙ্গারাম অত্যন্ত ভদ্র গলায় বলল, দেখ ভাই, আর যাই করো আমাকে রাগিয়ে দিও না। রাগলে কিন্তু কুরুক্ষেত্র ঘটে যাবে।

ছেলেগুলো পেছপা না হয়ে আরও যেন বুক চিতিয়ে বলল, ওসব রাগ-ফাগ অন্য জায়গায় দেখাবেন। ভালো চান তো পাঁচশো টাকা ফেলে দিন, চলে যাচ্ছি। এখন অসুবিধে থাকলে পরে আসতে পারি। কিন্তু কনসেশন হবে না, আগেই বলে দিচ্ছি।

ছেলেগুলো চলে গেল। না গেলে খুবই বিপদ ছিল। নিজের রাগকে ভালো চেনে বলেই গঙ্গারাম আর বেগড়বাই না করে ওই পাঁচশো টাকাই চাঁদা দিয়ে দিল। টাকাটা গেল যাক, রক্তারক্তিটা তো হল না।

সেদিন অফিসে বড় সাহেব ডেকে পাঠিয়ে তার কাজে একটা ভুল দেখিয়ে বললেন, এরকম ইডিয়টের মতো কাজ করলে কি করে চলবে বলুন তো!

গঙ্গারামের রাগ ওই 'ইডিয়ট' শুনেই হাঁটুটা কুকুরের মতো কামড়ে ধরল। বলল, স্যার, আর এগোবেন না। খারাপ হয়ে যাবে।

বড় সাহেব অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললেন, আপনি একটা আস্ত স্টুপিড।

গঙ্গারাম গম্ভীর হয়ে বলে, স্টুপিড অবধি ঠিক আছে। কিন্তু আর এগোলে খুবই বিপদ হয়ে যাবে।

বড় সাহেব উঠে দরজা দেখিয়ে বললেন, গেট আউট! গেট আউট! আপনার মুখ দেখল পাপ হয়।

গঙ্গারাম তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। বড় সাহেবকে বাঁচানোর জন্যই। রাগটা আর একটু হলেই মাথায় চড়ে বসেছিল আর কি!

সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনাটা ঘটল এক রাতে। চারজন ডাকাত গঙ্গারামের সদর দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড শুরু করল। বাড়ির লোকের চেঁচামেচিতে উঠে পড়ল গঙ্গারাম। ডাকাত দেখে গম্ভীর হয়ে বলল, লাশ পড়ে যাবে কিন্তু! খুব সাবধান।

ডাকাতেরা তাকে একটা রদ্দা মেরে বলল, একদম কথা নয়। কথা বললে কেটে ফেলব।

গঙ্গারামের রাগটা তখন কোমর থেকে ঘাড়ে উঠছে। গঙ্গারাম অত্যন্ত ব্যথিত গলায় বলল, নিজের কবর নিজেরাই খুঁড়ছ! আমার রাগ কিন্তু ঘাড়ে চড়ে বসলো বলে। রাগলে আমি মানুষ থাকি না তা জানো?

ডাকাতরা গঙ্গারামকে বিড়বিড় করতে দেখে গ্রাহ্যই করল না। ট্রাংক বাক্স আলমারি সব ভাঙচুর করতে লাগল।

গঙ্গারামের রাগ তখন ঘাড়ে উঠে জিরিয়ে নিচ্ছে। হাঁটু থেকে ঘাড় অবধি ওঠা তো কম ধকল নয়। এবার লাফ দেওয়ার জন্য ইতিউতি চাইছে।

গঙ্গারাম গলা খাঁকারি দিয়ে ডাকাতদের উদ্দেশ্যে বলল, তোমরা তো দেখছি খুবই বিপদে পড়বে। আমার রাগ যে মাথায় উঠে গেছে প্রায়।

ডাকাতরা রে রে করে তেড়ে এসে গঙ্গারামকে আরও গোটা দুই রদ্দা কষিয়ে বলল, আহাম্মক! মরতে চাস!

গঙ্গারামের রাগ তখন ঘাড় ছেড়ে মাথায় উঠে গেছে। তারপর মাথা জুড়ে রঙিন ফুলঝুরি ছড়িয়ে পড়ল। গঙ্গারাম মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে বলল, কাজটা কি ভালো করলে তোমরা?

ডাকাতরা ফের গঙ্গারামকে রদ্দা মারতে এসেছিল, কিন্তু যা ঘটল তা নিরীহ ভীতু রোগা-ভোগা গঙ্গারামের কাছ থেকে তারা আশাই করেনি। চারটে ডাকাত কিছু বুঝে ওঠার আগেই কে কোথায় ছিটকে পড়ল, ঠিক যেন ঘূর্ণী ঝড় এসে তাদের উড়িয়ে দিল। চারটে ডাকাত ঘাড় লটকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল ঘরের মেঝেয়।

গঙ্গারামের বাড়ির লোকেরা ঘটনাটা চোখের সামনে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিল না। গঙ্গারাম তার রাগের কথা বলে বটে, কিন্তু কোনোদিন রাগটা দেখেনি তারা!

তারা গঙ্গারামকে ঘিরে ধরল, পাড়া-প্রতিবেশীরা এল, ক্লাবের সেই চাঁদাওলা ছোকরারাও এল, সবাই হাঁ করে চেয়ে রইল গঙ্গারামের দিকে। এ যে সাংঘাতিক লোক!

এরপর থেকে গঙ্গারামের রাগ উঠলেই লোকে সাবধান হয়ে যায়। অনেকে আবার জিগ্যেসও করে, রাগটা কতদূর উঠল গঙ্গারাম? হাঁটুতে, না মাথায়, না ঘাড়ে?

গঙ্গারামের খাতির বেড়ে গেছে।

গোপেনবাবু

গোপেনবাবু অতি নিরীহ এবং সজ্জন মানুষ। ধার্মিক বলেও তাঁর বেশ খ্যাতি আছে। তবে গোপেনবাবু নিতান্তই একজন গরিব লোক। একজন বদমেজাজী, হাড়কেপ্পন, সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত মহাজনের গুদামে তিনি হিসেব-রাখা কেরানির কাজ করেন। বেতন খুবই যৎসামান্য। তাতে গোপেনবাবু, তাঁর বৃদ্ধা মা, স্ত্রী এবং ছেলের পেট চলে না। ইদানীং খরচ বাঁচানোর জন্য গোপেনবাবু খাওয়া এতই কমিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর মাথা আজকাল প্রায়ই ভোঁ ভোঁ করে, চোখে অন্ধকার দেখেন। নিজের খাওয়া কাটছাঁট করে তিনি তাঁর বৃদ্ধা মা আর ছেলেকে দুটো বেশি ভাত খাওয়ার সুযোগ করে দেন। আর কেউ টের না পেলেও তাঁর স্ত্রী ব্যাপারটা ঠিকই টের পান। বলেন, এত কম খেলে শরীর টিঁকবে কী করে? গোপেনবাবু ভারি মধুর হেসে বলেন,—আজকাল একটু বয়স হয়েছে তো, তাই আর আগের মতো খেতে পারি না। বড় আইঢাই হয়। এই বলে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেয়ে উঠে পড়েন।

অফিসে তাঁর খাটনি প্রচুর। মালপত্র আসছে, যাচ্ছে, সেসব হিসেব রাখা, টাকাপয়সা গোনা এবং খাতায় হিসেব মেলানো। এইসব করতে-করতে বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যায় অনেক। ধুঁকতে-ধুঁকতে ফিরে পুজোপাট সেরে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে ক্লান্তিতে গভীর ঘুমে তলিয়ে যান। এর ওপর আছে মালিকের ধমক-চমক, শাসানি, কথায়-কথায় মাইনে কেটে নেওয়া বা তাড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখানো।

মালগুদামের কাজে উপরি পয়সা আছে। যেসব মহাজন মাল সরবরাহ করে তারা তাঁর সঙ্গে 'বন্দোবস্ত' করতে চেয়েছিল। বস্তায় কম মাল দিয়ে বেশি মাল দেখানোর জন্য। কিন্তু গোপেনবাবু হাতজোড় করে বলেছেন, বেশি খেয়ে মরার চেয়ে না খেয়ে মরাটাই আমার বেশি পছন্দ। ওই পাপের পয়সা আমি নিতে পারব না।

গোপেনবাবু যে ভালো লোক তা তাঁর মালিক বদ্রীপ্রসাদ-ও জানে। বদ্রীপ্রসাদের নিয়ম হল কর্মচারীরা দু-তিন বছরের পুরোনো হলেই কোনও ছুতোয় তাকে বিদেয় করে দেওয়া। তার ধারণা পুরোনো হলেই কর্মচারীরা চুরি করতে শুরু করে। একমাত্র গোপেনবাবুকেই বদ্রীপ্রসাদ বকাঝকা করলেও তাড়ায়নি। টানা এগারো বছর গোপেন এখানে চাকরি করছেন।

কিন্তু শেষ অবধি গোপেনবাবুরও শিয়রে শমন এল। বর্ষাকালে একদিন অনেক রাত অবধি বসে গুদামের হিসেব মেলাচ্ছিলেন গোপেনবাবু। হঠাৎ বদ্রীপ্রসাদ তাঁকে ডেকে বলল,—দেখো গোপেন, তুমি ভালো লোক

আমি জানি। কিন্তু ভালো লোকদের নিয়ে বিপদ কী জানো? তাদের ভালোমানুষির সুযোগে অন্যেরা গুছিয়ে নিতে পারে। আমি ভাবছি, ক'দিনের জন্য আমার দেশ রাজস্থানে যাব। তোমার ওপর গুদামের ভার দিয়ে যেতে আমার ভরসা হয় না। ভালো হলেও তুমি শক্তপোক্ত লোক নও। তাই ঠিক করেছি আমার ভাতিজা এখন মাস দুই কাজকর্ম সামলাবে। দু-মাস বাদে ফিরে এসে আমি তোমাকে ডেকে পাঠাব। তবে এ দুই মাসের মাইনে তুমি পাবে না।

গোপেনবাবুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। কিন্তু কী আর করেন। ঘাড় কাত করে বললেন,—তাই হবে।

বদ্রীপ্রসাদ বলল,—কাল থেকেই আমার ভাতিজা চার্জ নেবে। কাল থেকে তোমারও ছুটি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোপেনবাবু হিসেবের খাতা জমা দিয়ে নীরবে বেরিয়ে পড়লেন। প্রতিবাদ বা হাতে-পায়ে ধরা তাঁর স্বভাব নয়। বাইরে অন্ধকার রাস্তায় বেরিয়ে তাঁর মনে হল, দু-মাস অনেক লম্বা সময়। এতদিন তিনি বাঁচবেন না, কারণ তাঁর আর বাড়তি সম্বল নেই। তাঁর একমাত্র সম্বল হলেন ভগবান। তা ভগবানের যদি ইচ্ছে হয় তবে তিনি সপরিবারে মরবেন।

মনটা খারাপ বলে তিনি সরাসরি বাড়ি গেলেন না। ভাবলেন, নদীর ধারটায় গিয়ে খোলা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে মাথাটা একটু ঠান্ডা করেন।

তা ওখানকার নদীটা তেমন চওড়া নয়, তবে জলে খুব স্রোত। নদীর ধারটা এই বর্ষার রাতে যেমন অন্ধকার, তেমনি নির্জন। নদীর ধারে একটা গাছের তলায় বসে গোপেনবাবু চুপচাপ অন্ধকারে স্রোতের দিকে চেয়ে রইলেন। বাড়ি গিয়ে সত্যি কথাটা যখন বলবেন তখন কী হবে সেটাই ভেবে তিনি চিন্তিত হচ্ছিলেন। না, ভাগ্যের ওপর তাঁর রাগ নেই, ভগবানের ওপর তাঁর অভিমান নেই, কারও ওপর তাঁর হিংসে নেই, কাউকে তিনি শত্রু বলেও মনে করেন না। যা ঘটে, যা ঘটছে সবই তিনি মেনে নেন।

হঠাৎ দেখলেন, সামনেই নদীর ধার থেকে একটা লোক উঠে আসছে। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি বলেই মনে হল। কিন্তু এত রাতে তো খেয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা! লোকটা নদী দিয়ে এল কী করে?

ভদ্রলোক সোজা তাঁর দিকে আসছেন দেখে গোপেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

ভদ্রলোক কাছে এসে বললেন,—আচ্ছা বিদ্যেধরপুর কী করে যাওয়া যায় বলুন তো, আমার বিশেষ দরকার। আমার ছেলের আজ বিয়ে। বরযাত্রীরা বর নিয়ে এগিয়ে গেছে। আমার নৌকোটাই পিছিয়ে পড়েছিল। কিন্তু না গেলেই নয়।

গোপেনবাবু অবাক হয়ে বললেন,—কিন্তু বিদ্যেধরপুর যে অনেক দূর। মাইল দশেক তো হবেই। বাস তো কখন বন্ধ হয়ে গেছে।

ভদ্রলোক মাথায় হাত দিয়ে বললেন, সর্বনাশ! আমি না গেলে যে বিয়ে ভেস্তে যাবে। কোনও উপায় হয় না?

গোপেনবাবু একটু ভেবে বললেন,—আমি একটা গুদামে কাজ করি। ভাগ্যক্রমে আমার সঙ্গে ম্যাটাডরওলাদের জানাশুনা আছে। যদি তাতে যেতে চান তবে ব্যবস্থা হতে পারে।

বাঁচালেন মশাই। এখন ম্যাটাডরই আমার পুষ্পকরথ।

গোপেনবাবুকে সবাই ভারি ভালোবাসে। বাজারের একজন ম্যাটাডরওলাকে গোপেনবাবু গিয়ে বলতেই রাজি হয়ে গেল। ভদ্রলোক ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেলেন। গোপেনবাবু বাড়ি ফিরে এলেন।

পরদিন দুর্বল শরীরে ঘুম থেকে উঠে পুজোপাঠ সেরে একটু চা খেয়ে এক চিলতে বারান্দায় গিয়ে বসে রোদ পোয়াতে লাগলেন। আজ আর কাজে যেতে হবে না। বদ্রীনাথ এ মাসের মাইনেটাও দিয়ে যায়নি। সুতরাং হাঁড়ি চড়বে কি না কে জানে, বসে-বসে তিনি কালকের লোকটার কথা ভাবতে লাগলেন। লোকটা কী ছেলের বিয়েতে গিয়ে ঠিক সময়ে হাজির হতে পেরেছিল?

বসে-বসে একটু ঢুলুনি এসেছিল গোপেনবাবুর।

হঠাৎ গোপেনবাবু, ও গোপেনবাবু, ডাক শুনে চোখ চাইলেন। সামনে কাল রাতের সেই ভদ্রলোক। দিনের আলোয় দেখা গেল, মানুষটির বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারা, সুপুরুষ এবং অমায়িক।

গোপেনবাবু শশব্যস্তে উঠে বললেন,—আপনার ছেলের বিয়ে ঠিকমতো হয়ে গেছে তো?

হ্যাঁ, সব ভালোয়-ভালোয় মিটে গেছে। কিন্তু ম্যাটাডরওলা বলছিল, আপনার নাকি চাকরি গেছে?

আজ্ঞে, ওরকম ঘটনা তো ঘটেই। আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না।

শুনুন মশাই, সম্প্রতি আমার দিদিমা মারা গেছেন। মরার সময় তিনি আমাকে নগদ দশ লাখ টাকা আর বিষয়-সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। টাকাটা পড়ে আছে সিন্দুকে। ভাবছি এই তায়ের গঞ্জে একটা ব্যবসা করব। আপনার মালিক যা করে তাই। পাইকারি মাল বেচাকেনা। ব্যবসা দেখার সময় আমার নেই। তাহেরপুরে আমার নিজের আরও কয়েকটা বড় কারবার আছে। ব্যবসাটা দেখবেন আপনি। শুনেছি আপনি বড় সৎ লোক। আপনি আমার কর্মচারী হবেন না কিন্তু, হবেন ওয়ার্কিং পার্টনার। ব্যবসার সব দায়িত্ব আপনার। শুধু লাভের অর্ধেকটা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। টাকা ফেলে রেখে লাভ কী বলুন, কাজে লাগুক। টাকা যত নড়ে, তত বাড়ে।

গোপেনবাবু ভরি লজ্জায় পড়ে আপত্তি করতে লাগলেন। কিন্তু ভদ্রলোক ছাড়লেন না। বললেন,—আমি লোক চিনি মশাই, আমাকে ফেরাতে পারবেন না।

গোপেনবাবু রাজি হলেন, ভদ্রলোক একটা দশ লাখ টাকার চেক কেটে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন,—আজই বড় একটা গোডাউন ভাড়া নিন।

গোপেনবাবু বদ্রীপ্রসাদের ব্যবসার সব মারপ্যাঁচ জানেন। কর্মচারীদেরও চেনেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর ব্যবসা জাঁকিয়ে উঠল। বদ্রীপ্রসাদের খদ্দেররা এসে ভিড় করতে লাগল গোপেনবাবুর গুদামে।

মাসখানেকের মধ্যে টাকার বান ডেকে গেল। কিন্তু গোপেনবাবুর মাথা গরম হল না। শান্তভাবে খুব বিচক্ষণতা আর দক্ষতার সঙ্গে তিনি হাল ধরে রইলেন। ভোগ বিলাসিতার দিকে গেলেন না। অমিতব্যয়ের পথে হাঁটলেন না। সঞ্চয়ে মন দিলেন। ব্যবসা আরও বাড়িয়ে ফেললেন। লাভের অর্ধেক নিয়মিত কৃষ্ণকিশোরবাবুর কাছে পৌঁছে দিতে লাগলেন। সবাই খুশি।

দু-মাস বাদে বদ্রীপ্রসাদ ফিরে নিজের ব্যবসার হাল দেখে মাথা চাপড়াতে লাগল। তার অপদার্থ ভাতিজা ব্যবসা ডুবিয়ে বসে আছে। লোকমুখে গোপেনবাবুর নামডাকও শুনল সে।

একদিন নিজের চোখে গোপেনের ব্যবসা দেখতে এসে বলল,—গোপেন, তুমি আমাকে পিছন থেকে ছুরি মারলে তাহলে?

গোপেনবাবু দুঃখিতভাবে বললেন, না শেঠজি, ছুরি আপনি যে নিজেই নিজেকে মেরে বসে আছেন।

রামলাল আর শ্যামলাল

মনসাপোঁতা গাঁয়ের রামলাল আর শ্যামলালের ঝগড়া-বিবাদের এই বারো বছর চলছে। কুমোরপাড়ায় তাদের পাশাপাশি বাড়ি। গত বারো বছর তাদের মুখ দেখাদেখি নেই। রামলালের বাড়ির যে দিকটায় শ্যামলালের বাড়ি, সেদিকটার সব জানলা কটকটে করে বন্ধ, শ্যামলালের বাড়িতেও একই ব্যবস্থা। তাদের কেউ কারও মুখ দেখে না বলে মুখোমুখি ঝগড়াও এখন আর হয় না। তবে রামলাল আকাশ বাতাসকে উদ্দেশ্য করে তর্জন গর্জন ছাড়ে, শ্যামলাল তার পাল্টি দেয়। শুধু মনসাপোঁতা নয়, রামলাল আর শ্যামলালের ঝগড়ার কথা আশেপাশের আরও দশটা গাঁয়ের লোক জানে। আর ঝগড়া তাদের এমনই সাঙ্ঘাতিক যে, শ্যামলালের নেড়ি কুকুরটা কখনও রামলালের বাড়ি এঁটো ঘাঁটতে যায় না, আর রামলালের বাড়ির বেড়ালটা কোনওদিন শ্যামলালের বাড়ির দুধ বা মাছ চুরি করতে যায় না। রামলালের ছেলের সঙ্গে শ্যামলালের ছেলের, বা শ্যামলালের মেয়ের সঙ্গে রামলালের মেয়েরও কোনও ভাবসাব নেই। রামলালের গিন্নি করুণাময়ী আর শ্যামলালের গিন্নি জ্যোতির্ময়ীর কোনও সম্পর্কÅ নেই।

গত বারো বছর ধরে রামলাল আর শ্যামলালের ঝগড়া শুনবার জন্য গাঁয়ের লোক জমা হয়ে আসছে। এই ঝগড়ার জন্য দু'জনেরই নানা প্রস্তুতি আছে। দু'জনেই ব্যায়াম করে, ভোরবেলায় গলা সাধে, নুন গরম জল দিয়ে রোজ গার্গল করে এবং গলার নানারকম যত্নও নেয়। রোজ সকাল দশটা নাগাদ রামলাল প্রস্তুত হয়ে সামনের বারান্দায় বেরিয়ে আসে। শ্যামলালও তাই। তারপরই শুরু হয় ঝগড়া।

গাঁয়ের লোকের মধ্যে অবশ্য বিভাজন আছে। কারও কারও মতে রামলালের গলার জোর খুবই বেশি। কারও কারও মতে শ্যামলালের যুক্তির জোর বেশি। কারও মতে রামলালের রসিকতা বোধ খুব ভালো, কারও মতে টিপ্পনীতে শ্যামলালই সরেস। ঘড়ি ধরে দেড় ঘণ্টা ঝগড়া করার পর রামলাল আর শ্যামলাল স্নানাহার করতে চলে যায়। রোববার নিয়মিত ঝগড়া বন্ধ থাকে। বারো বছর ধরে এ নিয়মই চলে আসছে।

একবার রামলাল শ্যামলালকে ভয় দেখানোর জন্য বিখ্যাত পালোয়ান বটেশ্বর বলকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে এনে মাংস-পরোটা খাইয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, এই যে বটেশ্বর বল আমার বাড়িতে এসেছেন, ইনি কে তা কি আমার পাড়া-প্রতিবেশী জানে? বটেশ্বরবাবু গ্যাঁড়াপোতার বিখ্যাত পালোয়ান নিমচাঁদ হালুই, ঘোলা-গুপ্তিপাড়ার কালুচরণ সর্দার, দুর্গাচকের পঞ্চানন পাল, ভারতপুরের কালা পালোয়ান কাকে না হারিয়েছেন! লোকের ভালোর জন্যই বলছি, আমার সঙ্গে লোকে যেন একটু সমঝে চলে।

শ্যামলালের বাড়ি থেকে অবশ্য কোনও উচ্চবাচ্য শোনা গেল না। কিন্তু পরের রোববারই শ্যামলাল কুখ্যাত মস্তান জব্বর সিংকে তার বাড়িতে মাংস-লুচির নেমন্তন্ন করে নিয়ে এল। তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে

বলতে লাগল, জব্বর সিংজী, আপনি যেন ক'টা লাশ নামিয়েছেন! পাঁচজনকে একটু শুনিয়ে দিন তো। এ পাড়ার পিঁপড়েদের একটু পাখা গজিয়েছে। তাই তাদের একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।

রামলালের বাড়ি থেকেও কোনও প্রতিক্রিয়া শোনা গেল না।

গাঁয়ের খোঁড়া ভিখিরি কানাই বেসুরো গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়। কেউ বড় জোর একটা আধুলি বা এক মুঠো চাল দেয়। তা একদিন রামবাবুর বাড়িতে ভিক্ষে করতে এসেছে, রামবাবু বারান্দা থেকে আড়চোখে দেখল পাশের বাড়ির বারান্দায় শ্যামলাল দাঁড়িয়ে। রামলাল ফস করে একটা দশ টাকার নোট কানাইয়ের অ্যালুমিনিয়ামের বাটিটায় ফেলে হেঁকে বলে উঠল, ওরে কানাই, কত দিলুম বল তো!

কানাই আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলে, উরেব্বাস রে! রামবাবু, আপনি যে দশ টাকা দিয়ে ফেলেছেন! লটারি মেরেছেন নাকি বাবু?

রামলাল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, দশ টাকা দিতে কি আর লটারি মারতে হয় নাকি রে! বুকের পাটা চাই, কলজের জোর চাই। সেটা কি আর সবার থাকে? দেখ না পাড়া ঘুরে, কে কত দেয়। সবার মুরোদ তো আমার জানা আছে কিনা।

শ্যামলালের কানে সবই গেছে। কানাই গিয়ে দাঁড়াতেই শ্যামলাল বাঁকা হাসি হেসে বলল, শুনলি তো কানাই দশ টাকার কেমন গরম! এ বাজারে দশ টাকায় আধ কিলো চালও তো মেলে না রে। এক পলা সর্ষের তেলের কত দাম জানিস? অনেকেই জানে না কিনা যে দশ টাকার বাজারদর এখন দশ পয়সায় নেমে গেছে।

বলে শ্যামলাল কুড়িটা টাকা কানাইয়ের বাটিতে ফেলে হেঁকেই বলল, ওরে কানাই, কত দিলুম যেন! একটু চেঁচিয়ে বলিস, পাঁচজনে শুনুক।

কানাই বেশ গলা তুলেই বলে, আজ্ঞে আজ যে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম বাবু, চোখে ভুল দেখছি কিনা কে জানে। তবে মনে হচ্ছে একটা পেল্লায় কুড়ি টাকার নোটই দিয়ে ফেলেছেন।

আরে কুড়ি টাকাতেই বা আজকাল কি হয় বল!

পরদিন রামলাল কানাইকে চল্লিশ টাকা ভিক্ষে দিয়ে খুব হোঃ হোঃ করে হেসে বলে, জানি রে কানাই, তুই এখন ধন্য ধন্য করবি, কিন্তু আমি বলি, এ আর এমন কি!

শ্যামলাল আশি টাকা ভিক্ষে দিয়ে বলল, বুঝলি কানাই, নিজের ঢাক আমি নিজেই পেটালে কি ভালো দেখায় রে? কিন্তু আজকাল দেখছি, লোকে এক পয়সা দিয়ে এক টাকার বড়াই করে। বেশ হেঁকে সারা গাঁয়ে জানিয়ে দে তো, দান ধ্যান করে তা লোককে জানানো গর্হিত কাজ।

মাস দুই পরে কানাই ভিক্ষে করা ছেড়ে দিয়ে দিব্যি একটা মনোহারী দোকান খুলে বসল, আর দোকানও দিব্যি চলতে লাগল।

একদিন সকালে গাঁয়ের মাতব্বর বিষুবাবু আর তার স্যাঙাৎরা এসে রামলালের বাড়িতে হাজির, ওহে রামলাল, জরুরি কথা আছে যে।

যে আজ্ঞে বিষ্টুখুড়ো, বলুন।

দেখ বাপু, তোমার আর শ্যামলালের বিবাদ এক সাঙ্ঘাতিক জিনিস। লোকের মুখে মুখে তোমাদের ঝগড়ার কথা শোনা যায়। আমাদের এই অজ পাড়া গাঁর নাম এই তোমাদের সুবাদেই বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছে। নানা জায়গা থেকে তোমাদের ঝগড়া শুনতে লোকজন চলে আসে। তা বাপু, তোমাদের এই বিখ্যাত ঝগড়ার এই বারো বছর আগামী বারোই অগ্রহায়ণ পূর্ণ হবে। গাঁয়ের সবাই চাইছে, তোমাদের বিবাদের বারো বছর পূর্তি উপলক্ষে একটা উৎসব হোক।

রামলাল উজ্জীবিত হয়ে বলে, হোক। এ তো ভালো কথা।

আমরাও তাই বলি। তা বাপু গাঁ শুদ্ধু লোককে খাওয়াতে তো কিছু খরচও আছে। আর তোমরাই আমাদের ভরসা।

আজ্ঞে, সে তো বটেই।

শ্যামলালও প্রস্তাব শুনে সোজা হয়ে বসে বলল, তা তো খুবই ভালো কথা মশাই, হওয়াই উচিত।

তাহলে খরচের ব্যাপারটা?

ও নিয়ে আপনারা ভাববেন না।

উৎসবের দিন গ্রামের প্রধান সড়কে মস্ত লাল শালু টাঙানো হল। তাতে লালের ওপর সাদায় লেখা 'রামলাল ও শ্যামলালের বিখ্যাত বিবাদের দ্বাদশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে মহোৎসব।'

শুধু মনসাপোঁতা নয় আশপাশের পাঁচটা গ্রাম থেকেও ঝেঁটিয়ে লোক এল উৎসবে সামিল হতে। লোকে লোকারণ্য।

এই কাণ্ড দেখে রামলাল আর শ্যামলাল দু'জনেই ভারি খুশি। তারা যে এত বিখ্যাত হয়ে পড়েছে তা তাদেরই জানা ছিল না।

খাতরাসপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ভূতনাথ অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন, রামলাল ও শ্যামলাল ঝগড়ার যে ঐতিহ্য স্থাপন করেছে তা জাতির সামনে এক উদাহরণ। এই ঐতিহ্য ধরে রাখতে হবে। তারা ঝগড়া-বিবাদের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। ঝগড়াকে করে তুলেছে শিল্প... ইত্যাদি।

গাঁয়ের মাতব্বর বিষুবাবু বললেন, আমাদের মনসাপোঁতা গাঁ ছিল নিতান্তই অজ পাড়া গাঁ। কিন্তু রামলাল ও শ্যামলালের কল্যাণে আজ সারা দেশ এই গ্রামকে চেনে। মনসাপোঁতার এই দুই বীর সন্তানকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

সমবেত জনগণ হাততালিতে সভা গরম করে দিল।

মঞ্চের একধারে পাশাপাশি দুটি চেয়ারে রজনীগন্ধার মালা গলায় রামলাল আর শ্যামলাল বসে বসে অশ্রুবিসর্জন করছিল আনন্দে।

হঠাৎ রামলাল বহুকাল পর শ্যামলালের মুখের দিকে চেয়ে ডুকরে উঠে বলল, ভাই শ্যামলাল। কী থেকে কী হয়ে গেল বল তো ভাই!

শ্যামলালও রুমালে চোখ মুছতে মুছতে ধরা গলায় বলল, ভাই রামলাল। আমরা যে এমন কেউকেটা হয়ে গেছি তা তো জানতাম না।

মনসাপোঁতার পক্ষে দুঃখের কথা হল, এখন রামলাল আর শ্যামলালে গলায় গলায় ভাব।

ভূতনাথের বাড়ি

আচ্ছা মশাই, এদিকটাতেই কি ভূতনাথবাবুর বাড়ি?

না না, এ পাড়ায় ভূতনাথ বলে কেউ থাকে না।

কী আশ্চর্য! কিন্তু আমার কাছে যে ঠিকানাটা দেওয়া আছে তাতে স্পষ্ট লেখা অশ্বিনী মিত্র রোড, হাকিমপাড়া, তা এটা কি হাকিমপাড়া নয়?

তা হবে না কেন? এটা হাকিমপাড়া হতে বাধাটা কিসের? আটকাচ্ছে কে?

তাহলে অশ্বিনী মিত্র রোডটা?

এটা অশ্বিনী মিত্র রোডও বটে।

কিন্তু তাহলে ভূতনাথবাবুর বাড়িও তো এখানেই হওয়া উচিত।

না মশাই, কক্ষনো এখানে ভূতনাথবাবুর বাড়ি হওয়া উচিত নয়।

বলছেন! কিন্তু তা হয় কি করে? ভূতনাথবাবু নিজেই এই ঠিকানা দিলেন যে!

আর আপনিও অমনি ফস করে বিশ্বাস করে ফেললেন তো?

যে আজ্ঞে। ভূতনাথবাবুকে বিশ্বাস করা কি উচিত হয়নি মশাই?

বিশ্বাস করা না করা আপনার দায়। আমার তো নয়। তবে একথাও বলতে ইচ্ছে করে, কেউটে সাপ বা সোঁদরবনের বাঘকেও কি বিশ্বাস করা উচিত?

আজ্ঞে না। তাদের কথা আলাদা। বন্যপ্রাণী আর মানুষে তফাত আছে।

তফাতটা কি? তফাতটা কোথায়? ভূতনাথ বিশ্বাসকে যদি বিশ্বাস করা যায় তাহলে কেউটে সাপ বা সোঁদরবনের বাঘের দোষ কি বলুন!

আপনি বলতে চান ভূতনাথ বিশ্বাস সাপ বা বাঘের মতোই বিশ্বাসের অযোগ্য।

অতটা বলতে চাই না। তাছাড়া আমি তো বলেই দিয়েছি, ভূতনাথ বিশ্বাস নামে কেউ এ পাড়ায় থকে না।

তবে তিনি থাকেন কোথায়? সম্প্রতি কি বাসা বদল করেছেন?

করাই উচিত। বাসা বদলালে বহু মানুষের উপকারই হত। তবে ওসব আমি বলতে চাইছি না। তা আপনি আসছেন কোথা থেকে?

আমি আসছি নিশিগঞ্জ থানা থেকে।

অ্যাঁ! বলেন কি? থানা থেকে? আরে, তা আগে বলতে হয়। তা সার্চ ওয়ারেন্ট এনেছেন তো!

তা আর আনিনি! সার্চ ওয়ারেন্ট আছে, অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট আছে, আদালতের সমন আছে। আমার কাছে সব কিছু পাবেন।

বাঃ, বাঃ! এ তো খুব ভালো কথা মশাই! তা আসুন না, এই গরিবের বাড়িতে একটু পায়ের ধুলো দেবেন। কাছেই আমার বাড়ি। ওই যে ওই সামনের লাল বাড়িটা!

তা মন্দ কী? পথ তো আর কম নয়। দুপুরের এই রোদে এতটা পথ আসতে বড় হাঁপসে পড়েছি মশাই।

আহা, আমারই দোষ। মান্যগণ্য লোক আপনি, এভাবে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখাটা আমার ঠিক হয়নি। আসুন আসুন।

বাঃ, আপনার বাড়িটি তো বেশ।

সবাই তাই বলে বটে। তবে এ আর এমন কি বলুন। হারু ঘোষের বাড়ি আরও পেল্লায়।

তা আপনার বাড়িই বা কম কিসে? ক' বিঘে জমি নিয়ে বাগানখানা করেছেন বলুন তো!

না না, জমি কোথায়! বাড়িখানাই তো অর্ধেক জমি গিলে খেল। এখন মোটে বিঘে দশেক পড়ে আছে।

বাপ রে! দশ বিঘে জমি কি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার মতো জিনিস! তা মার্বেল বসিয়েছেন বুঝি মেঝেতে?

মার্বেলই বটে। তবে এক নম্বর সরেস জিনিসটা তো আর পেলাম না। তাই বাধ্য হয়ে ইটালিয়ান মার্বেলই বসাতে হল।

ইটালিয়ান মার্বেল। সে তো অনেক দাম মশাই। তার চেয়ে সরেস মার্বেল পাবেন কোথায়?

লোকে তাই বলে বটে। তবে এই অখাদ্দ জায়গায় ভালো জিনিসের সমঝদারই বা কোথায় বলুন। বসুন তো, এই সোফায় বসুন। আমি বরং ঠান্ডা মেশিনটা চালিয়ে দিই। আপনার তো বেশ ঘাম হচ্ছে দেখছি!

ঠান্ডা মেশিনও লাগিয়েছেন! বাঃ, আপনার নজর তো খুব উঁচু।

কী যে বলেন! ওসব আজকাল হ্যাতাপ্যাতাদের ঘরেও থাকে। তা এই গরমে কি একটু লেবুর সরবৎ খাবেন?

না না, এসব ঝামেলা করতে হবে না। অন ডিউটি আমাদের এসব খেতে টেতে নেই।

আহা ডিউটি করতে করতেই খাবেন। এক গেলাস সরবত বই তো নয়। দাঁড়ান, ভিতরে বলে আসছি। ...হ্যাঁ, তারপর বলুন তো, ভূতনাথের কেসটা কী?

খুব খারাপ কেস মশাই, খুব খারাপ কেস।

কত ধারায় মামলাটা ঠুকছেন?

ধারা-টারা উকিলের ব্যাপার, তারা বুঝবে। আমরা চার্জশিট দাখিল করব, তারপর কেস কোর্টে যাবে।

বাঃ বাঃ, এ তো খুব ভালো খবর মশাই। মা কালীকে জোড়া পাঁঠা মানত করা ছিল।

আচ্ছা, জোড়া পাঁঠা কেন মানত করেছিলেন বলুন তো!

অতি দুঃখেই মানত করতে হয়েছিল মশাই।

কিন্তু দুঃখটা কিসের?

সে আর বলবেন না। দুঃখ কি একটা? ভূতনাথের জ্বালায় এ পাড়ার সবাই অতিষ্ঠ। ধরুন কেউ হয়তো শীতলা পুজোয় একটু মাইক-টাইক লাগিয়েছে। তা পুজোটুজোয় ও তো লোকে লাগিয়েই থাকে। ভূতনাথ তার দলবল নিয়ে এসে সব চোঙা-টোঙা খুলে নিয়ে যায়। তারপর ধরুন কেউ হয়তো রাস্তার ধারে একটু তরকারির খোসা বা মাছের আঁশ ফেলেছে, অমনি ভূতনাথ এসে কী হম্বিতম্বি! তারপর অধরবাবুর খিটখিটে বুড়ো বাপটা সারাদিন খাই খাই করে পেট নামিয়ে ফেলে, তাই অধরবাবুর বউ শ্বশুরকে বলেছিল, অত খাওয়া কি ভালো? হয়তো একটু ঝাঁঝের গলাতেই বলেছিল, তাইতে ভূতনাথ এসে চড়াও হয়ে মানবাধিকার কমিশনের ভয় আর সামাজিক বয়কটের জুজু দেখিয়ে কী অত্যাচারটাই না করে গেল। ওই যে নবকুমার,

তার দোষ হয়েছিল, বাগানের পাঁচিলটা তোলার সময় মাপজোকের ভুলে রাস্তার খানিকটা সীমানায় ঢুকে যায়। ভূতনাথ সেই দেয়াল ভাঙিয়ে তবে ছাড়ল।

এ তো ভূতনাথবাবুর খুব অন্যায়!

অন্যায় নয়? আমাকেই কি কম জ্বালাতন হতে হচ্ছে মশাই? শেষ সঞ্চয়টুকু দিয়ে কোনওমতে বাড়িটা খাড়া করেছি, ভূতনাথ এসে রোজ দলিল দেখতে চায়, ভয় দেখায়। আমি নাকি সরলাবালা নামে এক বিধবার জমি চালাকি করে লিখিয়ে নিয়েছি।

লিখিয়ে নেননি তো!

তা লিখিয়ে নেব না কেন? নিয়েছি বৈকি। কিন্তু তার জন্য তিন কিস্তিতে ন্যায্য দামও সরলাবালাকে মিটিয়ে দিয়েছি। রসিদও আমার কাছে আছে। কিন্তু কলিকাল তো, ভালো মানুষদের বড়ই দুর্দিন। ভূতনাথ আমার বিরুদ্ধে লোককে খেপিয়ে তুলছে।

না, না এসব তো ভালো কথা নয়!

আপনারা পাঁচজন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এসে দেখুন কত বড় অবিচার এবং অনাচার চলছে এখানে। ওই যে, মিষ্টিটুকু মুখে দিয়ে ঠাণ্ডা ঘোলটা এক চুমুকে মেরে দিন তো, শরীর ঠাণ্ডা হবে।

ও বাবা! এত আয়োজন! না মশাই, আমার পক্ষে দশ-বারোটা মিষ্টি খাওয়া সম্ভব নয়। আমি পেটরোগা মানুষ।

আহা, আপনি তো ইয়ংম্যান। কতটা হেঁটে আসতে হয়েছে। লজ্জা করবেন না, খেয়ে নিন।

তাহলে ভূতনাথবাবুর জন্যই আপনারা শান্তিতে নেই?

না মশাই, সে বিদেয় হলে বাঁচি। তা তার বিরুদ্ধে কিসের মামলা বলুন তো! খুন-জখম-রাহাজানি, নাকি চারশো বিশ ধারা, নাকি ট্যাক্স ফাঁকি?

কেসটা আমি খুব ভালো জানি না। তবে তার নামে সরকারি চিঠি আছে।

সেই চিঠিতে কী আছে মশাই? যাবজ্জীবন হলে খুব ভালো হয়, ফাঁসি হলে তো চমৎকার, নিদেন আট-দশ বছরের কয়েদ তো বোধহয় হচ্ছেই। কী বলেন?

তাও হতে পারে। সবই সম্ভব। আচ্ছা, আপনার কি একটা দশ লাখ টাকার ব্যাঙ্ক লোন আছে?

অ্যাঁ! ব্যাঙ্ক লোন! দাঁড়ান, মনে করে দেখি! আচ্ছা আচ্ছা মনে পড়ছে, একটা লোন যেন ছিল! তা তো এতদিনে শোধ হয়ে যাওয়ার কথা! গেছেই বোধহয়। তা এ খবর কে দিল আপনাকে? ভূতনাথ নাকি?

জয়কৃষ্ণ সরখেল তাঁর বাড়িঘর আপনার কাছে মাত্র পাঁচ হাজার টাকায় বাঁধা রেখেছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর কি আপনি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার দাবিতে তাঁর নাবালক পুত্র-কন্যাকে বের করে দিয়ে জমি-বাড়ি দখল করেছেন?

এই দেখ কাণ্ড! তাই বলেছে বুঝি ভূতনাথ? একদম বিশ্বাস করবেন না মশাই, আমার বড্ড নরম মন। পাঁচ হাজার নয়, অনেক বেশিই নিয়েছিল জয়কৃষ্ণ। কাগজপত্র সব পরিষ্কার।

না, আপনি যে ভালো লোক তা যেন বুঝতে পারছি। তবে কিনা সেটা প্রমাণ করা বেশ শক্ত হবে। কলিকাল তো। এই কলিকালে ভালোমানুষদের যে কষ্ট পেতেই হয়। চলুন মশাই কষ্ট করে একটু থানায় চলুন। বড়বাবু আপনার জন্য বসে আছেন।

সে কী? আর ভূতনাথ?

তাকে তো সরকার কী খেতাব টেতাব দেবে বলে শুনছি। সেই চিঠিও আমার সঙ্গেই আছে।

তরকারির নাম

আজ্ঞা, আপনাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখছি, একেবারে পাথরের মতো স্থির হয়ে বসে আছেন, কোনও নড়াচড়া নেই, একদৃষ্টে জলের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করেননি গত চল্লিশ মিনিট। জানতে বড় কৌতূহল হচ্ছে, আপনার কি মন খুব খারাপ? বাড়িতে কারও অসুখ-বিসুখ, নাকি গিন্নির সঙ্গে ঝগড়া, নাকি ছেলে ফেল মেরেছে, নাকি কেউ মারা-টারা গেছে...?

আজ আসলে আমার খুব আনন্দেরই দিন, মনটাও বেশ ভালোই থাকার কথা।

তাহলে মুখখানা অত ভার কেন মশাই? দেখে তো মোটেই আপনাকে আনন্দ পাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে না!

আনন্দ যে হচ্ছে না তা নয়। ভিতরে ভিতরে গুড়গুড় করে আনন্দের ভুরভুরি উঠছে। আনন্দ হওয়ারই তো কথা কিনা, আজ প্রায় পাঁচ বছর পর বীরচাঁদের হদিস পেয়েছি যে।

বটে! বাঃ, এ তো বেশ ভালো খবর! তা এই বীরচাঁদ লোকটা কে বলুন তো!

বললেই কি আর চিনবেন! বীরচাঁদ একটি অতি নচ্ছার লোক।

তা নচ্ছার লোককে দেখে কি আনন্দ হওয়ার কথা? আমার তো নচ্ছার লোক দেখলে একটুও আনন্দ হয় না। আপনার হচ্ছে কি করে বলুন তো!

তা হবে না? পাঁচ বছর খোঁজাখুঁজির পর দেখা পেয়েছি যে!

ও তাই বলুন, বীরচাঁদকে আপনিই খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন? তা বীরচাঁদ কি আপনার টাকাপয়সা বা দামি কোনও জিনিস নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল? নাকি টাকা ধার নিয়ে শোধ দেয়নি। কিংবা সে কি কোনও ফেরারি আসামি যাকে ধরে দিতে পারলে আপনি পাঁচ লাখ টাকা পুরস্কার পাবেন!

আপনি বেশ চালাক মানুষ। অনেকটা আন্দাজ করেছেন বটে, কিন্তু বীরচাঁদ আমার টাকাপয়সা বা দামি জিনিস নিয়ে পালায়নি। তাকে কস্মিনকালে টাকা ধার দিয়েছি বলেও মনে পড়ছে না। যতদূর জানি ফেরারি আসামিও সে নয়।

তাহলে বীরচাঁদকে খামোকা আপনি খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছিলেনই বা কেন?

সেটা শুনলে আপনি হাসবেন। এমন কি আমাকে পাগল বলেও ভাবতে পারেন।

সেটা শোনার পর ঠিক করা যাবে, হাসব না আপনাকে পাগল বলে ভাবব।

বলতে বড় সংকোচ হচ্ছে। ব্যাপারটা এত তুচ্ছ যে বলার মতোই নয়। শুধু শুধু আপনার সময় নষ্ট করা হবে।

আরে না। আমি রিটায়ার হওয়া মানুষ, সময়ের অভাব নেই। সময় কাটাতেই তো লেকের ধারে আসা।

ব্যাপারটা হল, দু'হাজার ছাপ্পান্ন সালে জানুয়ারি মাসের তিন তারিখে সকালবেলায় আমি দাড়ি কামাচ্ছিলাম।

কত বললেন?

আগেই জানতাম আপনার বিশ্বাস হবে না।

ঠিক আছে, বলুন, দু'হাজার ছাপ্পান্ন তো? তাই সই।

হ্যাঁ, দু' হাজার ছাপ্পান্ন সালের সেই সকালে হঠাৎ আমার ফুলার ফর্টি সেকেন্ড সেকটরের অ্যাপার্টমেন্টে বীরচাঁদ এসে হাজির। বহুকাল পরে তার সঙ্গে দেখা। শুনেছিলাম সে বৃহস্পতির একটা চাঁদে ন্যাচারাল অ্যাটমসফিয়ার তৈরির কাজে বহুদিন যাবৎ ব্যস্ত রয়েছে। অনেকদিন দেখা নেই।

কী বললেন? বৃহস্পতি না কি যেন?

যে আজ্ঞে। আর এগোব কি? আমাকে পাগল বলে মনে হলে ব্যাপারটা এই পর্যন্তই থাক।

আরে না। বৃহস্পতিই বা মন্দ কি? বলে ফেলুন।

আজ্ঞে হ্যাঁ। তা মনিটরিং স্ক্রিনে তার হাসি মুখে প্রোজেকশন দেখে দরজা খুলে দিলাম। বীরচাঁদ আমার বন্ধু বটে, কিন্তু তার সঙ্গে আমার আবার একটু প্রফেশনাল রাইভ্যালরিও আছে। বয়সে আমার চেয়ে দেড় বছরের ছোট হয়েও সে চাকরি করে আমার এক ধাপ ওপরে। তাছাড়া সে দু'বার নোবেল প্রাইজ পেয়েছে, আমি মোটে একবার।

কী প্রাইজ বললেন যেন!

থাকগে মশাই, এসব শুনে আপনার কাজ নেই।

আহা, নোবেল প্রাইজ তো খারাপ জিনিস নয়। পেলে খারাপটা কি? বলে ফেলুন মশাই, বলে ফেলুন।

আজ্ঞে বলারই তো চেষ্টা করছি। বীরচাঁদ ঘরে ঢুকে চারদিক দেখে নাক সিঁটকে বলল, এঃ, এ তোকে কী অ্যাপার্টমেন্ট দিয়েছে রে? এ তো থার্ড ক্লাস অ্যাপার্টমেন্ট! তোর পারসোনাল ল্যাবরেটরি নেই? রোবট চাকর নেই? প্রোজেকশন রুম নেই? সত্যি কথা বলতে কি আমার চাঁদের অ্যাপার্টমেন্টটা যে তেমন অত্যাধুনিক নয় তা আমিও জানি। কিন্তু চাঁদে তখন এত মানুষের ভিড় যে বাসা জোগাড় করাই মুশকিল। তাই কাঁচুমাচু মুখে তার বিদ্রূপ সহ্য করতে হল।

ইয়ে, কি যেন শুনলাম। চাঁদ। না কি যেন!

ঠিকই শুনেছেন, চাঁদ, আপত্তি থাকলে—

আরে না মশাই, বৃহস্পতি হজম করলাম আর চাঁদ তো কোন ছাড়। চাঁদও কিছু খারাপ লাগছে না।

আজ্ঞে চাঁদ খারাপ নয়ও, তবে কিনা টাটকা সব্জি, দুধ, ডিম, মাংস, বাসমতি চাল এসব সেখানে হয় না। যাও বাজারে আসে তা অগ্নিমূল্য। টাটকা ফল বা মিষ্টি পাওয়াই যায় না। আমাদের দিনের পর দিন কৃত্রিম বা টিনে প্যাক করা খাবার খেতে হয়। তাতে শরীরের পুষ্টি হয় বটে, কিন্তু একঘেয়ে খাবার খেয়ে জিব অসাড় হওয়ার জোগাড়। বীরচাঁদ আবার পেটুক মানুষ। নিজেই গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে ফ্রিজ-ট্রিজ দেখে নাক সিঁটকে বলল, ইস, ছিঃ ছিঃ, এসব খেয়ে থাকিস কি করে?

বীরচাঁদ বেশ ভোজনরসিক তো!

যে আজ্ঞে। তা সব দেখেশুনে বলল, চল, আজ আমিই তোকে খাওয়াব, বাইরে আমার গাড়ি আছে, বেশিক্ষণ লাগবে না। বীরচাঁদ সাঙ্ঘাতিক জেদী ছেলে। কিছুতেই ছাড়ল না। তার গাড়ি বলতে আলোর চেয়ে বহুগুন বেশি গতিসম্পন্ন একটা স্পেসবোট। নতুন আবিষ্কার। তাইতে চেপে বৃহস্পতির সেই উপগ্রহে গিয়ে হাজির হলাম। গিয়ে দেখি, চারপাশটা যেন রূপকথার রাজ্য। যেমন মিঠে আবহাওয়া, তেমনি চোখ-জুড়োনো প্রাকৃতিক সব দৃশ্য। কোথায় লাগে সুইজারল্যান্ড বা কাশ্মীর। বীরচাঁদ আমাকে একটা রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেল।

আহা, কী সুন্দর রেস্তোরাঁ! ভিতরে ঢুকতেই সুন্দর গন্ধে জিবে জল আসছিল। বহুকাল পরে পেট পুরে খেলাম। জিব যেন প্রাণ পেল এতদিন পর।

ইয়ে, তা বৃহস্পতি উপগ্রহেই খেলেন তো!

আজ্ঞে। তারপর বীরচাঁদ আমাকে আবার পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেল। সেই থেকে অশান্তি মশাই।

কিসের অশান্তি?

বীরচাঁদ আমাকে পাঁচ-সাত রকমের জিনিস খাইয়েছিল, সব কটাই অসাধারণ, কিন্তু তার মধ্যে একটা পদ ছিল যার কোনও তুলনাই নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই পদটার নাম কিছুতেই আমার মনে পড়ছিল না। কী একটা নামের সঙ্গে যেন ইয়ান যোগ করে নামটা। তাই আমি বীরচাঁদকে ফোন করলাম। কিন্তু শোনা গেল বীরচাঁদ একটা খুব গোপন প্রোজেক্টের কাজ নিয়ে মঙ্গলগ্রহে চলে গেছে। তার সঙ্গে যোগাযোগ করা নিষেধ।

মঙ্গল! না? মঙ্গলই তো বললেন, ভুল শুনছি না তো?

আজ্ঞে না। ঠিকই শুনেছেন। আর শুনবেন কি?

মঙ্গলের জয় হোক মশাই, বলুন।

হ্যাঁ, কিন্তু আমি হাল ছাড়লাম না। ক্রমাগত বীরচাঁদের খোঁজ-খবর নিতে লাগলাম। ওই বিশেষ খাবারটির নাম আর রেসিপি আমার চাই-ই চাই। কিন্তু যা খবর পেলাম তা খুবই হতাশাজনক। বীরচাঁদ নাকি টাইম ট্রাভেল প্রোজেক্টের কাজ নিয়ে শুক্রগ্রহে চলে গেছে।

ওরে বাবা! শুক্রও ছাড় পায়নি তাহলে!

না। তারপর বীরচাঁদ আমাদের দু'হাজার ছাপ্পান্ন থেকেই উধাও হয়ে গেল। কখনও তিন হাজার সতেরো, কখনও পাঁচ হাজার বাইশ, কখনও সতেরোশো বারো নানা টাইম জোনে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তিন হাজার সতেরো থেকে সতেরোশো—ঠিক শুনেছি?

ঠিকই শুনেছেন। তবে এবার পাকা খবর পেয়ে আমিও এই দু'হাজার ছয়ে পৃথিবীতে এসে ঘাপটি মেরে বসেছি। শুনেছি, বীরচাঁদ এখন এখানেই আছে। তার দেখা পেলে তরকারির নামটা জেনেই ফের দু' হাজার ছাপ্পান্নোয় ফিরে যাব।

আচ্ছা মশাই, আচ্ছা, আমি বরং আজ উঠি, মাথাটা বড্ড ঘুরছে।

গোপীনাথ ও চতুর চোর

শহরে পরপর কতগুলো রহস্যময় চুরি হয়ে যাওয়ায় গোপীবাবু খুবই চিন্তিত। চিন্তিত হওয়ার যথেষ্ট কারণও আছে। তিনিই হলেন এই গোপালপুর গঞ্জের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। প্রচণ্ড প্রতাপশালী দারোগা গোপীনাথ মজুমদারের খুবই সুনাম। তার দাপটে গোপালপুরে চুরি-ডাকাতি একরকম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। চারদিকে বেশ শান্তিই বিরাজ করছিল। কিন্তু কোত্থেকে একটা অতি ধুরন্ধর চোরের আগমন হওয়াতে গোপীনাথের সুনাম এখন গুডবাই জানিয়ে বিদায় নেওয়ার উপক্রম করেছে। একটা বিহিত না করলেই নয়। গত একমাসে বারোটা চুরি। ভাবা যায়? নন্দকিশোরবাবুর বাড়ি থেকে চোর এমন চেঁছেপুঁচে সব কিছু নিয়ে গেছে যে পরদিন নন্দকিশোরবাবুর গামছা ছাড়া পরার কিছু ছিল না। বাসব বাগের গিন্নির গয়নাগুলো লোপাট হওয়ার পর থেকে তাঁর একটু মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে। জানলায় দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কেবলই বলছেন, যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী। হাড়কেপ্পন হরেনবাবুর সব হারানোর শোকে নাকি তাঁর পাড়ার নেড়ি কুকুরগুলো অবধি দিনরাত ভৌ ভৌ করে হরেনবাবুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে কান্নাকাটি করছে। মহেশবাবু সেই যে সকালে উঠে মাথায় হাত দিয়ে দাওয়ায় বসে পড়েছিলেন, সেই থেকে আজও অমনিভাবেই বসে আছেন, মাথা থেকে হাতটা অবধি নামাননি। সারা গঞ্জে একটা ট্র্যাজিক অবস্থা।

গোপীনাথ সারা গঞ্জে চর মোতায়েন করেছেন। তাদেরই একজন খবর এনেছে আজ হাটবারে সেই রহস্যময় চোর কেনাকাটা করতে আসবে। তবে চতুর লোক ছাড়া তাকে চেনা এবং ধরা কঠিন।

গোপীবাবু তাই আজ সকালেই ছদ্মবেশে হাটের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। মুখে দাড়ি-গোঁফ, মাথায় পাগড়ি, গায়ে জোব্বা, গলায় ডুমো ডুমো পুঁথির মালা। চেনার কোনও উপায় নেই। বাড়ির পিছনের আমবাগানের রাস্তা ধরে গা-ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে তিনি সদর রাস্তায় উঠে হাটের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

কিন্তু কয়েক কদম এগোতে না এগোতেই একটা টেকো, গুঁফো বেঁটেমতো লোক ভারি গ্যালগ্যালে হেসে হাতজোড় করে মিঠে গলায় বলল, গোপীবাবু যে!

গোপীবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, আমি গোপীবাবু নই।

যে আজ্ঞে। তা আপনি হলেন গিয়ে গঞ্জের অভিভাবক, যা বলবেন তা মেনে নিতে হবে বৈকি। তবে হ্যাঁ, বলতেই হবে সাজটা বড় ভালো হয়েছে। গোপীবাবু বলে চেনার জো রাখেননি...

গোপীবাবু বিরক্ত হয়ে এগোতে লাগলেন। ছদ্মবেশে কোনও গণ্ডগোল হল নাকি? কিন্তু হওয়ার তো কথা নয়! বারদশেক আয়নায় নিজেকে ভালো করে নিরখ-পরখ করেছেন। তাঁর গিন্নি পর্যন্ত বলেছেন, তোমাকে

হাড়ে হাড়ে চিনি বটে, কিন্তু আজ ভোল একদম পালটে গেছে। তবু একটা লোক যে চিনতে পারল এটা চিন্তার কথা।

কদমতলার কাছে একটা সুরুঙ্গে চেহারার লোক গাছতলায় বসেছিল। হঠাৎ গোপীবাবুকে দেখে টপ করে উঠে এসে কানের কাছে মুখ এনে বলল, স্যার, কোমরের কাছে আপনার পিস্তলের বাঁটটা উঁচু হয়ে আছে।

বাজে কথা, আমার সঙ্গে পিস্তল নেই।

লোকটা অবাক হয়ে বলে, নেই? কী আশ্চর্য!

গোপীবাবু মৃদু হেসে বললেন, ওরে বাপু, ফকির দরবেশদের কাছে কি পিস্তল থাকে।

লোকটা মাথা চুলকোতে চুলকোতে নিজের জায়গায় ফিরে গেল বটে, কিন্তু যাওয়ার আগে চাপা গলায় বলে গেল, কিন্তু সঙ্গে রাখলে ভালো করতেন স্যার, বিপজ্জনক কাজে যাচ্ছেন!

গোপীবাবু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। ছদ্মবেশটা কি কেউ কেউ ধরে ফেলছে? কিন্তু ধরবে কি করে?

তিনি পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একটা মিষ্টি মশলার পান সাজতে বলে আয়নাটায় নিজেকে ভালো করে দেখলেন। না, কোনও খুঁত নেই। তিনি নিজেকে নিজেই চিনতে পারছেন না।

ঠিক এই সময়ে আয়নায় ঠিক তাঁর পিছনে একটা মুখ উঁকি দিল। ন্যাড়া মাথা, নাদুসনুদুস চেহারার একজন মানুষ। সেও আয়নায় গোপীবাবুকে বেশ ভালো করে দেখে নিয়ে বলল, না না, চেনা যাচ্ছে না। আপনার কোনও চিন্তা নেই গোপীবাবু।

গোপীবাবু ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটার দিকে কড়া চোখে চেয়ে বললেন, আমি গোপীনাথবাবু-টাবু নই হে! কেটে পড়ো।

আহা, আমি কি বলেছি যে, আমি আপনাকে চিনেছি? কালীর দিব্যি কেটে বলছি মশাই, আমি আপনাকে আজ অবধি চিনতে পারলাম না।

পানের পয়সা দিয়ে গোপীবাবু ফের হাঁটতে লাগলেন, পানের খিলিটা মুখে পুরতেও খেয়াল হল না তাঁর। এসব হচ্ছে কী? একটার পর একটা লোক তাকে চিনে ফেলছে কি করে? তাজ্জব কাণ্ড!

রোগাভোগা বুড়োমতো একজন মানুষ হঠাৎ তাঁর পথ আটকে দাঁড়িয়ে বলল, চাকরিটি গেল তাহলে?

গোপীবাবু মুখে নির্বিকার ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করতে করতে উদাস গলায় বললেন, আল্লার চাকরি করি বাবা, সে চাকরি যাওয়ার নয়।

বুড়োটা খিটখিটে গলায় বলল, হুঃ, যত্তো সব অলক্ষুণে কথা। বলি লেগে থাকতে পারলে যে দু'হাতে লুটেপুটে খেতে পারতে! অমন সোনার চাকরিটা খোয়ালে বাপু, কাজটা কি ভালো হল? এখন তো দেখছি ছেলেপুলে নিয়ে তোমার পথে বসার কথা, ফকির সেজে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছ? দারোগাগিরিতে লেগে থাকতে পারলে যে আখের গুছিয়ে নেওয়া যেত হে!

গোপীনাথ অত্যন্ত রেগে যাচ্ছিলেন। তবু গলা যথাসম্ভব মোলায়েম করে বললেন, ওসব শোনাও আমার পাপ। গুনাহ হয়। ফকির দরবেশ কখনও চাকরি করে বলে শুনেছেন?

বুড়োটা মাথা নেড়ে বলল, নাঃ, চাকরির সঙ্গে মাথাটাও গেছে দেখছি! এ-রকম যে একটা কিছু হবে তা আগেই আঁচ করেছিলুম। বলি বাপু, চোর-ডাকাতদের পিছনে তোমার অত লাগবার দরকারটাই বা কী শুনি! ওই করতে গিয়েই বেশ বাড়াবাড়ি করে ফেললে, তখনই জানতুম বেশি কাজ দেখাতে গিয়ে ওপরওলাদের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াবে। নাঃ, তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি যে কবে পাকবে কে জানে।

বুড়োটা বিদেয় হল। কিন্তু গোপীবাবু ফাঁপরে পড়ে খুব ভাবতে লাগলেন। এ তো ভালো কথা নয়। ছদ্মবেশ ধরায় তাঁর বেশ নাম-ডাক আছে। বটতলায় দু'জন সেপাইয়ের সঙ্গে মুখোমুখি দেখাও হল এবং তারা তাঁকে চিনতে পারল না। তাহলে এরা চিনছে কি করে?

নদীর ধারে বিশাল হাটখোলায় গিজগিজ করছে ভিড়। চিন্তিত গোপীবাবু হাটে ঢুকে ইতিউতি চাইতে লাগলেন। এত বড় হাটে চোরটাকে খুঁজে বের করা চাট্টিখানি কথা নয়। খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার শামিল।

তবে তাঁর পাকা দারোগার চোখ, বহু চোর-ডাকাত দেখে অভিজ্ঞতা হয়েছে প্রচুর। তার চর বলেছিল, চোরটার চেহারা এমনই বৈশিষ্ট্যহীন যে চট করে আর পাঁচজনের সঙ্গে আলাদা করা যায় না। তবে তার নাকের ডগায় বেশ বড়সড় একটা আঁচিল আছে। কালচে আঁচিল, দূর থেকেও দেখা যায়।

ধীরে-সুস্থে চারদিকে নজর রেখে হাঁটছিলেন গোপীবাবু। তাঁর অনুসন্ধানী চোখ চারদিকে মানুষের ভিড়ে আঁতিপাঁতি করে ভয়ঙ্কর চোরটাকে খুঁজছে। হাটে বহু চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিন্তু কেউই তাঁকে চিনতে পারছে না দেখে কতকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলেন তিনি। যাহোক, হাটে তিনি এখনও ধরা পড়েননি।

কানের কাছে মুখ এনে কে যেন ফিসফিস করে বলল, সামনে যে তেলেভাজার লাইন আছে ওইটে ধরে ডানদিকে ঠেলে এগিয়ে যান।

গোপীবাবু বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখেন উলোঝুলো পোশাক পরা একটা ফোকলা পাগল।

তুমি কে হে?

আজ্ঞে, আপনার ভালোর জন্যই বললাম। পছন্দ না হলে শুনবেন না।

তেলেভাজার লাইনে কী আছে?

যা খুঁজছেন পেয়ে যাবেন।

গোপীবাবুর গলায় দারোগার ধমক এসে যাচ্ছিল। সামলে নিয়ে মৃদু হেসে বললেন, ওরে বাপু, ফকির-দরবেশরা আর কাকে খোঁজে? আল্লাহতালাকেই খোঁজে।

ও বাবাঃ! সে তো অনেক দূরের পাল্লা। আমি তাহলে আসি।

বলে লোকটা হাওয়া হয়ে গেল। গোপীবাবু একটু চিন্তা করে দেখলেন, লোকটার কথামতোই ডানদিকে যাওয়া ভালো।

তেলেভাজার লাইন মানে দু'ধারেই সারি দিয়ে তেলেভাজার দোকান। ফুলুরি, বেগুনী, চপ, পেঁয়াজি ভাজা হচ্ছে আর খদ্দেররা ভিড় করে দাঁড়িয়ে টপাটপ সাঁটাচ্ছে। লোভনীয় গন্ধে চারদিকটা একেবারে ম' ম' করছে। গোপীনাথের জিবও রসসিক্ত হয়ে উঠল। তবে কর্তব্য আগে, তারপর তেলেভাজা, তিনি লোভ সংবরণ করে দৃঢ় পায়ে এগোতে লাগলেন। লাইনের শেষ মাথায় একটা লোক গরম তেলে ডালের ঝালবড়া ভাজছিল। বেশ আহ্লাদী মোটাসোটা চেহারা, তার সামনে খদ্দেরের গাড়ি লেগে আছে। গোপীনাথ থমকে দাঁড়ালেন। লোকটার নাকের ডগায় কালো আঁচিলটা একেবারে জ্বলজ্বল।

লোকটা হঠাৎ চোখ তুলে গোপীনাথের দিকে চেয়ে ভারি খুশিয়াল গলায় বলে উঠল, এবার ঠিক জায়গায় এসে পড়েছেন স্যার। নাকের ডগায় কালো আঁচিল খুঁজছেন তো! মেলাই পাবেন। আঁচিলের অভাব কি?

গোপীনাথ অবাক হয়ে চারদিকে চেয়ে দেখলেন, ঝালবড়ার খদ্দেরদের প্রত্যেকের নাকের ডগায় জ্বলজ্বল করছে কালো আঁচিল। যারা আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে তাদেরও নাকের ডগায় একইরকম কালো আঁচিল। আঁচিলওলা এত নাক গোপীনাথ আর কখনও দেখেননি। এখানে যেন আঁচিলের হাট বসে গেছে।

গোপীনাথের মাথা ঘুরছিল। এদের মধ্যে কোনটা আসল চোর, কাকে ধরবেন তা বুঝতে পারছিলেন না। একটা ফচকে আঁচিলওলা লোক ঝালবড়া খেতে খেতে বিজ্ঞের মতো বলল, আহা, যে কাউকে ধরলেই তো হয়। আমরা তো আপনাকে সাহায্য করতেই আছি।

গোপীবাবু হতাশ হয়ে ফিরে এলেন।

শোনা যাচ্ছে গোপী দারোগা বদলির জন্য দরখাস্ত করেছেন।

বলাইবাবু

বাঃ আপনার কুকুরটি কিন্তু ভারি সুন্দর বলাইবাবু।

কুকুরঃ কোথায় কুকুর!

ওই তো, আপনার পিছনে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে।

অ! না মশাই, ওটা আমার কুকুর নয়।

নয়! ইস দেখুন তো, আপনার কুকুর মনে করে গতকালও যে ওকে আমি লেড়ো বিস্কুট কিনে খাইয়েছি! বিস্কুটের আজকাল যা দাম হয়েছে, কহতব্য নয়। পয়সাটা কি তবে জলে গেল।

কিন্তু মশাই, আমার কুকুর মনে করে ওকে লেড়ো বিস্কুট খাওয়াতে গেলেন কেন? আমার কুকুরকে লেড়ো বিস্কুট খাওয়ানোয় আপনার লাভ কি?

আছে, ও আপনি বুঝবেন না। সামান্য একটা লেড়ো বিস্কুটই তো! তবে ও কিন্তু গতকালও আপনার পিছু পিছু বাজার অবধি গিয়েছিল। পরশুদিনও। এমনকী তার আগের দিনও।

অবাক কাণ্ড! কুকুরটা রোজ আমার পিছু নেয়, আমি তো তা জানতাম না।

আমার যতদূর মনে হয়, কুকুরটা লোক চেনে। আপনি যে একজন মহান লোক তা কুকুরটা বুঝতে পেরেছে।

আমি মহান লোক! তা মশাই, মহান কথাটার মানে কি দাঁড়াচ্ছে তা বুঝিয়ে বলতে পারেন? জীবনে কখনও কেউ আমাকে মহান বলেনি। শুনে বড় অবাক লাগছে।

কী যে বলেন বলাইবাবু। মহান কথাটার জন্মই তো হল আপনার জন্য। ও কথাটা আর কারও গায়ে তেমন ফিট করে না, কিন্তু আপনার গায়ে একদম মাপে মাপে বসে যায়।

বটে!

তা নয়! সবাই জানে আপনার মানুষের জন্য প্রাণ কাঁদে, আপনি দু'হাতে গরিব দুঃখীকে বিলিয়ে দেন, আপনি মানুষের বিপদ দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়েন, নিতান্ত সামান্য মানুষকেও সম্মান দিয়ে কথা বলেন, জীবজন্তুর প্রতি আপনার প্রেম তো সর্বজনবিদিত।

চিন্তায় ফেলে দিলেন মশাই। আমি মানুষকে নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাই না। বাড়িতে ভিক্ষুক এলে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, কারণ অধিকাংশ ভিক্ষুকই প্রফেশনাল নিষ্কর্মা। মানুষের নিজের দোষে বিপদে পড়ে বলে আমি কারো বিপদ আপদে বোকার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ি না আর অধিকাংশ মানুষই সম্মান পাওয়ার যোগ্য নয় বলে তাদের আমি পোকামাকড়ের বেশি মনে করি না। আরও একটা কথা, কুকুর বেড়াল ইত্যাদি নানা রোগজীবাণু বহন করে বলে আমি তাদের সযত্নে এড়িয়ে চলি।

আহা বলাইবাবু, এসবও তো বিবেচকের মতোই কাজ। আর তাতে আপনার মহান হতে আটকাচ্ছে কিসে?

তাতেও আটকাচ্ছে না! তাজ্জব করলেন মশাই!

আজ্ঞে, দু'চারটে গুণ বাদ গেলেও ক্ষতি নেই। গান্ধীজী কি ফুটবল খেলতে পারতেন?

বোধহয় না। কিন্তু হঠাৎ একথা কেন?

আচ্ছা, বিদ্যাসাগরমশাই কি গান জানতেন?

জানি না তো!

রবিঠাকুর কি ক্যালকুলাস জানতেন?

না জানাই সম্ভব।

তা বলে কি তাঁরা মহান নন?

তা বটে। তাহলে আপনি আমাকে মহান বানিয়েই ছাড়বেন!

আজ্ঞে না। আমি বলতে চাইছিলাম যে, আপনি মহান হয়েই জন্মেছেন। তা আপনি যতই নিজেকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করুন। আর এটাও আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে যে, নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করা মহানদেরই লক্ষণ।

আমি মশাই, নিজেকে মোটেই তুচ্ছ জ্ঞান করি না। আমি বিলক্ষণ জানি যে, আমি একটি বড় কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, সেজন্য আমার যথেষ্ট অহঙ্কারও আছে।

বলাইবাবু, ওই অহঙ্কারও আপনাকেই মানায়।

আচ্ছা মশাই, আপনি তো গায়ে পড়ে অনেক কথা বলছেন। কিন্তু আপনাকে তো আমি চিনি না! আপনি কে বলুন তো!

কী যে বলেন, আমাকে চিনতে যাবেন কোন দুঃখে?

উঁচু সার্কেলের লোকেদের কাছে দেওয়ার মতো পরিচয় তো নয়।

সে তো আপনার হাড়হাভাতে চেহারা আর পোশাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তবু নাম-ধাম জেনে রাখা ভালো।

নাম হল ধর্মদাস ঘোষ।

কি করা হয়-টয়?

ওই সামান্য একটু ডাক্তারি করে থাকি। হোমিওপ্যাথি।

তা মন্দ কি? হোমিওপ্যাথদের তো আজকাল বেশ পসার শুনেছি।

তা আজ্ঞে কিছু কিছু মানুষ ভাগ্য নিয়ে জন্মায়। তারা যাতে হাত দেয় তাতেই সোনা ফলে। তবে কিনা হোমিওপ্যাথিতে আমি তেমন সুবিধে করে উঠতে পারিনি।

তাই ওর সঙ্গে একটু জ্যোতিষচর্চাও করে থাকি।

ওরে বাবা, আপনি জ্যোতিষীও?

ওই যে বললাম, কপাল ভালো থাকলে সবকিছুতেই হাত যশ হয়। কিন্তু আমার জ্যোতিষ-বিদ্যারও তেমন কদর হয়নি।

এবার বলুন তো ধর্মদাসবাবু, আজ গায়ে পড়ে এই খেজুড় করার উদ্দেশ্যটা কি?

আজ্ঞে, গত কয়েকদিন ধরেই আপনাকে আমি ফলো করছি।

ফলো করছেন! আশ্চর্য ব্যাপার! ফলো করছেন কেন?

আজ্ঞে পদাঙ্ক অনুসরণও বলতে পারেন। ভাবলাম কৃতবিদ্য লোক আপনি, বিশাল ডিগ্রি, বিশাল চাকরি, বিশাল নাম-ডাক, তা আপনার হাওয়া-বাতাস গায়ে লাগলেও উপকার আছে। তাই রোজই, আপনি যখন আর পাঁচজনের মতো বাজার করতে বেরোন তখন আমি আপনার পিছু নিই।

কারও পিছু নেওয়া যে অভদ্রতা সেটা নিশ্চয়ই জানেন।

যে আজ্ঞে।

এরজন্য আপনাকে আমি পুলিশে দিতে পারি, তা জানেন?

পারেন বৈকি। মান্যগণ্য লোক আপনি, পুলিশকে ডাকলে তারা ধেয়ে আসবে। উটকো লোক আমি, কি উদ্দেশে ফলো করছি এটাও তো ভাববার কথা।

যাকগে, আমি পুলিশ ডাকছি না। আপনিও আর ফলো করবেন না।

আজ্ঞে। তবে কিনা ওই কুকুরটাও কিন্তু রোজই আপনাকে ফলো করে।

কুকুরটা কেন ফলো করে তা আমি জানি না, তবে তার উদ্দেশ্য ততটা সন্দেহজনক নাও হতে পারে।

যে আজ্ঞে। আপনি বিবেচক মানুষ।

আপনার কি আর কিছু বলার আছে?

তেমন কিছু নয়। না বললেও চলে। আপনার হাতে হয়তো এত সময়ও নেই। ব্যস্ত মানুষ আপনি, বাজার করে এসে চাট্টি খেয়েই হয়তো অফিসে রওনা হবেন। আজ অবশ্য শনিবার, আপনার ছুটি। তাহলেও হয়তো বিকেলের ফ্লাইটে সিঙ্গাপুর বা লন্ডন যাওয়ার আছে, কিংবা নিদেন দিল্লি-টিল্লি।

সিঙ্গাপুর। খবর টবর রাখেন দেখছি।

কী যে বলেন! হোমরাচোমরা মানুষরা যা করেন তাই খবর। এমনকী হেমন্ত আগরওয়ালের সঙ্গে পার্টিতে একটু আবডাল হয়ে কথা বললেও খবর, কিংবা দুবাইয়ের নটবরলালের সঙ্গে চোখাচোখি হলেও খবর।

অ্যাঁ! কী কী বললেন?

আজ্ঞে, ও কিছু নয়। বড্ড বেশি কথা কয়ে ফেলি বলে আমার গিন্নিও আমাকে প্রায়ই বকাঝকা করেন। আমাদের কথার দামই বা কি বলুন।

দাঁড়ান, দাঁড়ান, বেশি কথা বলেন বটে, কিন্তু হেমন্ত আগরওলার বা নটবরলালের নাম তো আপনার জানার কথা নয়!

বলেন কি বলাইবাবু! এ নামে কি সত্যিকারের কেউ আছে নাকি? আমি তো জিবের ডগায় যা এল বলে ফেললাম।

না মশাই না! ব্যাপারটা এখন আমার কাছে অতটা সোজা মনে হচ্ছে না! ধর্মদাসবাবু, একটু ঝেড়ে কাশুন তো।

এই দেখ ফ্যাসাদ। কী বলতে কী বলে ফেলেছি, আপনি হয়তো আমার ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। বড় মানুষরা রেগে গেলে যে আমাদের মতো চুনোপুঁটিদের ঘোর বিপদ!

ধর্মদাসবাবু ব্যাপারটা একটু সিরিয়াস কিন্তু।

না না বলাইবাবু, আমি আসলে আপনার ভালোর জন্যই বলতে এসেছিলাম যে, আপনি একজন গণ্যমান্য লোক, আপনার কোনও অসোয়াস্তির কারণ ঘটুক এটা আমি চাই না।

অসোয়াস্তিটা কিসের?

এই যে ওই কুকুরটা আর আমি আপনাকে রোজ ফলো করি, কিন্তু আপনি তা টের পান না এটা যেমন অসোয়াস্তি তেমনি এই আমাদের মতো আরো জনা দুই আপনার পিছু নেয় রোজ। একজন ওই যে পানের দোকানে দাঁড়িয়ে পান খাচ্ছে, মোটা মতো, ধুতি আর শার্ট পরা। আর একজন ওই যে, দেয়ালে পোস্টার পড়ছে, লম্বা রোগামতো!

আশ্চর্য! ওরা আমাকে রোজ ফলো করে, কি জানেন?

আজ্ঞে। তবে হয়তো ওরা চাকরির উমেদার, কিংবা টেন্ডার দিতে চায়, কিংবা হয়তো কোনও ধান্দা আছে। কিংবা এও হতে পারে ওদের কোনও উদ্দেশ্যই নেই।

না মশাই, ভাবিয়ে তুললেন।

আপনাদের তো এমনিতেই ভাবনা-চিন্তার অবধি নেই। সর্বদাই নানারকম সমস্যার মোকাবিলা করছেন। বড় কোম্পানি হলে যা হয় আর কি। তাই আমি ভাবলাম, বলাইবাবুর মতো একজন মহান মানুষকে সবদিক দিয়ে রক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য। বিশেষ করে এখন হয়তো আপনি ত্রিশ-বত্রিশ কোটি টাকার একটা ডিল নিয়ে ভারি ভাবনায় আছেন, হয়তো বড় বড় নানা ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন, হয়তো দু'তিনটে শত্রু কোম্পানি আপনাকে নানাভাবে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। সবসময়ে যাকে এতসব সমস্যা নিয়ে ভাবতে হয় তার কি এসব ছোটখাটো ব্যাপারে নজর থাকে!

দাঁড়ান মশাই দাঁড়ান। ত্রিশ-বত্রিশ কোটি টাকার ডিলের কথা আপনি জানলেন কি করে, এবং আর যা যা বললেন সেগুলোও তো খুব একটা আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া নয়। ধর্মদাসবাবু, আপনি আসলে কে বলুন তো?

আজ্ঞে আমি একজন হোমিওপ্যাথ এবং জ্যোতিষী, বলিনি আপনাকে?

বলেছেন কিন্তু সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

আমাকে বিশ্বাস করা উচিতও নয়। আমি প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনেও মিথ্যে কথা বলে থাকি। তবে কিনা মিথ্যে কথার ফাঁকে ফাঁকে দু-চারটে সত্যি কথাও ঢুকে যায়। চালে কাঁকড়ের মতোই আর কি? যেগুলো বেছে বের করা মুশকিল।

আপনি কি চান স্পষ্ট করে বলবেন?

ওরে বাপ রে! আপনার কাছে চাইবার মতো মুখ বা যোগ্যতা কোনওটাই কি আমার আছে? জানি, আপনি এক মহান মানুষ। চাইলেই দিয়ে ফেলবেন। কিন্তু দেখুন চাওয়ার জন্যও বুকের পাটা লাগে। আমাদের মতো নগণ্য মানুষের তো ওটারই অভাব কিনা।

নগণ্য কিনা জানি না, তবে আপনি অতি বিপজ্জনক লোক।

কী যে বলেন বলাইবাবু। বিপজ্জনক হতে গেলেও কিছু এলেম চাই। আমাকে তো বাড়ির বেড়ালটাও গ্রাহ্য করে না। সংসারে আমার কোনও সম্মান নেই। ছেলেপুলেদের শাসন করার মতো ব্যক্তিত্ব নেই। আর সেইজন্যই দেখুন না, ছেলেটাকে কত করে বললুম, ওরে, চাকরি বাকরির যা বাজার, একটা লাইন ধর। তা সে বাপের কথা গ্রাহ্যই করল না।

ছেলে বেকার বুঝি!

বেকার বলে বেকার! বসে বসে বাপের অন্ন ধ্বংস করছে।

কী পাস করেছে বলুন তো?

সে আর বলবেন না। টেনে মেনে ইংরিজিতে এম এ-টা করেছে। আর একটু কম্পিউটার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে আর কি!

ঠিক আছে, কাল সকাল দশটায় সে যেন আমার অফিসে গিয়ে দেখা করে।

না, না, সেটা কি উচিত কাজ হবে? আপনি ব্যস্ত মানুষ।

আপনি কি জানেন যে, আপনি অতি ঘোড়েল লোক!

কেউ কেউ বলে বটে কথাটা। ভাবি বড় বড় ঘোড়েলদের তুলনায় আমি তো নস্যি। চারদিকে চেয়ে দেখুন না, ঘোড়েলদের কী রমরমা, ঘোড়েলরাই দেশ চালাচ্ছে, তারাই ব্যবসা-বাণিজ্য সামলাচ্ছে, তারাই পাঁচজনের ওপর দড়ি ঘোরাচ্ছে। উঁচু জাতের ঘোড়েল হলেও না হয় কথা ছিল।

বুঝেছি, আর আত্মগ্লানিতে ভুগবেন না ধর্মদাসবাবু। আপনার ছেলের চাকরিটা হয়ে যাবে।

আপনি মহান মানুষ বলাইবাবু।

যে আজ্ঞে ধর্মদাসবাবু।

খেলা

বুক চিতিয়ে, লাঠি বাগিয়ে দৃপ্ত পায়ে তিনি কুমোরপাড়া পেরোলেন, অতি দ্রুত ডিঙিয়ে গেলেন ন্যাড়ার মোড়, তারপর রথতলা পেছনে ফেলে ডান দিকে মোড় নিয়ে হাটখোলা ছাড়িয়ে গেলেন এক লহমায়। কাঁসাই দীঘির পুব ধারের রাস্তা ধরে নির্ভীক পায়ে গটমট করে গিয়ে তিনি দুর্গাবাড়ি ছাড়িয়ে ঘোষপাড়ায় ঢুকে পড়লেন। উপেনবাবুর বুকে এখন দামামা বাজছে। একটু বাদেই তিনি অকম্পিত হৃদয়ে তাঁর দুর্মর প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হবেন। আজ একটা মরণ-বাঁচন লড়াই। এ লড়াই জিততে হবে।

একটা লালরঙা তিনতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি এবার একটা রণহুঙ্কার ছাড়লেন, বাবলু!

দোতলার বারান্দা থেকে একটা ফর্সা রোগা-পাতলা বাচ্চা ছেলে হাসি মুখখানা বাড়িয়ে বলল, ওঃ, কাকু এসে গেছেন! দাঁড়ান, আসছি।

একতলার বারান্দায় টেবিল পাতা, দু'ধারে চেয়ার। একটা চেয়ারে বসে উপেনবাবু রুমালে ঘেমো মুখটা মুছে নিলেন। তারপর ভেতরকার উত্তেজনা প্রশমনের জন্য টেবিলে আঙুল দিয়ে একটা তবলার বোল তুলবার চেষ্টা করলেন। কাজের লোক এসে চা-বিস্কুট দিয়ে গেল। গাম্ভীর্য বজায় রেখে উনি তা খেয়েও ফেললেন, রোজ যেমন খান। তারপর অশান্ত মনকে শান্ত করার জন্য গুনগুন করে একটা শ্যামাসঙ্গীত ভাঁজতে লাগলেন।

এমন সময়ে বগলে স্লেট আর হাতে পেন্সিল নিয়ে বাবলু ওপর থেকে নেমে এল। বলল, তাহলে হয়ে যাক, কাকু।

উপেনবাবুও হাঁক দিয়ে বললেন, হয়ে যাক।

বাবলু চটপট স্লেটের ওপর একটা কাটাকুটি খেলার ছক এঁকে ফেলল আর বাঁ-কোণে একটা ক্রস বসিয়ে দিল। স্ট্র্যাটেজি আজ ঠিক করেই এসেছেন উপেনবাবু। তিনি বাবলুর বিপরীত কোণে গোল্লা বসিয়ে দিয়ে আপনমনে বলে উঠলেন, হুঁ হুঁ বাবা! বাবলু ফস করে আর একটা কোণে ক্রস বসিয়ে দিল। আর একটা মোক্ষম কোণে গোল্লা বসানোর পরই হাত কামড়াতে ইচ্ছে করল উপেনবাবুর। ইস! মস্ত ভুল হয়ে গেছে। বাবলু ফস করে ধারের ঘরে মাঝখানে ক্রস বসিয়েই লাইন টেনে দিল।

দপ করে খানিকটা নিবে গেলেন উপেনবাবু। নাঃ, আরও একটু কনসেন্ট্রেট করতে হবে। চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। রিফ্লেক্স ধারালো করে তুলতে হবে।

এবার তিনি ক্রস মারলেন, বাবলু গোল্লা। তিনি ক্রস। বাবলু গোল্লা। তিনি ক্রস। বাবলু গোল্লা। কিন্তু কী আশ্চর্য, কোন আশ্চর্য যাদুবলে তিনটে গোল্লা সরল রেখায় বসে তাঁকে মুখ ভ্যাঙাতে লাগল।

কাকু, আবার হয়ে যাক!

হয়ে যাক!

কিন্তু হতে হতেও হল না। বাবলুর তিনটে ক্রস তাঁকে বক দেখাতে লাগল।

আবার হয়ে যাক কাকু।

হয়ে যাক!

পর পর পাঁচ দান হেরে বজ্রাহতের মতো বসে রইলেন উপেনবাবু।

আমার স্কুলের সময় হয়ে এসেছে কাকু, তাহলে আমি এবার যাই?

গম্ভীর গলায় পরাজিত উপেনবাবু বললেন, এসো গিয়ে।

উপেনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়েন। নাঃ, আজও হল না। হেস্তনেস্ত হল না, এসপার-ওসপার হল না। ভিতরে এতক্ষণ যে টগবগানিটা ছিল তা উধাও। হাতে-পায়ে সেই জোরটাও আর নেই।

বটতলার পাশ দিয়ে আনমনা হয়ে যখন হেঁটে যাচ্ছেন তখন উলোঝুলো জোব্বা পরা ফকির গোছের লোকটা আজও হাঁক মারল, কী হল? আজও পারলে না তো!

ফকিরের পাশে বসে থাকা কেলে দিশি কুকুরটা অবধি ঘুম-চোখে তাকিয়ে বলল, ভাগ! ভাগ!

উদ্দীপনাহীন উপেনবাবু এখন যেভাবে হাঁটছেন তাকে বলে ল্যাং ল্যাং করে হাঁটা। এই হাঁটার মধ্যে কোনও ইচ্ছাশক্তি থাকে না, কোনও লক্ষে পৌঁছোনোর থাকে না, কোনও উদ্দেশ্যও থাকে না। এমনকী কেন হাঁটছি তাও বুঝতে পারা যায় না।

হাঁটতে হাঁটতে উপেনবাবু ময়নার মাঠ অবধি চলে এলেন। বেশ জায়গা। উদোম, মস্ত মাঠের দু'ধারে দুটো গোলপোস্ট, চারধারে মেলা গাছগাছালি। দু-চারটে খোঁটায় বাঁধা গরু চরছে। লোকজন নেই। আম গাছটার তলায় ক্লান্ত ও হতাশ উপেনবাবু বসে রইলেন। আজও তিনি পারলেন না। কোনওদিনই কাটাকুটি খেলায় তিনি বাবলুর সঙ্গে পারেননি। নিজের এই নিরঙ্কুশ পরাজয়ের কোনও ব্যাখ্যাই তাঁর কাছে নেই। তিনি একটা ঘাসের ডাঁটি তুলে চিবোতে চিবোতে এই পরাজয়ের গ্লানিকে ভুলতে চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রথমেই নিজেকে বললেন, খেলায় হার-জিত তো আছেই।

সঙ্গে সঙ্গে কাছ থেকেই কে যেন বলে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খেলায় হার-জিত তো আছেই।

উপেনবাবু চমকে উঠে চারদিকে চেয়ে দেখলেন। কেউ কোথাও নেই। তবে কথাটা বলল কে?

ফের উপেনবাবু নিজেকে বোঝালেন, কাটাকুটি আবার একটা খেলা!

সঙ্গে সঙ্গে ফের কেউ বলল, দূর দূর! কাটাকুটি কোনও খেলাই নয়।

এ তো মহা মুশকিল হল! কোন বেয়াদব ফোড়ন কেটে যাচ্ছে, কিন্তু তাকে দেখা যাচ্ছে না! উপেনবাবু তন্নতন্ন করে চারদিকটা খুঁজে দেখলেন। কেউ কোথাও নেই। উপেনবাবু ভাবলেন, মনের ভুলই হবে। ফের তিনি ঘাসের ওপর বসে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে নিজেকে বোঝালেন, বুঝেছ উপেন, কাটাকুটি খেলায় হেরে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না।

সঙ্গে সঙ্গে ফের সেই ফোড়নবাজের গলা, পাগল নাকি! মহাভারত অশুদ্ধ হলেই হল!

উপেনবাবু আর উপেক্ষা করতে পারলেন না ব্যাপারটাকে। বেশ গলা তুলেই বললেন, কে রে? কার এত সাহস?

ঝুপসি গাছটার ডালপালায় একটা শব্দ হল, তারপর ওপর থেকে একজন বেঁটেখাটো রোগা লোক ঝুপ করে নেমে সামনে একগাল হেসে দাঁড়াল, আজ্ঞে, আমি হলুমগে নিবারণ তোপদার। কাটাকুটি খেলায় আমি ছিলুম এই গোটা মুর্শিদাবাদ জেলায় চ্যাম্পিয়ন।

বলেন কি মশাই! কাটাকুটি খেলার আবার জেলাওয়ারি কম্পিটিশনও হয় নাকি?

কি যে বলেন উপেনবাবু! কাটাকুটির তো রাজ্য এবং জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপও আছে। আর শেষে হল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ।

বাপরে! এটা তো আমার জানা ছিল না, নিবারণবাবু!

তবে আর বলছি কি? আমি অবশ্য রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠে জান মহম্মদের কাছে হেরে যাই। তারপর আর লজ্জায় লোকসমাজে মুখ দেখাই না। তবে আমার কাছে অনেকে শিখতে আসে। তাদেরই যা একটু শেখাই।

উপেনবাবু সোজা হয়ে বসে বললেন, আমাকে শেখাবেন?

নিবারণ খুব তীক্ষ্ন চোখে উপেনবাবুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত জরিপ করে নিয়ে বলে, সবাইকে শেখাই না। যার ভিতরে প্রতিভা আছে বলে মনে হয় তাকেই শেখাই। মনে হচ্ছে, আপনার হবে।

উপেনবাবু উদ্বেল হয়ে বললেন, হবে! ঠিক বলছেন তো! তা কবে থেকে শুরু করবেন বলুন তো।

লোকটা ডান হাতটা বাড়িয়ে বলল, পাঁচশো এক টাকা নজরানা দিয়ে চলে যান। কাল সকাল দশটায় একটা স্লেট আর পেনসিল নিয়ে চলে আসবেন।

উপেনবাবু গদগদ হয়ে নিবারণের হাতে পাঁচশো এক টাকা দিয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি তাহলে কাল থেকেই—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাল থেকেই। বলে লোকটা ফের গাছে উঠে গেল।

উপেনবাবু খুশি মনে বাড়ি ফিরলেন।

নিবারণ তোপদারের সঙ্গে অবশ্য উপেনবাবুর আর দেখা হয়নি। আর বাবলুর কাছে হারতে হারতে তিনি যেন হয়রান হয়ে যাচ্ছেন।
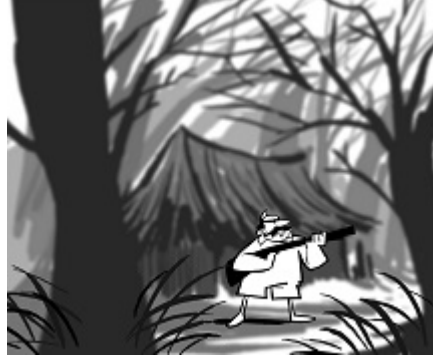
পটলবাবু ও উড়ন্ত চাকি

পটলবাবু যে জঙ্গলের মধ্যে একা একটা বাড়িতে বসবাস করেন তার কারণ আছে। কারণ হল, পটলবাবুর তিরিক্ষি মেজাজ আর চণ্ড রাগ। তাঁর মেজাজের ভয়ে গিন্নি মানে মানে বিদায় নিয়ে বাপের বাড়িতে গিয়ে বসবাস করছেন। সঙ্গে দশ বছরের ছেলে আর ছয় বছরের মেয়েকেও নিয়ে গেছেন। প্রকৃতির মধ্যে বাস করবেন বলে পটলবাবু শহর থেকে দূরে একটু জঙ্গলঘেঁষা নির্জন জায়গায় বাড়ি বানিয়েছিলেন। কিন্তু এখান থেকে বাজার-হাট স্কুল-কলেজ লোকালয় সবই দূরে বলে তাঁর পরিবারের কেউ ব্যাপারটা পছন্দ করছিল না। কিন্তু পটলবাবু কারও মতামতের তোয়াক্কা করেন না, একাই থাকেন। সারাদিন বন্দুক নিয়ে শিকারের খোঁজে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। শিকার অবশ্য কিছুই মেলে না। দু-চারটে হরিণ বা সম্বর দেখা যায়, আর পাখি। কিন্তু পটলবাবুর টিপ ভালো নয় বলে আজ অবধি একটিও পশু বা পাখি মারতে পারেননি। তবে শিকার করতে বেরোলে সময়টা কাটে ভালো।

সেদিন সন্ধের পর পটলবাবু ছাদে পায়চারি করতে গিয়ে হঠাৎ দেখলেন পুবদিকের আকাশে একটা তারা যেন বড্ড বেশি চকচক করছে। তারাদের তো জ্বলজ্বল করতে দেখা যায় না কখনও! তিনি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে দূরবীনটা এনে দেখলেন, তারাটা বেশ বড় একটা পিরিচের আকার নিয়েছে। নীলচে আলোটা আরও তীব্র হয়েছে। এবং তারাটা এদিকেই যেন ধেয়ে আসছে। পটলবাবুর শরীর কন্টাকিত হয়ে উঠল। এ কি সেই উফো নাকি রে বাবা। গত সপ্তাহেই আমেরিকা আর ব্রাজিলে কয়েকজন লোক উফো দেখেছে বলে খবরের কাগজে খবর ছিল!

পটলবাবু দূরবীন ধরে চেয়ে রইলেন। বুঝতে পারলেন, জিনিসটা তারা তো নয়ই, বরং উড়ন্ত চাকির মতোই কিছু। উজ্জ্বল আলোটা দপ করে খানিকটা কমে গেল এবং দেখা গেল আকাশে গোল আকৃতির একটা বাড়ির মতো জিনিস ভেসে আছে। বাড়িটা কয়েকতলা উঁচু, অনেক জানালার মতো চৌখুপী আছে। জানালাতে চৌকো চৌকো আলো দেখা যাচ্ছে। বাড়ির মাথায় একটা ঝুঁটির মতো কিছু রয়েছে।

উত্তেজিত পটলবাবু দুদ্দার করে নেমে বাইরে বেরিয়ে আঁদার-প্যাঁদার ভেঙে সেই উড়ন্ত চাকির দিকে ছুটতে লাগলেন। কিন্তু উত্তেজনার বশে খেয়াল করেননি যে, তিনি লুঙ্গি পরে আছেন এবং পায়ে হাওয়াই চটি। এই দুটি জিনিস যে দৌড়োনোর অনুকূল জিনিষ নয়, তা খেয়াল হল, লুঙ্গিতে পা জড়িয়ে একটা আছাড় খাওয়ার পর। অন্ধকারে একপাটি হাওয়াইও কোথায় ছিটকে গেল কে জানে। ছড়ে যাওয়া হাঁটু, মচকানো

কব্জি আর মটকে যাওয়া গোড়ালি নিয়ে যখন কাতর মুখে উঠে দাঁড়ালেন তখন উড়ন্ত চাকি হাওয়া হয়ে গেছে। আকাশ পরিষ্কার। তবে তাঁর ধারণা হল উড়ন্ত চাকিটা ধারে কাছে কোথাও নেমেছে।

সকালে প্রায় প্রবল ব্যথা সত্ত্বেও পোশাক পরে বন্দুক বগলে নিয়ে পটলবাবু বেরিয়ে পড়লেন। হিসেবমতো যে জায়গায় উড়ন্ত চাকি নামবার কথা সেটা জঙ্গলের মধ্যে।

জঙ্গলের মধ্যে পটলবাবু প্রায়ই বিচরণ করে থাকেন। ফলে স্থানটি তাঁর বেশ চেনা। খুব একটা দুর্গম জঙ্গলও নয়। বেশ খানিকটা ভিতরে ঢুকে যাওয়ার পর একটা লতানে গাছের আড়াল সরিয়ে উঁকি দিতেই পটলবাবু হাঁ। সামনে একটু ফাঁকা জায়গায় একটা নৌকো রয়েছে। আর সেই নৌকোয় একদল বেজায় লম্বা লোক বসে হাতে ক্যালকুলেটরের মতো একটা যন্ত্রে যেন কিছু হিসেব-নিকেশ করছে। লোকটার পরনে একটা দেখার মতো জিনিস। জুডো খেলায় যেমন পোশাক পরতে হয় অনেকটা তেমনি।

লোকটা মুখ ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকাল। কী সুন্দর মুখখানা। যেন গ্রীক দেবতা।

পটলবাবু দু-পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, নমস্কার। তা এই জঙ্গলের মধ্যে একটা নৌকো কোথা থেকে এল বলুন তো। ধারে কাছে তো জলও নেই। ডুংরি নদী তো মাইলখানেক দূরে।

লোকটা গম্ভীর মুখে তাঁর দিকে চেয়ে হঠাৎ ইশারায় তাঁকে নৌকোয় উঠে পড়তে বলল।

পটলবাবু একটু দ্বিধায় পড়লেন। অচেনা অজানা মানুষ। ফট করে তার কাছে যাওয়াটা ঠিক হবে কি? তবে তাঁর দুর্জয় সাহস। কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করে সটান গিয়ে নৌকোয় উঠে পড়লেন। আর উঠেই বুঝতে পারলেন এটা ঠিক দিশি ডিঙি নৌকো নয়। ভিতরে গদি আঁটা চমৎকার বসবার জায়গা রয়েছে এবং রয়েছে নানারকম কলকব্জা। সেগুলো পটলবাবু চেনেন না। তিনি বসতেই একটা স্বচ্ছ কাচের ঢাকনায় নিঃশব্দে নৌকাটা ঢেকে গেল। সামান্য একটু দোল খেয়ে নৌকোটা সটান আকাশে উঠে গেল। এতটাই ওপরে যে, কয়েক সেকেন্ড পরে প্রায় মেঘের রাজ্যে পৌঁছে গেলেন তাঁরা।

পটলবাবু চেঁচিয়ে উঠে বললেন, এসব কী হচ্ছে মশাই? আপনি নিশ্চয়ই অন্য গ্রহের লোক। কিন্তু আমার হাতে বন্দুক আছে। যদি নামিয়ে না দেন তাহলে কিন্তু...

লোকটা কোনও জবাব দিল না। কিন্তু পটলবাবুর পাশ থেকে একটা যান্ত্রিক লিভার হঠাৎ বেরিয়ে এসে তাঁর বন্দুকটা কেড়ে নিল।

পটলবাবু বুঝলেন, শক্ত পাল্লায় পড়েছেন। মুশকিল হল, এই ভিন্ন গ্রহের মানুষের মতলবটা তিনি বুঝতে পারছেন না। তাঁকে এভাবে তুলে এনে এ কী করতে চায় সেটা ভেবে একটু ভয় হয়েছে তাঁর। লোকটা তাঁর ভাষা বুঝতে পারবে না। জেনেও পটলবাবু বলতে লাগলেন, শুনুন মশাই, শুনুন। আমরা খুব নিরীহ জীব। কারও কোনও ক্ষতি করি না। ভিন গ্রহ থেকে লোকজন এলে আমরা তাদের খুবই খাতির করি। কেন মশাই, আমাকে এভাবে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি গেরস্ত মানুষ। আমার বউ বাচ্চা আছে। আমাকে যদি মেরে-টেরে ফেলেন তাহলে তারা যে খুব বিপদে পড়বে! আপনাদেরও সংসার-টংসার আছে, না কি! দোহাই আপনার, আমাকে নামিয়ে দিয়ে আসুন।

লম্বা লোকটা তার ক্যালকুলেটরের মতো যন্ত্রটা নিয়ে খুব মন দিয়ে কি সব হিসেব-নিকেশ করছিল যেন। এবার মুখ তুলে বলল, ইয়াও।

পটলবাবু কথাটার মানে বুঝলেন না। তবু বললেন, সে তো বটেই। তবে কিনা—

এবার লোকটা একটু হেসে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বলল, তোমার ভাষাটা বুঝতে, আমার দশ মিনিট সময় লেগেছে। আমার এই সেনসর যন্ত্রটি তোমার ভিতরকার সব খবর বিশ্লেষণ করে বলছে, তুমি অত্যন্ত বাজে লোক। একগুঁয়ে, রাগী, জেদী এবং নির্দয়। ঠিক কিনা!

পটলবাবু আর্তনাদ করে বলে উঠলেন, না না, অতটা নয়। তা মানুষের তো দোষ-গুণ সবই থাকে। একটু আধটু দোষ থাকলেও আমি খুব খারাপ লোক নই আজ্ঞে।

নৌকোটা এত ওপরে উঠে এসেছে যে, এখান থেকে গোটা পৃথিবীটাকেই দেখা যাচ্ছে একটা বিশাল গ্লোবের মতো। পটলবাবুর মাথাটা বাঁই করে ঘুরে গেল।

নৌকোটা একটা উচ্চতায় এসে থামল। লোকটা বলল, নামো।

পটলবাবু হাঁউ মাউ করে কেঁদে ফেলে বললেন, কোথায় নামব? পড়ে গেলে কি আর বাঁচব?

কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, শূন্যে অদৃশ্যমানতা থেকে ধীরে ধীরে সেই বিশাল গোল ভাসমান বাড়িটা দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। নৌকোটা ঘাটে ভেড়ার মতো সেই উড়ন্ত চাকির সঙ্গে লেগে রইল। সামনে একটা দরজার মতো ফাঁক। পটলবাবু খুব ভয়ে ভয়ে সেই দরজা দিয়ে লম্বা লোকটার পিছু পিছু ভিতরে ঢুকলেন। ওরে বাবা! চারদিকে বিটকেল এবং কিম্ভুত সব যন্ত্রপাতি। তারই ফাঁকে ফাঁকে খুব লম্বা চেহারার গম্ভীর মুখের লোকেরা মন দিয়ে নানা কাজ করে যাচ্ছে। তাকে যে পাকড়াও করে এনেছে সেই লোকটা তাকে টেনে নিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে মাথায় একটা হেলমেটের মতো জিনিস পরিয়ে দিয়ে বলল, মাঝে মাঝে আমরা পৃথিবীর কিছু বেয়ারা লোককে শায়েস্তা করে দিয়ে যাই। এবার তোমার পালা।

পটলবাবু আপত্তি করার আগেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলেন কে জানে। জ্ঞান ফেরার পর তিনি স্পষ্ট টের পেলেন, তিনি আর আগের মানুষটি নেই। মনটা বেশ হালকা ফুরফুরে। ভিতরে যেন রাগ-টাগগুলোও উধাও হয়েছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, বউ বাচ্চাদের জন্য তাঁর মন কেমন করছে।

লোকটা ফের একটা দরজা খুলে দিয়ে পটলবাবুকে বলল, নামো।

পটলবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, নামব কি মশাই! পৃথিবী যে অনেক দূরে!

লোকটা হঠাৎ তাঁকে শূন্য ঠেলে ফেলে দিল। পটলবাবু চোখ বুজে ফেলেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তিনি শূন্যে ভেসেও রইলেন না, আবার তীব্র গতিতে পতিত হলেন না। একটা অদৃশ্য দড়ি যেন তাকে ধরে ধীরে ধীরে পৃথিবীতে নামিয়ে দিতে লাগল। কয়েক মিনিট পর তিনি দিব্যি নিজের বাড়ির কাছেই নেমে পড়লেন। ওপরের দিকে বিস্মিত চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে তিনি বিড়বিড় করে বললেন, তোমরা লোক তেমন মন্দ নও হে।

পটলবাবু আর দেরি করলেন না। বউ আর ছেলে-মেয়ের কাছে যাবেন বলে তাড়াতাড়ি শ্বশুরবাড়ি রওনা হয়ে পড়লেন।
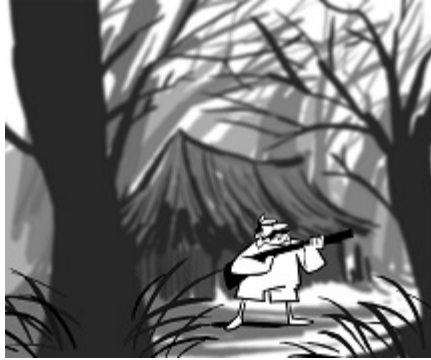
ফটিকবাবু ও লালমোহন

ফটিকবাবুর সামনে ও পিছনে অন্ধকার। ওপরে ও নীচে অন্ধকার। শুধু তাঁর নৌকোর সামনের দিকে নীলচে ইন্ডিকেটরগুলো জ্বলছে। আর কোনও আলো নেই। তিনি অভিজ্ঞ মানুষ, বহুবার আকাশগঙ্গা পাড়ি দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও ভুলচুক হতেই পারে। ভরসার কথা তাঁর নাওটিতে অটো নেভিগেটর আছে। ঘণ্টা খানেক আগে নেভিগেটর তাঁকে একটা সাংকেতিক নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, তিনি মহাকাশের এমন একটা জায়গায় রয়েছেন সেখান থেকে নক্ষত্রমন্ডলীর চেনা মানচিত্রটা বোঝা যাচ্ছে না। একটু বেশি দূরে এসে পড়লে এই গন্ডগোলটা হয়। গত এক ঘণ্টা যাবৎ নেভিগেটর চুপচাপ রয়েছে। কোনও সংকেত দিচ্ছে না।

ফটিকবাবুর তাঁর কনসোলের দিকে তাকিয়ে ভ্রু-কোঁচকালেন। সেখানেও একটা স্থিতাবস্থা দেখতে পাচ্ছেন। কোনও ইন্ডিকেটরে? কোনওরকম চঞ্চলতা বা ক্রিয়াশীলতা নেই। শুধু এটুকু বুঝতে পারছেন যে তাঁর অত্যাধুনিক নৌকাটি অতি দ্রুত আলোর চেয়েও অন্তত দু-হাজার গুণ বেশি গতিতে ধাবিত হচ্ছে। প্রতিবস্তুজাত শক্তি এবং মনোগতি নামক নতুন এক সাইকো অ্যানালিটিক্যাল প্রযুক্তি দ্বারা সংঘটিত এই গতি অবশ্যই আগের দিনে বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে দিত। কিন্তু নানা রক্ষা কবচের ফলে তা আজকাল হয় না। এই দুর্বার গতিতেও তাঁর নৌকো অক্ষত রয়েছে এবং তিনিও।

তিনি যে একটি নিউট্রাল জোনে পৌঁছে গেছেন সেটা একটু একটু করে বুঝতে পারছেন ফটিকবাবু। এ হল অনেকটা সুন্দরবনের নদীতে যেমন 'ঘোলা' নামক নিউট্রাল ওয়াটারের এলাকা থাকে। সেখানে নৌকো ঢুকে পড়লে এগোতেও পারে না। পিছোতেও পারে না। মহাকাশের এই নিস্তরঙ্গ নিথর এলাকাগুলি অতীব ভয়ের। ফটিকবাবু গত পঁচিশ বছর আকাশগঙ্গায় বহুবার অভিযান করেছেন বটে, কখনও এ রকম নিউট্রাল জোনে পড়তে হয়নি। এ যাবৎ যে কটি নৌকো এ রকম এলাকায় ঢুকে পড়েছে তারা কেউ আর পৃথিবীতে ফিরে যতে পারেনি। ঘুরে ঘুরে মরেছে।

ফটিকবাবু কিছুক্ষণ যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করলেন। বুঝতে পারলেন তার নৌকো বৃত্তাকারে ঘুরে চলেছে। ফটিকবাবুর বেশ ঘাম হচ্ছে, ভয় হচ্ছে, দুশ্চিন্তায় বিভ্রম দেখা দিচ্ছে। পৃথিবীতে একটা বার্তা পাঠানোর চেষ্টা করে দেখলেন, কাজ হচ্ছে না।

ফটিকবাবুর নৌকোয় তিনি ছাড়া আর মানুষ নেই বটে। কিন্তু বেশ কয়েকজন বিচক্ষণ ও বহু কর্মক্ষম যন্ত্রমানব এবং অতি আধুনিক কম্পিউটার রয়েছে। তিনি নৌকো চালু রেখে নৌকোর খোলের ভিতরে ঢুকে গেলেন। ভিতরে চমৎকার ব্যবস্থা। খাওয়ার ঘর, বিশ্রামের ঘর, রান্নাঘর, টয়লেট সবই বিদ্যমান। যান্ত্রিক

মানুষেরা নিঃশব্দে নানা কাজ করে চলেছে। তিনি মূল কম্পিউটারটির সামনে বসে নিজের সঠিক অবস্থান জানার চেষ্টা করে দেখলেন তাঁর নৌকো সত্যিই একটি নিস্তরঙ্গ এলাকায় অজান্তে ঢুকে পড়েছে।

হঠাৎ পিছনে একটা হাই তোলার মতো শব্দ হল। ফটিকবাবু চমকে পিছনে চেয়ে দেখলেন, ওপাশের জানালা ঘেঁষে যেন একটা ছায়ামূর্তি বসে আছে। কিন্তু এই মহাশূন্যে এই সুরক্ষিত নৌকোয় কে আসতে পারে? চোখে ভুল দেখছেন নাকি? তবু বললেন, কে ওখানে?

জবাব এল, লালমোহনকে চিনতে পারলে না?

কে লালমোহন?

পীরগঞ্জের গোঁসাইবাড়ির ছেলে, মনে নেই?

মনে পড়ল। তাঁর বাল্যবন্ধু লালমোহন ঘোষ। লালমোহন বহুকাল আগেই সাধু হবে বলে সংসার ত্যাগ করেছিল। তারপর আর তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। কিন্তু লালমোহনই বা এখানে আসে কি করে? তিনি বোধহয় সত্যিই ভুলভাল দেখছেন। মানসিক বিকার শুরু হয়ে গেছে তাঁর।

ভূত নই হে, ভুলও দেখছ না।

তাহলে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি কেন?

তুমি বিজ্ঞানী, জড়বস্তু নিয়ে পড়ে থাকো, সাধনভজনের জগতের খবর তো রাখো না।

ওসবে আমি যে বিশ্বাস করি না।

তা জানি, বিশ্বাস করার দরকারও নেই। আমার সঙ্গে এসো।

কোথায় যাব?

তোমার নৌকোর পিছন দিকে মেঝের নীচে একটা লাল সুইচ আছে ওটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এসো।

ফটিকবাবু খুব বিস্ময়াবিষ্ট হলেন। তবু লালমোহনের পিছু পিছু গেলেন। লালমোহন মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বলল, এই ঢাকনাটা তোলো।

ফটিকবাবু ঢাকনাটা তুলে সত্যিই একটা লাল সুইচ দেখতে পেলেন। বললেন, এটা কী বলো তো?

ওটা তোমাদের ভাষায় ডিসট্রেস নেভিগেটর।

তাই তো! এটার কথা তো আমি যেন শুনেওছিলাম।

ওটা টিপে দাও, তাহলেই হবে।

ফটিকবাবু অবাক হয়ে বললেন, তা না হয় হল, কিন্তু তুমি কি করে এই নৌকায় এলে, কেন এলে কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

বুঝবার দরকার কি? তোমাকে মহাকাশচারণা করতে হলে অনেক যন্ত্রপাতির সাহায্য নিতে হয়। আমার তার দরকার হয় না। তুমি যন্ত্রনির্ভর অসহায় মানুষ, আমি তা নই। তোমার কাছে এই মহাশূন্য রহস্যময়, আমার কাছে এ এক আনন্দময় আলোর রাজ্য তোমার কাছে যা অন্ধকার আমার কাছে তা জ্যোতির্ময়। সুইচটা টিপে দাও।

ফটিকবাবু তাই করলেন। লালমোহন অদৃশ্য হল।

নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসার তিনদিন পর ফটিকবাবু চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। তারপর খোঁজখবর নিয়ে লালমোহনের আশ্রমে গিয়ে হাজির হলেন।

ভাই লালমোহন, আমি এসেছি।

লালমোহন হেসে বললেন, ভালো করেছ। তোমার জন্যই তো বসে আছি।

সেই বুড়ো লোকটা

পাঁচুবাবুর মনটা মোটেই ভালো নেই। গতকালই জ্যোতিষী অয়খান্ত তাঁর কুষ্টি বিচার করে বলে দিয়েছে যে, রাহুর দশা চলছে, সময়টা খারাপই যাবে। পাঁচুবাবু যদিও জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না, তবু গ্রহ বৈগুন্য ঠেকানোর জন্য দু-হাতে মোট আটখানা আটরকমের দামি পাথরের আংটি, দু-হাতে চারটে মাদুলি, গলায় ধুকধুকি পরে থাকেন। লোকে জিগ্যেস করলে অবশ্য বলেন, না হে বাপু, এসব বুজরুকিতে আমার মোটেই বিশ্বাস নেই। তবে কিনা আমার গিন্নির চাপাচাপিতেই এসব পরতে হয়েছে।

হরিবিষুপুর গঞ্জ জায়গা। আগে গাঁ-মতো ছিল, এখন দিব্যি রমরম করছে। আগে হপ্তায় দুবার হাট বসত, এখন রোজ দোবেলা পাকা বাজারে বিকিকিনি হয়। মাইলটাক দূর দিয়ে নতুন রেল লাইন হল, স্টেশনের নামও হরিবিষুপুর, গঞ্জের গা ঘেঁষে পাকা রাস্তা হয়েছে, তা দিয়ে গাঁকগাঁক করে আপ-ডাউন বাস যায়। শোনা যাচ্ছে, শিগগির অটো-ভ্যানও চালু হয়ে যাবে। কিন্তু হরিবিষুপুরের এই উন্নতিই একরকমের কাল হয়েছে পাঁচুববাবুর পক্ষে। কারণ আগে এখানে একটা মাত্র ওষুধের দোকান ছিল, আর সেটা পাঁচুবাবুর। একেবারে একচ্ছত্র ব্যাবসা। পাঁচুবাবুর মনোরমা মেডিক্যাল স্টোর্স ছাড়া মানুষের গতি ছিল না। কিন্তু যাঁহাতক হরিবিষুপুরের উন্নতি হতে লেগেছে অমনি ঝপাঝপ আরও তিনখানা ঝকঝকে দোকান দাঁত বের করে খুলে গেল। তার মধ্যে আবার সদানন্দ সেনের বিশাল গোবর্ধন ফার্মাসি। যেমন কেতাদুরস্ত দোকান, তেমনই নানা ধরনের ওষুধের স্টক। ঝপ করে মনোরমা মেডিক্যালের বিক্রি একেবারে তলানিতে এসে ঠেকে গেছে। দু-চারজন পুরোনো খদ্দের অভ্যাসবশে এখনও হানা দেয় বটে, কিন্তু ঠিকমতো ওষুধ না পেলে দুর ছাই করে চলে যায়। পাঁচুবাবুর অবস্থা তাই মোটেই সুবিধের নয়।

দোকানের আয়-ব্যয় নেই, তাই দুজন কর্মচারী হরিপদ আর ষষ্ঠীচরণ চাকরি ছেড়ে একজন গোবর্ধন ফার্মাসি আর অন্যজন কেয়ার অ্যান্ড কিওর-এ গিয়ে ঢুকে পড়েছে। পাঁচুবাবু তাই একাই সন্ধেবেলা মনোরমা মেডিক্যালে বসে মাছি তাড়ান। চেনাজানা লোকেরা আগে উঁকিঝুঁকি দিয়ে যেত, আজকাল আর কারও টিকির নাগাল নেই।

পাঁচুবাবু সন্ধে সাতটা নাগাদ পঞ্চম হাইটা তুলে এক ভাঁড় চায়ের অর্ডার দেবেন কি না ভাবছিলেন, এমন সময় ছোটখাটো রোগা নিরীহদর্শন একটা লোক দোকানে ঢুকল।

পাঁচুবাবু খুশি হয়ে বললেন, আসুন, আসুন।

লোকটা মিটমিট করে চারদিকটা দেখল। একটু যেন নাকও সিঁটকালো। যেন ঠিক পছন্দ হল না। তারপর বলল, এটাই তো মনোরমা মেডিক্যাল, তাই না?

যে আজ্ঞে, বহু পুরোনো কারবার মশাই। হরিবিষ্ণুপুরকে তো এতকাল এই মনোরমা মেডিক্যালই বাঁচিয়ে রেখেছিল। এখন সব নতুন নতুন দোকান খুলেছে বটে, কিন্তু পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে।

এ সব কথায় লোকটা তেমন ভিজল বলে মনে হল না, ভ্রূ কুঁচকে ভারি অপছন্দের চোখে ওষুধের তাকগুলো দেখতে দেখতে আপনমনেই বলল, নাঃ, কর্তা বড্ড বেহিসেবি দর দিয়ে ফেলেছেন দেখছি? এ তো পাতে দেওয়ার মতো নয়।

পাঁচুবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, আহা, কী চাই বলুন না। আমার দোকানে সবরকম জিনিস থাকে। কলেরা, টাইফয়েড, হার্টের ব্যামো, হাঁপানি সব কিছুর ওষুধ পাবেন। নেপালডাক্তার গত দশ বছর ধরে এখানেই বসতেন। ইদানীং শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, তাই।

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, না মশাই, কর্তা না বুঝেসুঝে একটা বেহিসেবি কাণ্ডই করে ফেলেছেন দেখছি! স্টকের যা ছিরি তাতে তো হাজারদশেক টাকারও মাল নেই বলে মনে হচ্ছে?

বলেন কী মশাই! দশ হাজার কী, কম পক্ষে পঞ্চাশ হাজারের মাল তো আছেই। কিন্তু আপনি তো আর দোকানসুদ্ধু জিনিস কিনবেন না?

নিরীহদর্শন লোকটা এবার চোখ পাকিয়ে বলে, যদি কিনি, তাহলে?

পাঁচুবাবু হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, সব ওষুধ কিনবেন?

তাই তো ইচ্ছে। তবে শুধু ওষুধই নয়, সঙ্গে দোকানটাও।

অ্যাঁ।

আজ্ঞে হাঁ। কাগজপত্র সব তৈরি করেই এনেছি। অগ্রিম দেড় লাখ টাকা নগদে দিয়ে যাচ্ছি, বাকি টাকা রেজিস্ট্রির পর। কর্তার বড্ডই লোকসান হয়ে গেল দেখছি। তা কী আর করা। এই অখদ্দে দোকানঘরের জন্য কেন যে তিন লাখ টাকা কবুল করে বসলেন কে জানে।

পাঁচুবাবুর ব্যাপারটা বুঝে উঠতে একটু সময় লাগল। তারপর তেড়ে উঠে বললেন, মানে! ইয়ার্কি পেয়েছ? আমি দোকান বিক্রি করব বলে বসে আছি নাকি? বেরোও, বেরোও...

নিরীহদর্শন লোকটা ভারি মোলায়েম গলায় বলল, তিন লাখ টাকা যে দর উঠেছে সেটা তো আপনার কপালজোর মশাই। কর্তা নিতান্তই ভালোমানুষ বলে। নইলে এ তো লাখ টাকাতেও কেউ ছুঁয়ে দেখবে না।

পাঁচুবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠল। কান গরম, রক্তচাপ বেড়ে গেল। টেবিলে ঘুঁষি মেরে বললেন, আশা তো কম নয়! দোকান কিনবে! দূর হয়ে যাও এক্ষুনি! নইলে পুলিশ ডাকব।

পাঁচুবাবুর বিক্রম দেখেও লোকটা এতটুকু বিচলিত হল না। শুধু পিছন ফিরে দরজার দিকে মুখ করে কাকে যেন ডাকল, কই রে? ইদিকে আয় বাবা। অমনি দরজায় যমদূতের মতো বিকট এবং বিশাল চেহারার একটা লোক উদয় হল। চেহারাখানা যেমন দৈত্যের মতো, চোখেও তেমনি খুনিয়া চাউনি।

পাঁচুবাবু লোকটাকে বিলক্ষণ চেনেন। মদনপুরের কেষ্ট বাউরি। কেষ্টর নামে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। পাঁচুবাবুর মুখখানা এমন হাঁ হয়ে গেল যে দু-হাতে চেপেচুপেও বন্ধ করা যাচ্ছিল না। গলাও কেঁপে গেছে। কোনওরকমে কাতরকণ্ঠে বললেন, এসব কী হচ্ছে?

ছোটখাটো লোকটা ভারি কুটিল চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, না বুঝবার মতো কথা কী কয়েছি মশাই? একেবারে সোজা সরল বাংলায় বলা, গরুও বোঝে। আপনার ভালোর জন্যই আমাদের কর্তাবাবু ভজহরি ঘোষ দোকানখানা ন্যায্যর চেয়ে অনেক বেশি দামেই খরিদ করতে চাইছেন। তাঁর আবার দয়ার

শরীর। মশা মাছিরও কষ্ট সহ্য করতে পারেন না। আর সেইজন্যই পুরোনো অখদ্দে, অচল দোকানঘরখানা তিন লাখে কিনতে চাইছেন। বাজার ঘুরে দেখে আসুন তো আর কেউ এ দর দেবে?

পাঁচুবাবু ডুকরে উঠে বললেন, বলো কী হে বাপু? পরেশ জানা যে সাত লাখ টাকা দর দিয়েছে, তবু আমি ঘাড় কাত করিনি। আর ভজহরি গুণ্ডা লাগিয়ে মাত্র তিন লাখে কিনতে চায়! এ কোন দিশি জুলুম বাপু?

লোকটা ভারি অবাক হয়ে বলে, জুলুম! জুলুম কোথায় মশাই? এ তো আপনার কপাল খুলে গেল বলতে হয়। ওষুধের ব্যবসা আপনার দ্বারা হবে না। তিন লাখ দিয়ে ভূষি মালের কারবার খুলুন, দু-দিনে লাল হয়ে যাবেন। ঠিক আছে, আজ আপনি বড্ড ভেঙে পড়েছেন দেখতে পাচ্ছি, তিন দিন বাদে আবার আসব। তৈরি থাকবেন।

লোকটা কেষ্ট বাউড়িকে নিয়ে বিদেয় হওয়ার পর পাঁচুবাবু অনেকক্ষণ বজ্রাহতের মতো বসে রইলেন। কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। এ তাঁর বাপ-ঠাকুরদার আমলের দোকান। একসময়ে এই দোকানের আয়েই তাদের সংসার চলত। শুধু চলত কেন, এই দোকানের আয়েই তাদের জমি বাড়ি আর বাবুগিরি সবই হয়েছে। যতই খারাপ চলুক এই দোকান বিক্রি করে দেওয়ার কথা তিনি ভাবতেই পারেন না। কিন্তু গতিক সুবিধের নয়। ভজহরি ঘোষের পাঁচ-সাতটা ব্যাবসা। সোনা-রুপো থেকে মিঠাই-মণ্ডা অবধি। অতি দুর্দান্ত লোক। তাকে ভয় খায় না এমন লোক আশেপাশের দশটা গাঁয়েও নেই।

পাঁচুবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে তাঁর জামা ভিজে যাচ্ছে। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে। হাতে-পায়ে যেন সাড় নেই। বোধহয় কাঁদতে কাঁদতে হত ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েই পড়েছিলেন।

হঠাৎ দেখতে পেলেন, উলটো দিকে একটা বুড়োমতো লোক তাঁকে জুলজুল করে দেখছে। এই গরমেও লোকটার গায়ে একটা গলাবন্ধ কোট, গলায় মাফলার, মাথায় বাঁদুড়ে টুপি। পাঁচুবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, ভ্যাবলার মতো কেঁদে ভাসালেই হবে? কিছু করতে হবে না?

পাঁচুবাবু শশব্যস্তে বললেন, কীসের কথা বলছেন?

দুর আহাম্মক, এই যে ভজহরি তোর দোকান কিনতে চাইছে তার জন্য কিছু করবি না? নাকি ভয় খেয়ে বেচে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলবি!

না বেচলে যে গুণ্ডা লাগাবে বলছে।

কেষ্ট বাউড়ির বাঁ-দিকের পাঁজরে এই অ্যাত্তবড় একটা ফোড়া হয়েছে। কার্বাংকল। ঠিক তাক করে যদি ওখানটায় একখানা ঘুঁষো বসাতে পারিস তাহলেই হয়ে গেল। কেষ্ট বাউরি চোখে সর্ষেফুল দেখতে দেখতে দাঁত ছরকুটে ভিরমি খেয়ে পড়ে যাবে। আর বেঁটে শয়তানটা তো নেংটি ইঁদুর, পালানোর পথ পাবে না।

পারব কি?

না পারলে চলবে কী করে। এর পর যখন ওরা আসবে, প্রথমেই কেষ্ট বাউড়িকে তাক করে ঘুঁষোটা মেরে দিয়ে দেখ না কী হয়।

কিন্তু মশাই, তার পরেও তো অন্য লোক দোকান হাতিয়ে নিতে আসবে।

তা আসবে। দোকানের যা ছিরি করে রেখেছিস। লোকে ভাববে কারবার লাটে তুলে বসে আছিস। একটু ঝা চকচকে না করলে কি খদ্দের ধরা যায়?

সে তো বড় কথা হয়ে গেল। দোকানের ভোল পালটাতে যে মালকড়িও চাই মশাই।

তা বটে। ওই যে মাঝখানের ভারী আলমারিখানা দেখছিস, ওটার পিছনে একখানা খোপ আছে। নাগাল পাওয়া সহজ নয়। আলমারির মাথায় উঠে পিছন দিকে সাবধানে নামতে হবে। খুব সামান্য ফাঁক। কোনওরকমে যদি নামতে পারিস তাহলে খোপের গায়ের তালাটা খুলতে পারলেই তোর কাজ হয়ে যাবে।

বটে! কী আছে খোপে?

খুঁজে দেখিস।

কিন্তু খোপের চাবি পাব কোথায়?

তোর চাবির থোকায় অনেক চাবির মধ্যে একটা পুরোনো চাবি পেয়ে যাবি। খাঁজগুলো ইংরিজি ই অক্ষরের মতো। সেইটেই।

আপনি কে?

কে বলে মনে হচ্ছে?

ঠিক বুঝতে পারছি না যে!

বুঝে কাজ কী তোর। যা বলছি শোন।

বুড়ো মানুষটা হঠাৎ উঠে গটগট করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গায়েব হয়ে গেল।

প্রথমটায় পাঁচুবাবুর মনে হল স্বপ্নই দেখেছেন। পরে অনেক ভেবে মনে হল, তেমনটা নাও হতে পারে।

যাই হোক, তিনদিন বাদে যখন সত্যিই এক সন্ধেবেলা বেঁটে লোকটা আর কেষ্ট বাউড়ি এল সেদিনটার কথা ভুলতে পারবে না পাঁচুবাবু। উঠে গিয়ে সটান কেষ্ট বাউড়ির বাঁ-পাজরে একখানা মোক্ষম ঘুঁষি মেরে বসলেন। আর যাবে কোথায়, কেষ্ট তো অজ্ঞান হলই না, উলটে পাঁচবাবুকে সে কী উস্তম কুস্তম মার। সেই মার খেয়ে পাঁচুবাবুই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। তিনদিন হাসপাতালে পড়ে থাকতে হল। সেই ফিচেল বুড়োকে শাপশাপান্তর করতে করতে বাড়ি ফিরে একদিন কিন্তু সেই আলমারির পিছনেও নামলেন। যথারীতি সেখানে কোনও খোপের সন্ধানও পাওয়া গেল না।

তবে ঝুল আর মাকড়সার জালে আটকে থাকা একখানা বহু পুরোনো চিঠির খাম পেয়ে গেলেন। রাগে ফুঁসতে ফুসতে তিনি ফাজিল ও মিথ্যেবাদী বুড়োকে আরও বিস্তর শাপশাপান্ত করতে লাগলেন।

কিন্তু একটা ভারি আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। গাঁয়ের লোকেরা এসে তাঁর খুব প্রশংসা করতে লাগল। কেষ্ট বাউড়িকে যে তিনি অন্তত একটা ঘুঁষোও দিয়েছেন সেটাও নাকি কম কথা নয়। যারা প্রশংসা করে গেল তারা আবার কেউ কেউ আমাশা বা জ্বরের ওষুধও নিয়ে গেল নগদ দাম দিয়ে এবং রোজই বিক্রিবাটা হতে লাগল কিছু কিছু করে। আগের মতো ততটা খারাপ অবস্থা নয়। আরও আশ্চর্য কাণ্ড হল, একদিন বাবুমতো একটা লোক গাড়ি করে এসে একটা মলম কেনার সময় তাঁর টেবিলে পুরোনো খামটা দেখে ভারি অবাক হয়ে বললেন, এই খাম আপনি কোথায় পেলেন?

পাঁচুবাবু বললেন, আমার কাছেই ছিল। কেন বলুন তো?

ওই ডাকটিকিটের যে অনেক দাম। রেয়ার জিনিস। আমাকে দেবেন।

তা নিন না।

কত দিতে হবে?

দুর মশাই, পুরোনো ডাক টিকিটের জন্য পয়সা কীসের? এমনিই নিয়ে যান।

লোকটা অবাক হল, তবে খামটা নিয়েও গেল।

ক'দিন পরেই পাঁচুবাবু একটা চিঠি পেলেন। হাতিমতাই কোম্পানিতে দশ লক্ষ টাকার ওষুধ সাপ্লাইয়ের বরাত তাঁকে দেওয়া হয়েছে।

নবজীবনের আঁচিল

আপনিই কী নবজীবনবাবু?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

শুনেছিলুম নবজীবনবাবুর নাকের বাঁ-পাশে একটা কালো রঙের বড় আঁচিল আছে!

আছে নাকি? তা থাকতে পারে।

কিন্তু আপনার তো সেটা নেই দেখছি!

তাহলে নেই। কী করা যাবে বলুন! তা আপনি খুঁজছেন কাকে? নবজীবনবাবুকে না তার নাকের পাশের আঁচিলটাকে?

কী যে বলেন স্যার! আঁচিলকে খুঁজতে যাব কেন? আঁচিলের সঙ্গে আমাদের দরকারটাই বা কি? তবে কিনা একটা আইডেন্টিটি মার্ক হিসেবে আঁচিলের মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয়—এই যা।

তা বৈ কি! কোনও ছোটখাটো জিনিসকেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা উচিত নয়। কখনও কখনও আঁচিল, তিল, ট্যারা চোখ, বাঁকা ঠোঁট অতি গুরুতর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমার ছোট মামা অবনী তালুকদার তো তাঁর বাঁ-হাতের ছয় নম্বর আঙুলটার জন্যই মরতে মরতেও বেঁচে গেলেন।

বটে! তাঁর বাঁ-হাতে ছ'টা আঙুল ছিল বুঝি?

ছিলও বলা যায়, আবার ছিল নাও বলা যায়।

পরিষ্কার বোঝা গেল না।

আসলে ছোট মামার বাঁ-হাতে ছ'টা আঙুলই ছিল। বুড়ো আঙুলের পাশ দিয়ে আরও একটা খোকা আঙুল এমনভাবে উঁচিয়ে থাকত যে, একটা ইংরিজি ভি অক্ষরের মতো দেখা যেত। আমরা জ্ঞান হয়ে ইস্তক দেখে আসছি। কিন্তু একদিন বব্বর সাহুর গুণ্ডারা যখন তাঁকে খতম করতে এল এবং মারার জন্য ভোজালি, চাকু এবং পিস্তল নাচাতে নাচাতে যখন ঘিরে ফেলেছে প্রায়, আর মামা যখন দু'হাত তুলে 'মেরো না বাপু, মেরো না বাপু' বলে আর্তস্বরে চিৎকার করছেন তখনই গুণ্ডাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, আরে, এ তো অবনী তালুকদার নয়! অবনীর তো বাঁ-হাতে ছ'টা আঙুল! একে মারলে যে মহাপাতক হবে। আমার ছোট মামা ওই এক আঙুলের জন্যই বেঁচে গেলেন।

কিন্তু তাঁর ছ'নম্বর আঙুলটা গেল কোথায়?

তা কে বলতে পারে মশাই! আঙুল তো আর ঠিকানা রেখে যায়নি।

কিন্তু আঙুল তো আর অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না। ভগবানের দয়ায় আমাদেরও আঙুল নিয়েই বসবাস করতে হয়। কখনও শুনিনি যে, কারও হাত বা পায়ের আঙুল হঠাৎ করে গায়েব হয়ে গেছে। এ তো আর হাউনির ম্যাজিক নয়!

আচ্ছা ম্যাজিক হতে যাবে কেন? ম্যাজিকের কথা হচ্ছে না। আর হাউনি সাহেব কখনও আঙুল অদৃশ্য হওয়ার ম্যাজিক দেখাননি। তবে তিনি নিজে মাঝে মাঝে অদৃশ্য হতেন বটে।

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে বলুন তো!

আসলে ছোট মামা একটু বেখেয়ালী লোক। দেয়ালে পেরেক পুঁততে গিয়ে ওই ছয় নম্বর আঙুলটায় পেরেকের একটা খোঁচা লেগেছিল। উনি চোটটা তেমন গ্রাহ্য করেননি। পরে সেপটিক হয়ে আঙুলটা ফুলে যখন কলাগাছ না হলেও প্রায় ছোটখাটো মোচার সাইজ নিল তখনই, ডাক্তারেরা বললেন আঙুলটা কেটে বাদ না দিলে পরে হয়তো গোটা হাতটাই কেটে বাদ দিতে হবে। কারণ, মামার ওই ছয় নম্বর আঙুলটায় গ্যাংগ্রিনের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল।

তাহলে আপনি বলছেন যে, ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই করেন, তাই না?

না মশাই, চট করে একটা সিদ্ধান্তে লাফিয়ে পড়াটা ঠিক নয়। ভগবান যা করেন তা যদি মঙ্গলের জন্যই হবে তাহলে ছয় নম্বর আঙুলটা মামাকে দিতেই বা গেলেন কেন বলুন! পাঁচ আঙুলেই যখন সকলের দিব্যি কাজ চলে যাচ্ছে তখন এই বাড়তি আঙুলটা বড্ড বাড়াবাড়ি নয় কি?

সেটা ভেবে বলতে হবে।

তা ভাবুন না। ভাবতে কে বারণ করেছে?

ভেবে ফেলেছিও মশাই!

কী ভাবলেন?

ওই ছয় নম্বর আঙুলটা ভগবান দিয়েছিলেন বলে এবং শেষে সেটা কাটা পড়েছিল বলেই না বব্বর সাহুর গুণ্ডারা ওঁকে প্রাণে মারেনি। তাহলেই বুঝুন ভগবান মঙ্গলময় কিনা!

আহা, বব্বর সাহুর দিকটাও তো একটু ভাববেন। সে যে মামার খুনটা করাতে পারল না বলে নিজেই হাবু দাসের হাতে খুন হয়ে গেল, তার বেলা?

বব্বর সাহু কি খুন হয় গেছে নাকি মশাই?

তবে? ভগবান কিন্তু একচোখা মানুষ, বুঝলেন?

তবে আপনার ছোট মামাও কিন্তু বিশেষ ভালো লোক নয় কী বলেন?

ছোট মামার কথা আর বলবেন না। তাঁর কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। অবনী তালুকদারের নামে অগুন্তি ফৌজদারি দেওয়ানি মামলা ঝুলছে। রোজই বাড়িতে দিনে-রাতে পুলিশের আনাগোনা। তা আপনারা যেন কার খোঁজে এসেছিলেন?

নবজীবন রায়বিশ্বাস।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক। সেইসঙ্গে একটা আঁচিলেরও খোঁজ করেছিলেন যেন, তাই না?

যে আজ্ঞে। নাকের বাঁ-দিকে বড় একটা কালো আঁচিল। আপনার সেটা নেই।

তাহলে কি নাকের বাঁ-দিকে একটা বড় কালো আঁচিলওলা লোক হলেই আপনার চলবে? সেরকম লোক আমার হাতেই আছে। তবে দুঃখের বিষয় তার নাম নবজীবন রায়বিশ্বাস নয়।

বড্ড মুশকিলে ফেললেন মশাই। বেচু ঘড়াই পৈ পৈ করে বলে দিয়েছে টাকাটা ঠিকঠাক নবজীবন রায়বিশ্বাসের হাতেই পৌঁছোনো চাই।

টাকা! কিসের টাকা? কত টাকা? এসব আগে বলবেন তো?

আহা! উত্তেজিত হবেন না। শুধু টাকা শুনেই যদি এত উত্তেজিত হয়ে ওঠেন তাহলে টাকার অঙ্ক শুনলে যে আপনার হার্টফেল হবে! বরং এক গেলাস ঠান্ডা জল খেয়ে নিই।

আরে না মশাই, টাকাপয়সার ব্যাপার। সিরিয়াস কিনা। বেচু ঘড়াইটা কে বলুন তো আচ্ছা আপনারা কি চা খাবেন? সঙ্গে দুটো করে বিস্কুট?

আজ্ঞে না। কাজের সময় আমরা এসব খাই-টাই না।

আচ্ছা, টাকাটা তাহলে কত বলুন তো!

তা মন্দ নয়। দু'লাখ বত্রিশ হাজার।

ওরে বাবা! সে যে বেশ অনেক টাকা!

যে আজ্ঞে। কিন্তু আঁচিলটা ছাড়া যে টাকাটা হস্তান্তরের উপায় নেই নবজীবনবাবু। আঁচিল যে কী সাঙ্ঘাতিক জিনিস এবার বুঝুন। আহা হা, আপনি অমন হাউমাউ করে কান্নাকাটি জুড়ে দিলেন কেন?

দুঃখের কথা আর কবেন না মশাই! পাওনাদারদের ঠেলায় এই দুই সপ্তাহ আগে আঁচিলটা অপারেশন করে তুলে ফেলেছি, সিঁথি পালটে ফেলেছি। এখন আমি নবজীবন বললেও লোকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু যদি জানতাম—

তাহলে আজ আসি নবজীবনবাবু? টাকাটা দেওয়া গেল না বলে ভারি দুঃখ হচ্ছে। তবে এই নব জীবনটা আপনি বরং উপভোগ করুন।

সোনার তাল

ক্ষেতের কাজ শেষ করে সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে দাওয়ায় বসে জিরোচ্ছিলেন পটল নস্কর। হঠাৎ অন্ধকার উঠোনে দড়াম করে একটা মস্ত বড় তাল পড়ল, শব্দে বাড়িটা কেঁপে উঠল।

রান্নাঘর থেকে তার বউ বাতাসী চেঁচিয়ে উঠল, কী হল গো!

পটল বলল, তাল পড়েছে।

বাতাসী বলল, তোমার কি মাথা খারাপ? মাঘ মাসে তাল আসবে কোথা থেকে। আর আমাদের দুটো তাল গাছই তো সেই পুকুরের ধারে।

তাই তো! পটল নস্কর ঘর থেকে টেমিটা এনে উঠোনে নেমে যা দেখল তাতে তার চোখ ছানাবড়া, সোনাদানা সে চেনে না বটে, কিন্তু মস্ত গোলাকার হলদেটে রঙের চকচকে জিনিসটাকে তার সোনা বলেই মনে হল। টেমিটা রেখে বস্তুটাকে তুলতে গিয়ে দেখল, বেজায় ভারী।

বাতাসী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, ওটা কী গো?

পটল ঘাবড়ে যাওয়া গলায় বলল, সোনাদানাই তো মনে হচ্ছে।

সোনা! মরণ! সোনা আবার কোত্থেকে আসবে?

মাথা চুলকে পটল বলল, তাই ভাবছি।

বস্তুটা উঠোনে ফেলে রাখা ঠিক নয় বিবেচনা করে পটল সেটাকে কষ্টেসৃষ্টে তুলে ঘরে নিয়ে এল।

বাতাসী আরও একটা টেমি নিয়ে এল। দুটো টেমির আলোয় ভালো করে বস্তুটা দেখে পটল বলল মনে হয় উড়োজাহাজ থেকে ফসকে পড়ে গেছে। বাতাসী বলে দূর! উড়োজাহাজ গেলে শব্দ পেতুম না!

তাহলে? একি সত্যি সোনা নাকি?

তাই বা বলি কি করে? সোনা কি আর চিনি! আমরা গরিব মানুষ। তবে জিনিসটা তো আর আমাদের নয়। ঘরে রাখা কি ঠিক হবে?

সে তো বটে, কিন্তু ফেলেও তো দিতে পারা যায় না।

তাহলে বরং পুলিশকে খবর দিই! কী বলো?

তাই দাও বরং।

পরদিন সকালেই পটল নস্কর সাত মাইল দূরের থানায় গিয়ে হাজির হল। প্রথমে সেপাইরা তাকে ঢুকতেই দিতে চায় না। দারোগার সঙ্গে দেখা করতে চায় শুনে সেপাইরা তো প্রায় ঘাড় ধাক্কা দেয় আর কি! শেষমেষ

সে যখন বলল মশাই, সোনাদানার ব্যাপার আছে তখন সেপাইরা তাকে যেন একটু আগ্রহের সঙ্গেই বড়বাবুর কাছে নিয়ে গেল। দারোগাবাবু কাউকেই বড় একটা পাত্তা দেন না। কিন্তু সোনার তালের কথা শুনে তিনি মোটা শরীর নিয়েও শশব্যস্তে উঠে পড়লেন। টুপি পরতে পরতে বললেন, হরে চল চল, আর দেরি নয়। জিপগাড়িটা বের কর তাড়াতাড়ি...

ধুলো উড়িয়ে দারোগাবাবু পটলের বাড়িতে এলেন। সোনার তালটা দেখে বললেন, ওহে পটল, এটা আমি বাজেয়াপ্ত করলাম। তোকেও গ্রেফতার করতাম, কিন্তু আপাতত ছেড়ে দিচ্ছি। ব্যাপারটা পাঁচকান করার দরকার নেই। তাহলে কিন্তু বিপদে পড়বি, বুঝেছিস?

পটল বলল, যে আজ্ঞে।

দারোগাবাবু সোনার তাল নিয়ে চলে গেলেন।

বাতাসী বলল যার জিনিস তাকে কি আর ফেরত দেবে?

পটল বলল, যাকগে, যা খুশি করুক। আমাদের ঘাড় থেকে তো নেমেছে।

নিশুত রাতে হঠাৎ পটলের দরজায় কে যেন ধাক্কা দিল। ঘুম ভেঙে পটল বলল কে?

পটল, দরজা খোলো, দরকার আছে।

পটল গরিব মানুষ। চোর-ডাকাতের ভয় তার নেই। সে উঠে গিয়ে দরজা খুলে অবাক হয়ে দেখল, হাতে সোনার তালটা নিয়ে দারোগাবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। তার চোখ-মুখ ভয়ে সাদা। কাঁপতে কাঁপতে বললেন, বাবা পটল, তোমার সোনার তাল ফেরত নিয়ে আমাকে রেহাই দাও।

পটল শশব্যস্তে বলল, আজ্ঞে ওটা যে আমার নয় দারোগাবাবু।

দারোগাবাবু ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললেন, সে আমি জানি না। সোনার তাল থানায় নিয়ে যাওয়ার পর যে কী কাণ্ড শুরু হল, বলার নয়। হঠাৎ আকাশ থেকে একটা পেটমোটা খাস্তা কচুরির মতো দেখতে বিরাট একটা জিনিস নেমে এল। আর তা থেকে পিল পিল করে এক দেড় হাত লম্বা মতো কিম্ভুত চেহারার লোক নেমে এসে কী অত্যাচার রে বাবা। চুল ধরে টানছে, ল্যাং মেরে ফেলে দিচ্ছে, গ্যাট্টা মারছে, কাতুকুতু দিচ্ছে, বুকের ওপর বসে নাচানাচি করছে। দেখতে ছোট হলেও তাদের গায়ে বেজায় জোর। আমরা তো কয়েক মিনিটেই কাহিল। শেষে তাদের সর্দার এসে আমার বুকে একটা বন্দুকের মতো জিনিস ঠেকিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বলল ওটা আমরা একজন গরিব আর ভালো লোককে পুরস্কার দিয়েছি। তোমরা ওটা এনে খুব অন্যায় করেছ। যদি ফেরত না দাও তাহলে তোমাদের দুর্দশার সীমা থাকবে না।

পটল আর্তনাদ এর উঠল, কিন্তু দারোগাবাবু, আমি যে মোটেই ভালো লোক নই।

তা বললে হবে কেন বাপু? তারা পরিষ্কার বলেছে সারা পৃথিবী খুঁজে তারা দশ জন ভালো লোককে বেছে বের করেছে। সবাইকেই একটা করে সোনার তাল দিয়েছে। এখন বাপু তোমার জিনিস তুমি ফেরত নাও।

কিন্তু বড়বাবু, এরা সব কারা?

ওরে বাপু এরা আমাদের দুনিয়ার লোক নয়। আকাশে আরও কত পৃথিবী আছে কে জানে। সেখান থেকেই এসেছে। এখন বাপু, জিনিসটা নিয়ে আমাকে বাঁচাও।

পটল তালটা নিল। লাজুক মুখে বলল, আজ্ঞে আমি গরিব মানুষ এ নিয়ে কী করি।

সে তোমার মাথাব্যথা। আমি চললুম।

দারোগাবাবু চলে যাওয়ার পর পটল অন্ধকার উঠোনটার দিকে চেয়ে হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

জাম্বোর নামডাক

কালীপদ সেন হলেন গিয়ে তারানাথ মেমোরিয়াল স্কুলের ইংরিজির মাস্টারমশাই। মেলা ইংরিজি জানেন বলে পাঁচটা গাঁয়ে তাঁকে সবাই মান্যগণ্য করে। তা সাহস করে এক সন্ধেবেলায় তাঁর কাছে হাজির হয়ে জাম্বো হাতজোড় করে বলে, প্রাতঃপেন্নাম হই কালীবাবু। অধমের আপনার শ্রীচরণে একটু নিবেদন ছিল।

গ্রীষ্মকাল, কালীমাস্টার দাওয়ায় মোড়া পেতে বসে হাতপাখায় হাওয়া খাচ্ছেন। বললেন, বলে ফেল বাপু।

আজ্ঞে, জাম্বো কথাটার মানে কী একটু বলবেন?

কালীপদবাবু ভ্রু কুঁচকে বলেন, সে কি হে! নিজের নামের মানে নিজেই জানো না! অথচ নামটা দিব্যি বয়ে বেড়াচ্ছ!

আজ্ঞে, আমার মা বাপের তো মোটে বিদ্যে নেই, তারা নাম রেখেই খালাস। কিন্তু নামটার একটা দায় তো আছে, ঠিক কিনা বলুন!

তা বটে, আমি যতদূর জানি, জাম্বো হল বড়সড় জিনিস। এই যেমন জাম্বো হাওয়াই জাহাজ, জাম্বো আইসক্রিম, জাম্বো সাইজের কলা।

তার মানে তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে আমি একজন বড়সড় লোক?

তাই দাঁড়ায় বটে।

কালীমাস্টারকে একটা পেন্নাম ঠুকে জাম্বো খুশি মনে বাড়ি ফিরে এল। যাক এতদিনে নামটার একটা হেস্তনেস্ত হয়ে গেল।

সকালে ঘাটের পৈঠায় পা ঘষছিল খগেন মান্না। আর জাম্বো পুকুরঘাটের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁতন করছিল। নামের বৃত্তান্ত শুনে খগেন বলে, আহা, নাম জম্পেশ হলেই কী হয় রে? নামে মাঞ্জা না দিলে জেল্লা কি ফোটে?

জাম্বো একটু ফাঁপড়ে পড়ে বলে, ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা হয় জানি। নামের মাঞ্জা ব্যাপারটা কী একটু খোলসা করে বলো তো!

গিরিধারী পল্যেকে চিনিস তো? তারা মা অপেরার মায়ের কান্না পালায় কানা বৈরাগীর পার্ট করে যেমন কাণ্ডটা করল। এখন দশটা গাঁয়ে-শহরে-গঞ্জে লোকের মুখে শুধু গিরিধারীর নাম। তারপর ধর ভোলা মণ্ডল। হাল বলদ নিয়ে ক্ষেতের কাজে নাকাল হচ্ছিল। কেউ চিনত তাকে? সন্ধেবেলা ঢোল বাজিয়ে একটু

গানবাজনা করত। একদিন সেই ঢোলের চাঁটি শুনে এক ভদ্রলোক গাড়ি থামিয়ে নেমে এলেন। আর ভোলাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন কলকাতায়। এখন ঢোলকদার হিসেবে সারা দেশে ভোলা মণ্ডলের নাম। এবার বুঝলি নামে মাঞ্জা দেওয়া কাকে বলে!

শুনে জাম্বো একটু ভাবনায় পড়ে গেল। তাই তো! কথাটা তো ভাববার মতোই কথা। শুধু জাম্বো হয়ে থাকলে তো পেখমছাড়া ময়ূর। তার আর দামটা কী?

গাঁয়ের মাতব্বর নবীন দাসের একটা সম্পত্তির মামলায় গতবার সাক্ষী দিয়েছিল জাম্বো। সেই থেকে নবীনের সঙ্গে তার একটু খাতির। তা নবীন সব শুনে টুনে বলল, বুঝেছি, তোর শুধু নাম হলেই চলছে না, সঙ্গে একটা ডাকও চাই। মানে তুই নামডাকওলা একজন হতে চাস তো!

হলে মন্দ হত না দাদা।

তা সে আর বেশি কথা কি? সজনেহাটি গাঁ তো বেশিদূর নয়। মেরেকেটে মাইল তিনেক হবে। সেখানকার মা শীতলা ক্লাব সামনের রোববার কদলী ভক্ষণ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে। পাঁচ টাকা এন্টি্র ফি। যা গিয়ে নাম লিখিয়ে আয়। যদি জিততে পারিস তাহলে বেশ নামডাক হবে খন। পাঁচটা টাকার তো মামলা, আর তুই বেশ তাগড়াইও আছিস। দুগ্গা বলে লেগে যা।

জাম্বো ব্যাপার শুনে মোটেই খুশি হল না। গাঁয়ের নিমাই সাধু গতবারই কদলী ভক্ষণ জিতে একটা রুপোর মেডেল পেয়েছিল। কিন্তু নিমাইকে তো পোঁছেও না কেউ। সাইকেল সারাইয়ের দোকানে সে এখন লিক সারায়। মেডেলটা বেচতে নিয়ে গিয়েছিল, স্যাঁকরা বলেছে, ও মোটে রুপোই নয়, হোয়াইট মেটাল।

গাঁয়ের জ্ঞানী মানুষ হলেন পতিতপাবন ঘোষ। শোনা যায় বেদ-বেদান্ত গুলে খেয়েছেন। তিথিনক্ষত্র, খনার বচন, শুভঙ্করী সব ঠোঁটস্থ। লোকে বেশ মানে গোনে। তা তিনিও সকালবেলা বসে পঞ্জিকা দেখছিলেন, এমন সময় জাম্বো গিয়ে পেন্নাম ঠুকে সামনেই বসে পড়ল। সমস্যাটা শুনে বললেন, ডান হাতটা একটু চ্যাটালো করে পাত তো। কর রেখাটা একটু দেখি।

তা দেখলেন। মন দিয়েই দেখলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, নাম না হওয়ার তো কারণ দেখছি না।

জাম্বো উজ্জ্বল হয়ে বলে, তাহলে হবে বলছেন পণ্ডিতমশাই?

হবে বলিনি। বলেছি না হওয়ার তো কারণ দেখছি না। লেগে থাকলে

হতে পারে।

তাহলে একটু উপায় বাতলে দিন।

ওরে, নাম করার উপায়ের অভাব কী? লোকে খুন-খারাপি, চুরি-ডাকাতি করেও নাম কিনে ফেলছে। তুই ভালো করে ভেবে দ্যাখ তোর কোন দিকে ঝোঁক। যেদিকে হাতযশ আছে বুঝবি তাইতেই লেগে যাবি। পট করে নাম হয়ে যাবে।

কথাটা তেমন ভরসার কথা নয়। তবু জাম্বো মিনমিন করে বলে, ভাবনা চিন্তাটাই যে আমার আসতে চায় না পণ্ডিতমশাই। মাথাটা বড্ড নিরেট।

রোজ ব্রাহ্মী শাক খা। মাথায় ভাবনাচিন্তার এমন ভাসাভাসি হবে যে, ভেবে কূল পাবি না।

ব্রাহ্মী শাকও সোনা হেন মুখ করে খেতে লেগে পড়ল জাম্বো। কিন্তু তেমন সুবিধে কিছু হল বলে টের পেল না।

নরহরি গুঁই মেলা তুকতাক জানে, মড়ার খুলিতে করে রোজ চা খায়, মাটিতে দাগ কেটে অব্যর্থ বাণ মারতে পারে, মারণ উচাটন জানে, বশীকরণ তার কাছে জলভাত। জাম্বোর সমস্যার কথা নরহরিও খুব মন দিয়ে শুনল। তারপর মুখ খোলার আগে পঞ্চাশ টাকা চেয়ে বসল। বলে, ওরে, দক্ষিণা না দিলে যে আমার মুখ থেকে লাগসই কথা বেরোতেই চায় না।

জাম্বো হাতেপায়ে ধরে কুড়ি টাকায় রফা করল। নরহরি বলল, তোর সবই তো ভালো দেখছি, তবে রাহু ব্যাটা বক্রী হয়ে বসে আছে। সেটাকে ঢিট করতে হলে তো একটা যজ্ঞ না করলেই নয়। খরচাপাতি আছে কিন্তু।

তা জাম্বো ফের হাতেপায়ে ধরে কম খরচেই যজ্ঞ করাল। কিন্তু বাঁকা রাহু সটান হল কিনা তা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

তবে সে যে একটা নামডাকওলা লোক হতে চায় সেটা গাঁয়ে বেশ চাউর হয়ে গেল। সবাই ডেকে ডেকে জিগ্যেস করে, হ্যাঁ রে জাম্বো, তুই নাকি নামকরা লোক হতে চাস?

জাম্বো কাঁচুমাচু হয়ে বলে, তা ইচ্ছে তো যায় মশাই, কিন্তু তেমন সুবিধে হয়ে উঠছে না।

নানা লোক নানা পরামর্শ দেয়। তার কিছু কিছু করেও দেখেছে জাম্বো, কিন্তু তাতে তার নাম তেমন ফাটছে বলে মনে হচ্ছে না তো!

মনটা বড্ড খিঁচড়ে আছে জাম্বোর। তা সেদিন বিষয়কর্মে নসীবপুরে যেতে হয়েছিল জাম্বোর। ফকির শা-র পাইকারি দোকান থেকে মাল কিনতে হবে। ফকির শা-র দোকানে বেজায় ভিড় থাকে। তা সে ভিড়ের পিছন দিকটায় দাঁড়াতেই সামনের লোকটা বলে উঠল, আরে, তুমি সেই কুসুমপুরের নামডাকওলা জাম্বো না? তা কি খবর হে, নামডাক হল?

জাম্বো লোকটাকে চেনে না। তেতো মুখে বলল, কই আর হল মশাই!

আর একটা লোকও সামনে থেকে বলে উঠল, হ্যাঁ, আমারও কেমন যেন চেনা চেনা ঠেকছিল বটে! তাই তো, এ হল গে কুসুমপুরের নামডাকের জাম্বো। তা পিছনে কেন ভাই, সামনে এসো, জায়গা করে দিচ্ছি।

কপালটা ভালোই বলতে হবে। অত বড় কারবারী ফকির শা অবধি চিনতে পারল তাকে। দূর থেকেই বলল, ওরে, ওই দ্যাখ নামডাকওলা জাম্বো এসেছে, তোরা ওকে মালপত্র দিয়ে ছেড়ে দে তাড়াতাড়ি।

জাম্বো তাজ্জব।

এখানেই ব্যাপারটার ইতি হল না। মিঠিপুরের হাটে গেছে সেদিন পাটের গুছি কিনতে, সে ঢুকতেই হাটে একটা ঢেউ উঠে গেল। 'ওরে, ওই দ্যাখ নামডাকওলা জাম্বো এসেছে।' ব্যাপারীরা অবধি ভারি খাতির করে মালপত্র গস্ত করে দিল।

এখন যেখানেই যায় জাম্বো, লোকজন তাকায়, তাকে নিয়ে বলাবলি করে। হাসাহাসিও করে বটে। তা করুক, তবু নামটা তো ফেটেছে!

তার বাপ কালোহরি একদিন বলেই ফেলল, ওরে জাম্বো, বাপ আমার! নামডাকের জন্য হেঁদিয়ে মরছিলি, এখন দ্যাখ তোর কেমন নামডাক হয়েছে।

সেয়ানে সেয়ানে

এই রে! বাবু কি জেগে আছেন নাকি?

জেগে আছি কি আর সাধে রে বাপু! এই তোদের মতো চোর ছ্যাঁচোড়দের জ্বালায় জেগে থাকতে হয়।

তা বাবু, দুনিয়ায় চোর ছ্যাঁচোড়দেরও তো টিঁকে থাকতে হয় কিনা। কিন্তু এই মাঝরাত্তির অবধি রোজ জেগে থাকলে কি আপনার শরীরে সইবে কর্তা? হজমে গোলমাল হবে, বায়ুর ঊর্ধ্বগতি হবে, পেট ফাঁপবে, অনিদ্রায় ধরবে, ঠিক কিনা!

ওঃ,আমার জন্য যে তোর দরদ একেবারে উথলে উঠল! তা এতই যদি দরদ তাহলে আমার বাড়ির আশপাশে নিশুত রাতে ঘুরঘুর করিস কেন? রাত জেগে তোর পেটে কি বায়ু হয় না? নাকি তোকে বদহজম বা অনিদ্রায় ধরে না?

কী যে বলেন বাবু! আমাদের শরীর কি আর মনিষ্যির শরীর! তবে কথাটা বড্ড জব্বর বলেছেন। এই সব অধর্মের কাজ করা আমাদের উচিত হচ্ছে না। দিনে ঘুমনো, রাতে জাগা, পরের জিনিস হাতিয়ে নেওয়া, এসব কি আর ভালো কাজ কর্তা? মাঝে মাঝে ভারি চিন্তা হয়, যমরাজা যখন জেরা করবে তখন কী জবাব দেব?

ওঃ, একেবারে ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির এলেন! তা এত টনটনে ধর্মজ্ঞান নিয়ে চুরি ধারি করিস কেন? গতর খাটালে কি ভাত জোটে না?

আজ্ঞে সেসবও কি ভাবিনি বাবু? তবে এ হল সেই বাপ পিতেমোর বৃত্তি। বাপ দাদাকেও দেখেছি কিনা। দিনমানে পড়ে পড়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমত, আর নিশুতরাতে সিঁধকাঠি আর আরও সব যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরোত, পাপ-তাপ কাটানোর জন্য কার্তিক ঠাকুর আর মা কালীর পুজোও করত।

বাপ রে! তুই তো চোর-বংশের ছেলে!

আজ্ঞে। তা বংশ তেমন খারাপ ছিল না। ঠাকুর্দা পীতাম্বরের ভারি নামডাক ছিল, দারোগাবাবু অবধি খাতির করে কথা কইত, বাপ জনার্দনও বেশ নাম করেছিল। আমারই তেমন হাতযশ হল না, এটাই দুঃখ।

আহা, দুঃখের কি? তোর এখনও তো বয়স পড়ে আছে।

তা আছে। তবে বয়স পাকলেই কি হাতও পাকবে? এই যে আপনার কাছে আজ ধরা পড়ে গেলুম, আমার বাপ-দাদা হলে কি পড়ত?

ধরা পড়েছিস! ধরা পড়লি কোথায়? তুই জানলার বাইরে, আর আমি ঘরের মধ্যে।

না, জাপটে হয়তো ধরেননি, পুলিশও ডাকেননি, কিন্তু একরকম ধরেই তো ফেললেন, এটাও তো লজ্জার কথা! পাঁচজন যে দুয়ো দেবে আমাকে।

ওরে, ঘাবড়াসনি। আমি তো আর থানা পুলিশ করতে যাচ্ছি না। সেই মতলবে রাত জেগে বসে আছি বলে ভেবেছিস নাকি?

না কর্তা, থানা-পুলিশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভালো। এই অনেকটা বাপ-ছেলের মতোই। তারা আমাদের ভালো-মন্দ দেখে, আমরাও তাদের ছেদ্দা-ভক্তি করি, ও নিয়ে ঘাবড়াচ্ছি না। এই যে আপনার নজরে পড়ে গেলুম তাতেই জিব কাটতে ইচ্ছে যাচ্ছে। তেমন তেমন চোরকে ধরা ছোঁয়া দূরে থাক, চোখের দেখাটাও শক্ত ব্যাপার কিনা, তাই একটু একটু আত্মগ্লানি হচ্ছে কর্তা।

আত্মগ্লানি ভারি ভালো জিনিস, বুঝলি! আত্মগ্লানি হলেই চট করে মানুষের উন্নতির পথ খুলে যায়। এই আমার কথাই ধর না, ক্লাস সিক্স-এ ফেল করে বাবার মারের ভয়ে আত্মগ্লানিতে নদীতে ঝাঁপ দিলুম মরব বলে। কিন্তু মরব কি, কিছুতেই ডুবজল পাচ্ছি না, পায়ের তলায় কী যেন ঠেকছে। তখন হাতড়ে হাতড়ে জিনিসটা তুলে এনে দেখি, একজন বুড়ো মানুষ। কী আর করা, তখন বুড়োর পেট চেপে জল বার করতে হল। বুড়োও কঁৎ করে শ্বাস ছেড়ে উঠে বসে বলল, বাবা, তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ, তোমার জন্য কী করতে পারি বলো। আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললুম, আমার জন্য আর কারও কিছু করার নেই মশাই। আমি ক্লাস সিক্সে ফেল করেছি। আমার আর বাঁচার ইচ্ছে নেই! তখন উনি বললেন, ক্লাস সিক্সে তো! ওতে তো বেশিরভাগই ফেল মারে, আমি ক্লাস সিক্সেই ফেল করেছিলাম। তা তুমি আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমার একটা হিল্লে করে দেব।

তা দিল নাকি হিল্লে করে, কর্তা?

তাহলে আর বলছি কী? সেই বুড়োই আমার দাদাশ্বশুর হল কিনা। তারই বাড়িঘর, জমিজমা ভোগ করছি, বুঝলি?

তা বাবু, আপনার বাড়িতে তো আজ আর সুবিধে হল না। তা আমাদেরও তো বিষয়কর্ম আছে! তাহলে আজ আসি গিয়ে? নমস্কার।

ওরে দাঁড়া দাঁড়া, সবে গৌরচন্দ্রিকা করেছি, কথাটা শেষও হয়নি ভালো করে, এর মধ্যেই চলে যাচ্ছিস যে বড়! বলি অদ্রতা ভদ্রতা বলেও কি কিছু নেই নাকি রে? তা তুই ভাবলি কী? আমারও কি বিষয়কর্ম নেই নাকি? এই রাত জেগে কি এমনি এমনি বসে আছি? চোর ছ্যাঁচড়াদের সঙ্গে রঙ্গ রসিকতা করব বলে?

কী যে বলেন কর্তা! আমাদের মতো অধম মনিষ্যিদের সঙ্গে আপনার মতো মানুষের কি আর বিষয়কর্ম থাকতে পারে বলুন।

আহা, চোর বলে কি আর পচে গেছিস নাকি? ভালো করে ভেবে দেখলে সমাজে চোরও ফ্যালনা নয়। তারাও দেশের কাজই করে। তবে কিনা ঘুরপথে। থেমে-থাকা টাকারে ওরাই তো সচল করে, তাতে ব্যবসা বাণিজ্যের সুসার হয়, দেশের সম্পদ বাড়ে।

বটে কর্তা! এ তো তাজ্জব কথা শুনছি!

হক কথা শুনলে অনেক সময়ে আজব লাগে বটে। তবে যা বলছি একেবারে ন্যায্য কথা।

তা বাবু, কথাটা কী?

কথাটা অতিশয় গুহ্য। পাঁচকান যেন না হয়!

আজ্ঞে, মা কালীর দিব্যি।

ব্যাপারটা হল আমার দাদাশ্বশুর যা কিছু দিয়ে থুয়ে গেছে তা ওই নিজের নাতনির নামে। আমার দাদাশ্বশুর নিতাইপদ দাস অতি ঘুঘু লোক ছিল, বুঝলি। তার নাতনির সঙ্গে বিয়ে ইস্তক আমি একরকম ঘরজামাই হয়ে আছি বটে, কিন্তু ভারি হাততোলা হয়ে থাকতে হয়। ইচ্ছেমতো কানাকড়ি খরচা করার উপায় নেই। নিতাইপদর নাতনি, অর্থাৎ আমার বউ বাতাসীও ভারি হুঁশিয়ার মেয়ে, দাদুর মতোই, বাজার করার

খরচা দিলে পাই পয়সার হিসেব নেয়, এক পয়সা এদিক-ওদিক হওয়ার জো নেই। তাই জীবনটায় ঘেন্না ধরে গেছে। বুঝতে পারলি কিছু?

একটু একটু যেন পারছি কর্তা। আর একটু ভেঙে বলুন।

বাতাসী হুঁশিয়ার মহিলা বটে, কিন্তু ঘুমলে একেবারে কাদা। পটকা ফাটালেও তার ঘুম টসকায় না। তার আঁচল থেকে চাবিটা খসিয়ে নিয়ে সিন্দুকটা খুলে, বেশি নয়, এক বান্ডিল টাকা সরিয়ে নিবি বাপু? তোকে না হয় ওর থেকে দশটা টাকাই দেব।

মোটে! বান্ডিলে কত থাকার কথা?

ওরে, সে বেশি নয়, হাজার দশেক হবে মেরে কেটে। এ বাজারে সে আর কত টাকা?

তাহলেই বুঝুন, দশ টাকা এ বাজারে আরও কত কম! চোখেই দেখা যায় না।

আহা, না হয় পঞ্চাশই পাবি।

না মশাই ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে পারব না। আমার সময় নষ্ট হচ্ছে। ও কাজ তো আপনি করলেই পারেন।

চেষ্টা কি আর করিনি রে বাপু। কী জানিস, আমি কাছাকাছি গেলেই বাতাসী যেন আমার গায়ের গন্ধ পায়। বাড়ি ভর্তি ছেলে-মেয়ে আত্মীয়দের সামনে এ বয়সে হেনস্থা হতে কার ভালো লাগে বল।

সে আপনি যাই বলুন, পাঁচ হাজারের নীচে হবে না। রাজি থাকলে বলুন, আমার সময় নষ্ট হচ্ছে।

তাহলে দু'বান্ডিল সরাস।

তাহলে দশ হাজার।

তুই তো ভারি সেয়ানা দেখছি।

সে তো আপনিও কর্তা। রাজি?

অগত্যা। আয় বাপু, পাছদুয়ারটা খুলে দিচ্ছি।

যে আজ্ঞে।

একটি দিন

১৯৫৩। শীতকাল। জানুয়ারি।

প্রফেসর চক্রবর্তী ক্লাস থেকে চলে যাওয়ার সময় শান্তর দিকে তাকিয়ে বললেন—এই পিরিয়ডের পরই খেলা অ্যারেঞ্জ করো। ইটস এ পারফেক্ট ডে ফর ক্রিকেট।

শান্ত মাথা নাড়ল। তার চোখ দু'খানা বড় বড়, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা কোঁকড়ানো কালো চুল, গায়ের রং মাজা, একটু বেঁটে, কিন্তু সুপুরুষ। তার স্বভাব ঠান্ডা, মুখে কথা খুবই কম। সে ত্রিপুরার রাজবাড়ির আত্মীয়, আসামে তাদের বিশাল ব্যবসা।

প্রফেসর চক্রবর্তীর পিছু পিছু ক্লাসের ছ'টা রোগা, নিষ্প্রাণ লাজুক মেয়ে সারবদ্ধভাবে তাদের কমনরুমে চলে যায়। তারপর ছেলেরা নিয়মমতো হৈ-হৈ করতে থাকে।

খেলা মানেই ছুটি নয়। শুধু খেলোয়াড়দের ছুটি। টিম তৈরি করার সম্পূর্ণ ভার শান্তর ওপর। কাজটা খুব সহজ নয়। ক্লাস ছেড়ে অনেকেই খেলার মাঠে যেতে রাজি হয় না। পারসেনটেজের ভয় তেমন নেই, কারণ সেটা পরে প্রফেসর চক্রবর্তী ম্যানেজ করেন। কিন্তু পড়াশুনোয় ফাঁকি দিতে অনেকেই তেমন রাজি নয়। ক্রিকেট-পাগল চক্রবর্তীর পাল্লায় পড়ে ক্রিকেট খেলুড়েদের রোজ ক্লাস মার যাচ্ছে।

শান্ত তার ফোর্থ ইয়ারের পাঁচজনকে ইশারা করল। অনুগত এই পাঁচজন কোনোদিনই আপত্তি করে না। কিন্তু দরকার বাইশজন। অন্য ইয়ার থেকে নিতে গেলেই মুশকিল বাধে।

শান্ত বারান্দায় বেরিয়ে এসে চারদিকে চাইল। সামনেই চমৎকার সবুজ মাঠ ঘিরে বাগান। গাদা গাদা ক্রিসেনথিমাম ডালিয়া ফুটে আছে। চোখ জুড়িয়ে যায়।

শান্ত একটা নতুন ছেলের কথা ভাবছিল। সদ্য ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছে। রোগা, সাদা, লম্বা চেহারা। ভারি লাজুক আর অপ্রতিভ ধরনের ছেলে। খুব নার্ভাস। ছোকরা যে ক্রিকেট বা খেলাধুলোর কিছু জানে তা দেখলে মনেই হয় না। বরং কবি কবি ভাব আছে একটা।

শান্ত ছোকরাকে প্রথম নজর করে এক অদ্ভুত ঘটনা থেকে। সেদিনও খেলা চলছিল। মাঠের বাইরে শীতের রোদে অনেকে গুলতানি করছে। চঞ্চল মিত্র-র হাতে ব্যাট। মহা মারকুটে খেলোয়াড়। একটা লোফফা বল পেয়ে চঞ্চল সেটা অফ-ড্রাইভ মেরেছে। এত জোরে যে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু সেটা আদতে ছিল ক্যাচ।

অফের ফিলডসম্যান বলের গতি দেখে ধরার চেষ্টাই করেনি। বেকায়দায় ধরতে গেলে হাতের তেলো ফাটিয়ে বা আঙুলের হাড় মটকে সেটা বেরিয়ে যেত। জোরালো মারের বলটা ছোট মাঠ পেরিয়ে বিদ্যুৎবেগে সোজা যাচ্ছিল যেখানে প্রফেসর দেবনাথ, প্রফেসর সরকার আর প্রফেসর দত্ত বসে গভীরভাবে কিছু আলোচনা করছিলেন। দেবনাথের পিঠে বলটা গিয়ে নির্ঘাত লাগত। সেই আশঙ্কায় দু'-একজন চেঁচিয়েও উঠেছিল। শান্ত অবাক হয়ে দেখল, রোগা ফর্সা ও দুর্বল চেহারার সেই ছেলেটা হঠাৎ কোত্থেকে ভুঁইফোঁড় উঠে এসে খুব হেলাফেলায় বলটা লুফে নিয়ে মাঠের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। তারপর গিয়ে বসল কয়েকজন বন্ধুর মাঝখানে শীত-দুপুরের আড্ডায়।

ছোকরাটি কে, এই প্রশ্ন তখনই মাথায় খেলেছিল শান্তর। খেলার পর খোঁজ নিতে গিয়ে দেখল, ছোকরাকে আদতে কেউই প্রায় চেনে না। অনেককে জিজ্ঞেস করতে করতে অবশেষে কে একজন বলল—ও বোধহয় ফার্স্ট ইয়ার আর্টসের ছাত্র কুশল। হোস্টেলে থাকে।

শান্ত বর্মন নিজেও হোস্টেলে থাকে। দু'নম্বর ব্লকের দক্ষিণ কোণের ঘরে তার রাজসিক বিছানা, চমৎকার সাজানো টেবিল। প্রচুর বকশিস পায় বলে হোস্টেলের চাকর-বাকরেরা তার ব্যক্তিগত চাকরের মতো খেটে দেয়। রোজ ভালো হোটেল থেকে তার জন্য খাবার-দাবার আসে। সবাই জানে, শান্ত বিরাট বড়লোকের ছেলে, রাজবাড়ির আত্মীয়। কারো সঙ্গে হুটোপাটি করে মিশতে পারে না শান্ত। তার ব্যক্তিগত বন্ধুবান্ধব আছে কয়েকজন, তাদের সঙ্গেই আড্ডা মারে। তবে ভালো স্বভাবের দরুন সে প্রায় সকলেরই প্রিয়। তার বিরুদ্ধে কারো কিছু বলার নেই। মাঝে মাঝে সে দেদার খরচ করে হোস্টেলের ছাত্রদের ফিস্টির আয়োজন করে।

সেই রাতেই শান্ত খোঁজখবর করে জানল, কুশল ভট্টাচার্য এক নম্বর ব্লকের নীচের তলায় ছাব্বিশ নম্বর ঘরে থাকে। চাকরকে দিয়ে তাকে ডাকাল শান্ত।

ভারি লাজুক আর ভীতু ছেলেটা খুবই নার্ভাস অবস্থায় রাত আটটা নাগাদ শান্তর ঘরের দরজায় উঁকি দিয়ে বলল—আপনি ডেকেছেন?

শান্ত খুব স্নেহভরে ডাকল—এসো।

ছেলেটা এল, দাঁড়িয়ে রইল। মুখে-চোখে একটা অনিশ্চিত ভয়-ভয় ভাব। শান্ত তার ডেসকের খোপ থেকে দুটো কমলালেবু বের করে ছেলেটার হাতে দেয়। কেউ এলে তাকে কিছু দিয়ে আপ্যায়ন করাটা তার পরিবারগত, জন্মগত অভ্যাস।

ছেলেটা লজ্জা পায়, কিন্তু নেয়।

শান্ত খুব নীচু গলায় জিজ্ঞেস করে—তুমি ক্রিকেট খেলতে জানো?

—একটু-আধটু।

—এত রোগা কেন?

চেহারা সম্পর্কে ছেলেটার কমপ্লেক্স আছে বোধহয়। 'রোগা' কথাটা শুনে খুব লজ্জিত হয়ে পড়ল।

শান্ত খুব স্নিগ্ধ হেসে বলল—রোগারা অবশ্য বেশ চটপটে হয়।

ছেলেটা কথা বলছিল না। মৃদু হাসছিল শুধু। কিন্তু শান্ত টের পায়, লজ্জা ঘুচলে ছোকরা বিস্তর কথা বলবে।

সেই দিন আর বেশি কথা হয়নি।

আজ টিম করার সময় শান্ত সেই ছেলেটার কথা ভেবে ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাসঘরের সামনে আসে।

কলেজের সব ছেলেই একবাক্যে শান্ত বর্মনকে চেনে। কলেজ ক্রিকেট টিমের ক্যাপটেন এবং বড়লোক বলে তো চেনেই, আর চেনে তার শ্যামবর্ণ, বেঁটে, কিন্তু অসম্ভব অভিজাত চেহারার জন্য। সে যে বড় বংশের ছেলে তা দেখলেই যে কেউ টের পায়।

ফার্স্ট ইয়ারে ক্লাসে কিছু হৈ চৈ চলছিল, শান্ত দরজায় দাঁড়াতেই গোলমালটা মন্ত্রবলে থেমে যায়। শান্ত দৃকপাত না করে নৈর্ব্যক্তিকভাবে ক্লাসঘরের ভিতরে চেয়ে মৃদু গলায় বলে—কুশল আছে?

—এই তো কুশল! থার্ড বেঞ্চ থেকে কয়েকজন ছেলে ঠেলেঠুলে কুশলকে দাঁড় করিয়ে দেয়।

শান্ত তার দিকে চেয়ে গম্ভীর মুখে বলে—একবার মাঠে এসো, কাজ আছে।

বলেই শান্ত আবার ধীর পদক্ষেপে খেলোয়াড় জোগাড় করতে রওনা দেয়।

ভিক্টোরিয়া কলেজ আর জেংকিনস স্কুলের মাঝ বরাবর চমৎকার ঢালু মাঠ শীতের রোদে মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে। মাঝখানে সযত্নে তৈরি করা ক্রিকেটের পিচ।

এবার শীত পড়েছে সাঙ্ঘাতিক। এই দুপুরেও হিম হাওয়া টেনে নিচ্ছে রোদের তাপ। দক্ষিণ দিকে মিশনারি স্কুল, পাশে বিশাল রাসমেলার মাঠ। শীতের দুপুরে টিফিনের ছুটিতে চারদিকে পিল পিল করছে ছেলেরা।

মাঠের পাশে বটগাছতলার প্যাভিলিয়নে রাশিকৃত প্যাড, ব্যাট, স্টাম্প জড়ো হয়েছে। পূর্বোক্ত বাইশজন খেলোয়াড়। অফ পিরিয়ডে ছেলে-মেয়েরা বইখাতা হাতে আড্ডা মারতে এসে বসছে মাঠের সীমানার বাইরে।

কুশল প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেছে। শান্ত বর্মন তাকে মাঠে কেন ডেকেছে তা খানিকটা বুঝেছে সে। সেইদিন সেই যে ক্যাচটা ধরেছিল সেটাই বুমেরাং হয়ে ফিরে এল বুঝি! সেদিন কেউ সশব্দে বাহবা দেয়নি বটে, কিন্তু কুশল টের পেয়েছিল সে বেশ শক্ত একটা ক্যাচ ধরেছে।

ছেলেবেলা থেকেই তার দুরারোগ্য এক লজ্জা। পাঁচজন লোকের সামনে, অচেনাদের সামনে সে আপনা থেকেই কুঁকড়ে যায়। তার তখন কথা আসে না, হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে আসে। বিস্তর ভুগেছে সে এর জন্য। এই ষোলো এবং সতেরোর মাঝামাঝি বয়সে সে বুঝে গেছে, এই দুরারোগ্য লজ্জা আর স্নায়ুদৌর্বল্যের জন্যই এ-জীবনে সে কিছু করতে পারবে না। নইলে সে ক্রিকেট কিছু খারাপ খেলে না। মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় প্রথম প্রথম লজ্জায় সে কাউকে বলতে পারেনি যে, সে ক্রিকেট বা ফুটবল খেলতে পারে। একদিন হঠাৎ একটা ছিটকে আসা ফুটবলে শট মেরে সেটা আবার মাঠের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছিল সে। সেইদিনই তার শটের ভঙ্গি দেখে জোর করে ছেলেরা তাকে মাঠে নামায়। মন্দ খেলেনি সেদিন। পরে সংকোচ চলে যাওয়ায় সে অপ্রতিরোধ্য সেন্টার ফরোয়ার্ড হয়ে উঠেছিল। স্কুলে সে ক্রিকেটও খেলেছে পাকা হাতে। তবে কোনওদিনই ম্যাচের সময় মাঠে নামেনি। দলে নাম থাকা সত্ত্বেও সে পালিয়ে ফিরেছে।

আসলে কুশল ভালোবাসে কবিতা, গল্প, উপন্যাস পড়তে, ভালোবাসে ভাবতে, একা থাকতে। স্কুল থেকেই তার হোস্টেল জীবনের শুরু। আর কে না জানে হোস্টেলের ছেলেরা কেমন দ্বিধাহীন, মুক্ত, আনন্দময়, হুল্লোড়ের জীবন কাটায়। কিন্তু কুশলের তা নয়। বরাবর এক দ্বিধা, আত্মপ্রত্যয়ের অভাব, সংকোচ তাকে সবার কাছ থেকে আলাদা করে রেখেছে। নিজের এই অপদার্থতা সে হাড়ে হাড়ে টের পায়, কিন্তু তার কিছু করারও নেই।

বটগাছের ছায়ায়, যেখানে খেলোয়াড়েরা তৈরি হচ্ছে সেখান থেকে অনেকটা দূরে কুশল থামে এবং অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। যদি ডাকে যাবে, নইলে পালাবে।

শান্তই ডাকে—কুশল!

সে এগোয় পায়ে পায়ে জড়তা নিয়ে।

প্রফেসর চক্রবর্তী একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসে ভ্রূ কুঁচকে চেয়েছিলেন। বললেন—বরুণ লাহিড়িকে খবর দাওনি শান্ত?

—উনি আসছেন।

—ভালো।

—এই নতুন ছেলেটিকে আজ ট্রায়াল দিচ্ছি স্যার। বলে শান্ত তাকে চোখের ইশারায় ডাকে।

প্রফেসর চক্রবর্তী সচকিত হয়ে বলেন—কে?

—এই যে। শান্ত কুশলের পিঠে হাত দিয়ে সামান্য ঠেলে আনে সামনে।

প্রফেসর চক্রবর্তী ভ্রূ কুঁচকেই তাকে দেখেন। চক্রবর্তী কাঠবাঙাল, মাঝে মাঝে দেশি কথা বলে ফেলেন। এখন বললেন—তোমার বাড়িতে খাইতে-খুইতে দেয় না নাকি হে! শরীরটায় তো কিছুই নাই। ব্যাট আলগাইতে পারবা?

শরীরের কথা উঠলেই কুশল লজ্জায় মরে যায়। বাস্তবিকই এই রোগা, ফ্যাকাসে, ফিনফিনে চেহারা নিয়ে তার যে অস্তিত্ব, সেটা প্রায় অনস্তিত্বের পর্যায়ে পড়ে। এই শরীর নিয়ে সে যে খেলাধুলো করে এটা প্রায় সকলের কাছেই অবিশ্বাস্য। কুশল এমনিতেই লাজুক, তার ওপর রোগা বলে নিজেকে সে প্রায় সবসময়েই লুকিয়ে রাখে। প্রফেসর চক্রবর্তীর কথার সে কোনও জবাব দিল না, তবে লাল হয়ে গেল লজ্জায়।

শান্ত তাকে লজ্জা থেকে রেহাই দিতেই এগিয়ে এসে বলল, রোগা হলেও স্যার, কুশলের কাঠামোটা ভালো। হি হ্যাজ গুড বোনস।

চক্রবর্তী নাক কুঁচকে বললেন, দেখো ট্রায়াল দিয়ে তোমার নাম কী হে ছোকরা?

কুশল ভট্টাচার্য।

দেশ কোথায়?

ঢাকা, বিক্রমপুর।

কও কী! তুমি তো আমার দেশের পোলা। কোন গ্রাম কও তো?

বারদি।

উরেব্বাস! বারদি তো আমার পাশের গ্রাম। তিন মাইল দূর মাত্র। কার বাড়ি কও তো! মন্মথ ভট্টাচার্য কি তোমাগো কেউ হয়?

আমার দাদু!

ঠার্কুদা? তুমি কার পোলা, চারু, হারু আর নাড়ু, তিনজনের কোনজন তোমার বাপ?

আমার বাবার ডাকনাম নাড়ু।

সর্বনাশ! আরে, তুমি যে...আরে ছিঃ ছিঃ, এতকাল পরিচয় দাও নাই! অ্যাঁ! নাড়ুর পোলা! নাড়ু আছিল আমাগো হিরো। এ টেরিফিক স্পোর্টসম্যান। খেলার পর দেখা কইরো। বাড়িতে লইয়া যামু। বাই দি বাই, নাড়ু এখন কই আছে কও তো?

লামডিং।

রেলে কাম করে তো!

হ্যাঁ।

তুমি আমাগো লতায়-পাতায় আত্মীয় হও। ছিঃ ছিঃ, এতকাল পরিচয় হয় নাই।

কুশল জানত যে প্রফেসর চক্রবর্তী তাদের আত্মীয় এবং তার বাবার একজন প্রিয় পাত্র। কিন্তু অত্যধিক লাজুক আর মুখচোরা বলে সে কখনো চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচয় করার কথা ভাবতেও পারেনি।

খেলোয়াড়রা এসে গিয়েছিল। বিভিন্ন গাছতলায় জড়ো হয়ে তারা তৈরি হচ্ছে। বেয়ারা মুকলাল তার দু'জন সহকর্মীর সঙ্গে ধরাধরি করে ক্রিকেটের সাজসরঞ্জাম এনে ফেলল। দেখা দিল ব্যস্ততা।

ভিড় থেকে একটু সরে এসেছিল কুশল। শান্ত এসে বলল, তোমাকে প্রফেসর চক্রবর্তীর দলে দিচ্ছি। আমার দলে আক্রাম নামে একজন বোলার আছে। রিয়েল ফাস্ট। একটু এরাটিক। আমি চাই তুমি তাকে ফেস করো। ভয় পাবে না তো!

না।

এই তো চাই। বলে শান্ত তার কাঁধটা নেড়ে দিয়ে চলে গেল।

খেলা শুরু হয়ে গেল। চক্রবর্তীর দল ব্যাটিং করছে। ওপেন করতে নামলেন চক্রবর্তী আর মানস রায় নামে কলেজের নিয়মিত ওপেনার। চক্রবর্তী দারুণ খেলেন। মানস একটু ডিফেনসিভ।

আক্রাম কেমন বল করে তা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করছিল কুশল। দৌড়টা একটু কোনাচে। বল ফেলেও ডায়াগোনাল। মারাত্মক হল প্রত্যেকটা বলই গুড লেংথে পড়ে কাঁধ সমান উঁচু হয়ে আসে। এসব বল ছেড়ে দিলে ক্ষতি নেই, এল বি ডবলিউ বা বোল্ড হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু খেলতে গেলে বা মারতে গেলেই বিপদ। আক্রাম বেশ লম্বা। ছিপছিপে গড়ন। অতটা দৈর্ঘ্যের জন্য তার পক্ষে বলকে গুড লেংথ থেকে তোলা সম্ভব হচ্ছে।

কুশল দেখল, চক্রবর্তী বা মানস কেউই আক্রামের বল খেলতে পারছেন না। তিনটে মেডেন ওভার নিল আক্রাম। উইকেট অবশ্য পেল না।

কুশলের মনে হচ্ছিল, আক্রামের বল যদি খেলতেই হয় তবে অনেকটা ফরোয়ার্ডে খেলতে হবে। তাতে ঝুঁকি আছে। কিন্তু বল পিচ পড়ার আগে না খেলতে পারলে কিছুই করার নেই। তাকে যদি আক্রামের বল খেলতে হয় তবে ক্রিজ ছেড়ে ফরোয়ার্ডই খেলবে, স্টাম্পড হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও।

অন্যদিকে বল করছিল মিডিয়াম পেসার সতু। ভালো বল করে। তবে তেমন জোরালো বল না। দু'রকম সুইং আছে। আড়াআড়ি বাতাস ছিল বলে বল ভালোই বাঁক খাওয়াচ্ছে। ফলে রান উঠছে না। চক্রবর্তী অধৈর্য হয়ে পড়ছেন। তিনি মারকুট্টা খেলোয়াড়, ড্রাইভ মারতে ভীষণ ভালোবাসেন। হুক বা সুইপ তাঁর প্রিয় শট নয়, এটা কুশল মাঝে মাঝে মাঠের বাইরে থেকে দর্শক হিসেবে দেখেছে। কিন্তু কুশল এও জাননে, সতুর শর্ট পিচ ডেলিভারি যখন লেগ স্টাম্পে আসে তখন হুক বা সুইপ করলেই ভালো।

চক্রবর্তী আউট হলেন সপ্তম ওভারে, তেরো রান করে। আক্রামের বল ব্লক করতে গিয়ে ক্যাচ দিলেন উইকেট কিপারকে। খুবই হতাশা মুখে মেখে ফিরে এলেন। পরের ওভারে সতু তুলে নিল মানসকে। পরপর আরও তিনজনকে ধরাশায়ী করে দিল আক্রাম তার অদ্ভুত ধরনের বলে।

পাঁচ উইকেটে পঞ্চান্ন রান। সেটা কিন্তু বড় কথা নয়। মফস্বলের ক্রিকেটে এ রকমই হয়। কথা হল, আক্রাম যে সাধারণ মানের বোলার নয় এটা কুশল বুঝতে পারছিল।

চক্রবর্তী বসেছিলেন গাছতলায় একটা ফোল্ডিং চেয়ারে। কাঁধের পিছনে দু'হাত। কুশলকে ডেকে বললেন, প্যাড আপ কর। রাউন্ড অ্যাবাউট একশো রান উঠলেই যথেষ্ট। কত রান করতে পারবা?

কুণ্ঠিত কুশল বলল, জানি না স্যার।

আরে, জানবা কেমনে? ক্রিকেট হল এ গেম অফ গ্রেট আনসার্টেনটি। কথা হইল ইন প্রেজেন্ট কন্ডিশন হাউ ডু ইউ ফিল? নার্ভাস অর কনফিডেন্ট?

কুশল একটু হাসল, দেখা যাক স্যার।

যদি পনেরো রানও করতে পারো আমি তোমারে একখানা প্রাইজ দিমু। যাও, প্যাড আপ কর।

কুশল প্যাড পরল। অ্যাবডোমেন গার্ড নিল। তিনখানা ব্যাটের মধ্যে ভারীখানাই বেছে নিল সে। গ্লাভস পরে ব্যাটখানা একটু নানাদিকে ঘুরিয়ে দেখে নিল। রোগা হলেও সে দুর্বল নয়।

ছয় নম্বর ব্যাটসম্যান পড়ল মিনিট দশেক বাদে। ছ'জনের কেউই আক্রামকে খেলতে পারেনি। আক্রাম তার অদ্ভুত ধরনের বলে পাঁচ উইকেট পেয়ে গেছে।

কুশল যখন নামছিল ততক্ষণে মাঠের চারপাশে লোক জমে গেছে। দর্শকদের মধ্যে অর্ধেক বা তারও বেশি হল মেয়েরা। চেঁচাচ্ছে, বাদাম খাচ্ছে, হাসছে, কুশলের দারুণ লজ্জা করছিল। এত বে-আব্র& নিজেকে তার কোনওদিন বোধ হয়নি।

বিপদ হল, তাকে ফেস করতে হবে আক্রামকেই। এই ওভারের প্রথম বলেই আক্রাম উইকেট পেয়েছে, আরও পাঁচ বল বাকি। কুশলের জুটি শ্যামল এগিয়ে এসে বলল, দেখে খেলো। ডোন্ট বি হেস্টি।

কিন্তু কুশল যতদূর বুঝেছে, আক্রামের বল দেখে খেলতে গেলেই বিপদ বেশি। এ বলে ডিফেন্স খেলার মানেই হয় না। খেলতে হলে ফরোয়ার্ড এবং ক্রিজ ছেড়ে অন্তত দু'-তিন হাত বেরিয়ে গিয়ে। কুশলের পায়ের কাজ ভালো। সে ফনফন করে দৌড়াতে পারে। সুতরাং সে তার স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে নিল।

আক্রাম বল করছে রাউন্ড দি উইকেট, কোনাচে রান আপ। সুতরাং প্রতিটি বলই যাবে অফ স্ট্যাম্পের ওপর দিয়ে। এই হিসেব যদি না মেলে তাহলে কুশলের দুর্ভাগ্য।

আক্রাম দৌড়ে আসছে। কুশল স্থির দাঁড়িয়ে। কিন্তু আক্রামের হাত ওপর উঠতেই কুশল ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এল।

যেরকম ভেবেছিল বলটা এল সেরকমই, তবে পিচ পড়ল একটু বেশি। ফলে কুশল সেটাকে ফুল পিচে পেয়েও ব্যাটের নীচে এবং ঠিক কেন্দ্রস্থলে লাগাতে পারল না। তবু বলটা মিড অফ-এর ভিতর দিয়ে অনেকটাই ছিটকে যাওয়ায় দুটো রান এসে গেল।

তেমন কোনও জমকালো শট নয়। কাজেই মাঠে কোনও প্রতিক্রিয়া হল না।

কুশল মনে মনে হিসেব কষতে লাগল। ক'পা এগোলে ঠিকঠাক ফুল পিচে বলটাকে পাওয়া যাবে।

আক্রামের তৃতীয় বলটা খেলতে ফের ক্রিজ ছাড়ল কুশল, কিন্তু এগোল দু'পা। বলটা একটু বেশি বাঁক খেয়েছে বাইরের দিকে। কুশল শরীরটা পিছনে টেনে ব্যাটটাকে এগিয়ে বলটাকে ফের মিড অফ দিয়ে বের করে দিল। আবার পেয়ে গেল দু'রান। চক্রবর্তী তাকে বলেছেন, পনেরো রান করলেই প্রাইজ। সেই হিসেবে তার আরও এগারো রান করতে হবে।

আক্রামের চতুর্থ বলটা কুশলের হিসেবে ঠিকঠাক এল। কুশল ঠিক মাপে এগোল এবং ব্যাটের নীচের দিকের মাঝখান দিয়ে মারতে পারল। সামান্য বাঁ-দিকে মোচড় দিয়েছিল বলে বলটা আক্রামের পায়ের কাছ দিয়েই একটা বুলেটের গতিতে গিয়ে মাঠ পেরোলো।

চক্রবর্তী বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বললেন, আন্দাকোন্দা মাইরো না হে, বিপদে পড়বা।

কিন্তু কুশল তার রণকৌশল স্থির করেই নিয়েছে। আক্রামকে খেলতে হলে এভাবেই খেলতে হবে। অন্য পন্থায় নয়।

পঞ্চম বলটা হুবহু একইভাবে খেলল কুশল, তবে কোণ পাল্টে দিল। বলটা মাঠ পেরোলো মিড অফ দিয়ে ঘাসে চুমু খেতে খেতে। পরিষ্কার মার।

আরে স্ট্যাম্পড হইয়া যাইবা যে! চক্রবর্তী আবার চেঁচালেন।

আক্রামের ষষ্ঠ বলটা যথেষ্ট বাইরের বল। একটু এগিয়ে গিয়ে কুশল বুঝতে পারল সোজা ব্যাটে খেললে বলটা সে ফসকাবেই। উইকেট কিপারের হাতে গেলে নির্ঘাত আউট।

কুশল ব্যাটটাকে বাড়িয়ে বলটাকে খুব আলতো করে চামচের মতো তুলে দিল। ক্যাচ? না, কুশল তার বাবাকে দেখেছে স্লিপের মাথার ওপর দিয়ে বল ওড়াতে। থার্ডম্যানে লোক না থাকলে ভয় নেই। থাকলে মৃত্যু।

থার্ডম্যানে ছিল না। থাকলেও বিপদ হত না। কারণ আক্রামের জোরালো বল ব্যাটে পা রেখে গ্লাইডারের মতো বাতাসে ভর দিয়ে উড়ে গিয়ে সাইট স্ক্রিনের ধার ঘেঁষে মাঠের বাইরে পড়ল। ছক্কা।

পাঁচটা বলে আঠারো রান কম নয়। চারদিকে প্রচুর হাততালি পড়ল।

গুড গোয়িং। চক্রবর্তী বললেন।

ফিল্ডিং বদল হওয়ার সময় ফাইন লেগ থেকে শান্ত এগিয়ে এসে কুশলের কাঁধে হাত রেখে বলল, আমার মুখ রেখেছ। তুমি যে ব্যাট বেশ ভালোই করো এ তো জানতাম না।

কুশল লাজুক হাসি হাসল।

খেলে যাও। কনসেনট্রেট।

সতুর প্রথম বলে শ্যামল একটা রান করল। কুশল ফেস করবে। তার গা যথেষ্ট গরম হয়ে গেছে। আত্মবিশ্বাস আসছে। তবে সতুর বলে স্পিড না থাকলেও কারিকুরি আছে। সহজ নয় খেলা।

কুশল দ্বিতীয় বলটা ছাড়ল। তৃতীয় বলে একটা হুক মেরে বাউন্ডারি করল। চতুর্থ বল ছাড়ল। পঞ্চম বলে নিল আরও এক রান। ষষ্ঠ বলে শ্যামল লোফফা ক্যাচ দিল গালিতে। আউট হয়ে ফিরে গেল। নামল সুনীল।

আক্রামকে আবার খেলতে হবে। মারা ছাড়া উপায় নেই। কুশল তৈরি হল। আক্রামের প্রথম বল ফের কোনাচে, সঠিক লেংথ, কুশল এগিয়ে আবার ফুল টস করে নিয়ে মিড উইকেটে বাউন্ডারি পেল সে।

আক্রামও বোধহয় বুঝতে পারছিল, কুশল তার বল খেলার পদ্ধতি জেনে গেছে। ফলে সে লেংথ কমাল। ওভারপিচও দিল। কিন্তু কুশল, একগুঁয়ে। কুশল তার রণকৌশল না বদলে প্রত্যেকটি বলই খেলতে লাগল ইচ্ছেমতো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে লাফিয়ে লাফিয়ে পঞ্চান্নয় পৌঁছে গেল।

মোট রান উঠে গেল একশো ত্রিশ।

কিন্তু উল্টো দিকে এক এক করে উইকেট পড়ছিল। শেষ উইকেট পড়ল একশো ত্রিশে। পার্টনারের অভাবে পঞ্চান্নতেই থামতে হল কুশলকে।

ফিরে আসতেই চক্রবর্তী উত্তেজিতভাবে ধমকে উঠলেন, আরে, এতদিন তুমি করতাছিলা কী কও তো! এত ভালো হাত, তবু তোমারে ডিসকভার করন যায় নাই! শান্ত, এই ছ্যামড়ারে কলেজ টিমে লইয়া লও।

শান্ত মৃদু হেসে বলল, নেওয়া একরকম হয়েই গেছে স্যার!

শান্ত বর্মনের টিম প্রাণপণ চেষ্টা করল বটে, কিন্তু চক্রবর্তীর টিমের রানকে ছুঁতে পারল না। হেরে গেল। কুশলকে দিয়ে চক্রবর্তী কয়েক ওভার বল করাল। দুটো উইকেট সে পেয়েও গেল।

খেলার শেষে কাঁধে হাত দিয়ে স্নিগ্ধ গলায় বললেন, অনেক দিন পর একজন ইনটেলিজেন্ট ক্রিকেটার দেখলাম, বুঝলা! ভেরি ইনটেলিজেন্ট। আক্রামের ওই বল ওই রকমভাবে ছাড়া খেলন যায় না। তোমার খেলা দেইখ্যা বুঝলাম। চলো, ইউ হ্যাভ আর্নড প্রাইজ।

চক্রবর্তীর কোয়ার্টার কাছেই। বাগানে ঘেরা ছোট্ট একখানা লাল ইটের বাড়ি। সামনে কাঠের জাফরি-ওলা বারান্দা। সামনে দিয়ে অনেকবার কুশল যাতায়াত করেছে। ভিতরে ঢুকল এই প্রথম।

বাইরের ঘরখানা হালকা পলকা চেয়ার-টেবিলে সাজানো। সর্বত্র বই পড়ে আছে। চক্রবর্তী ঘরে ঢুকেই হাঁক দিলেন, আরে কই গেলা গো? দেইখ্যা যাও কারে ধইরা আনছি।

যে রোগা ফর্সা মহিলা এই হাঁকডাকে বেরিয়ে এলেন তার চোখ দু'খানা ভারি ঠান্ডা, স্নিগ্ধ। একটু রুগ্নতার স্পর্শ আছে বটে, কিন্তু রূঢ়তার লেশমাত্র নেই।

চক্রবর্তী উচ্চস্বরে কুশলের পরিচয় দিয়ে বললেন, রিলেটিভ, বুঝলা! কিন্তু এতদিন লজ্জায় পরিচয় দেয় নাই। আহম্মক আর কারে কয়! অ্যান্ড হি ইজ ইন দি মেকিং অফ এ গুড ক্রিকেটার! কী খাওয়াইবা খাওয়াও।

ভদ্রমহিলা কুশলের দিকে চেয়ে স্নিগ্ধ চোখ দিয়ে নিষিক্ত করে দিলেন তাকে। তারপর বললেন, অনেকক্ষণ কিছু খাওনি না?

সত্যিই তাই। কুশল সেই সকালে হোস্টেলে ভাত খেয়েছিল। ক্রিকেটের উত্তেজনায় খাওয়ার কথা মনে হয়নি, সুযোগও পায়নি। পেট জ্বলে যাচ্ছে খিদেয়। সে মাথা নীচু করে হাসল।

লুচি খাবে?

থাকগে, হোস্টেল গিয়ে—

ওমা, কী লজ্জা ছেলের! বোসো, আসছি।

জীবনে এমন সুন্দর দিন খুবই কমই এসেছে কুশলের। লজ্জা-সংকোচের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারা এবং কিছু করা—এর মতো বন্ধনমুক্তি আর নেই। তার ওপর এ-রকম মায়ের মতো গলায় কেউ যদি

সারাদিনের সব গ্লানি ধুয়ে দেয় তাহলে কেমন হয়? মনে হয়, আমার চেয়ে সুখী এ পৃথিবীতে আর কে আছে?

খেতে খেতেই কুশল শুনল, চক্রবর্তীর এক ছেলে আর এক মেয়ে। তারা দু'জনেই কলকাতায় পড়াশুনো করে। বালিগঞ্জে চক্রবর্তীদের বাড়ি আছে। ছেলে তারই বয়সী, মেয়ে কিছু ছোট। অ্যালবামে মেয়েটির দিকে চেয়ে কুশলের বুকে একটু তরঙ্গ উঠল। কী অসাধারণ ধারালো মুখশ্রী, কী ছিপছিপে শরীর! একটু অহংকারী কি? হবেও বা। অহংকার ছাড়া কি সুন্দরীদের মানায়!

বুকে নতুন একটু স্বপ্ন নিয়ে কুশল ফিরে এল হোস্টেলে।

দশ বছর পরেকার কথা। কুশলকে আর আগের কুশল বলে চেনা যায় না। তার বয়স এখন ছাব্বিশ বছর। পনেরো বছর আগের তুলনায় সে আর একটু লম্বা হয়েছে। এখন তার চেহারা ছিপছিপে হলেও আর আগের মতো কৃশ নয়। প্রফেসর চক্রবর্তী তার মধ্যে বড় ক্রিকেটারের ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন। কুশল তত বড় কিন্তু হয়নি। মফস্বল ছেড়ে কলকাতার কলেজে পড়তে এসেছিল সে থার্ড ইয়ারে। কলকাতার ভিড়ে তাকে নতুন করে কেউ আবিষ্কার করতে আগ্রহী ছিল না। সুতরাং ক্রিকেট চুলোয় গেল। সে শুরু করল কবিতা লিখতে। তার কবিতা ছাপবার মতো সমঝদার সম্পাদকও কেউ ছিল না। এক-আধটা ছোট কাগজে ছাপা হল বটে, কিন্তু তাতে কোনও তরঙ্গ উঠল না কোথাও। কুশল কবিতা লেখাও একরকম বন্ধ করে দিল। খুব ভালো ছাত্র সে কোনওদিনই ছিল না। মাঝারি ফলাফল করে সে কলেজের পড়া শেষ করল।

চাকরির বাজার খুবই খারাপ। একটা ইস্কুল মাস্টারি জোটাতেও দম বেরিয়ে যায়। চারদিকে দরখাস্ত পাঠায় কুশল। মাঝে মাঝে ইন্টারভিউ পায়। অল্পের জন্য চাকরি ফসকায়। কয়েকটা মাত্র টিউশানি সম্বল করে কলকাতার প্রচণ্ড অস্তিত্বের লড়াইতে সে নিজেকে যুক্ত রাখে মাত্র। জানে, তার মতো নির্জীব, লাজুক, সঙ্কুচিত যুবকের জন্য পৃথিবীর কোনও চাকরি, সুন্দরী মহিলা বা মেডেল নেই। সফল যুবকদেরও সে দেখতে পায়। তারা কেউই তার মতো নয়। তারা আলাদা রকমের।

শীতের দুপুরে রাসবিহারী ধরে হাঁটছিল কুশল। উদ্দেশ্যহীন সময় কাটানো। রাস্তাটা চমৎকার। ঝকঝকে দোকানপাট, সুন্দর সব বাড়ি। কলকাতার সুন্দর রাস্তা বা পাড়ায় ক্যাবলার মতো ঘুরে বেড়ানো তার প্রিয় অভ্যাস। বেলা পড়লে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে একটা বাড়িতে টিউশানি করতে যাবে।

হাঁটিতে হাঁটতে পার্কের ধারে এসে দাঁড়াল কুশল। শীতের রোদে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে। সম্মোহিতের মতো সে রেলিঙে ভর দিয়ে চেয়ে রইল। দশ বছর আগের একটা দিন ফিরে আসছিল তাকে ঘিরে। পঞ্চান্ন রানের সেই দুর্ধর্ষ ইনিংস, খেলার পর কাঁধে প্রফেসর চক্রবর্তীর উষ্ণ হাত, আজও গায়ে কাঁটা দেয়।

কাঁধে আজও কে যেন হাত রাখল। চোখ বুঝে ফেলল কুশল। কে? শান্তদা? প্রফেসর চক্রবর্তী? রঞ্জি ট্রফির কোন নির্বাচক?

কুশল ধীরে ধীরে মুখ ফেরাল। সাদা চুলের এক বুড়ো মানুষ। প্রায়ই একে পার্কের বেঞ্চে বসে থাকতে দেখেছে সে।

ভদ্রলোক সামান্য হাসলেন, ছোকরা বেশ খেলছে না? ব্যাক লিফট বেশি নেই, অথচ মারের হাত ভালোই। না?

কুশল মাথা নাড়ল। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল বুক থেকে।

যত মানুষ ক্রিকেট খেলেছে, খেলা ছেড়েছে, তাদের অনেকেই এ রকম মাঠেঘাটে বসে থাকে খেলা দেখতে। নিজের অতীতকে ফিরে পায় হয়তো।

কুশল আর দাঁড়াল না। কোথায় হারিয়ে গেছে শান্তদা, প্রফেসর চক্রবর্তী, মফস্বলের সেই সব ক্রিকেটের দিন। আজ বাহবা পাওয়ার মতো কিছুই করে উঠতে পারে না সে।

তবু তার মতো করে, নিজস্ব নিয়মে আমৃত্যু বেঁচেও তো থাকতে হবে তাকে।

দুগ্গা

চকবেড়ের গোহাটা থেকে একটা দুধেল গাই কিনে বাড়ি ফিরছিল নগেন। তা বাড়িও তো হেথা নয়। সে হিমির জলা পেরিয়ে, নয়া গোবিন্দপুর ছাড়িয়ে মনসাতলা। তারপর ক্রোশ খানেক গেলে জামতলার শ্মশানঘাট। সেখানে ছোট নদী ডুমডুমি পেরিয়ে আরও দুপোয়া রাস্তা। বাড়ি ফিরতে মাঝরাত। তা কি আর করা! বরাতে যা আছে হবে।

বরাতটা তার কোনোদিনই ভালো নয়। আজ গরু কিনে মনটা ভারী ভালো হয়ে গিয়েছিল কিনা। বেশ সস্তাতেই পেয়ে গিয়েছিল গরুটা, তাই মনের আনন্দে কিছু বাজারহাটও করে ফেলল। গগন ময়রার দোকানে বসে পো টাক বোঁদে আর দই আর আধ কেজি মুড়ি সাঁটাল। সেখানে আবার জুটে গেল শীতলকুচির জীবন মণ্ডল। বন্ধুমানুষ। পাঁচটা কথা উঠে পড়ল। কথায় কথায় বেলা গেল গড়িয়ে। যখন রওনা দিল তখন সুয্যিঠাকুর পাটে বসে গেছেন।

তবে আজ মনে ফুর্তিই আছে। কারণ গরুটা বড় জব্বর কেনা গেছে। তেমন বয়স নয়, তেল চুকচুকে চেহারা, তার ওপর স্বভাবটাও বড্ড ঠান্ডা। এমন গরু হকে নকে পাওয়া শক্ত। একা একা এতটা পথ ফিরতে হবে বটে, তবে মনে ফুর্তি থাকায় তেমন দুশ্চিন্তা হচ্ছে না। আর একাই বা ভাবছে কেন নিজেকে! সঙ্গে স্বয়ং মা ভগবতীই তো রয়েছেন। গরু তো আর হ্যাতান্যাতা জীব নয়। জীবন মণ্ডলও বলছিল বটে, এ বড় সুলক্ষণ গরু। খুব দাঁও মেরেছো বটে হে।

নিজের কপালটা নিয়েই যত দুশ্চিন্তা নগেনের। কপালটা তার কোনোদিনই ভালো নয়। কাজকর্ম বড্ড ফস্কে যায় তার হাত থেকে। গেলবার হরেন কীর্তনীয়ার সরেস জমিটা বায়নার দিনই হাতছাড়া হয়ে গেল, পঁচিশ হাজার টাকা বেশি হেঁকে দখল নিল নিমাই নস্কর। এইরকমই সব হয় তার বরাতে।

ফেরার সময়ে তিনজন জুটেছিল সঙ্গে। শীতলপুরে তায়েব মিয়া খসে গেল, পীরগঞ্জে বিদেয় হল নটবর, হলার হাটে পরেশ গাঁইয়ের শ্বশুরবাড়ি। তাই সেও সরে পড়ল। নগেন তারপর নির্যস একা। না, ঠিক একা নয় বটে, সঙ্গে মা ভগবতী রয়েছেন অবশ্য।

বলতে নেই, এই গো-জননীটি বড্ড ভালো হয়েছে। চোখ দু'খানা যেন মায়ায় ভরা। এ গরুর চোখ যেন কথা কয়। বাড়ির সবাই হাঁ করে বসে আছে, সে ফিরলেই গরুকে বরণ-টরণ করা হবে। সে বেশ জম্পেশ ব্যাপার। ছোটরাও আজ কেউ ঘুমের চৌকাঠ ডিঙোবে না। আগের গরুটার নাম সে আদর করে রেখেছিল মালতী। তা মালতীরও বয়স হল, আজকাল দুধ দেয় না, রিটায়ার নিয়ে বসে-বসে জাবর কাটে। অনেকে চামড়ার লোভে বুড়ো গরু কিনতে আসে। নগেন রাজি হয়নি। মালতী কি ফ্যালনা নাকি? মা মাসির মতোই

একজন। এখন এই নতুন গরুরও নাম রাখা হবে। সেই নাম নিয়েও বিস্তর বাক বিতন্ডা চলছে বাড়িতে। নগেন অবিশ্যি নাম একটা ভেবেই রেখেছে, এখন সেই নাম অন্যদের পছন্দ হলে হয়। নামটা হল দুগ্গা।

সবে বোশেখ গেল, এখন দুপুরটা বেগুনপোড়া গরম। সন্ধের পরও তেমন ঠান্ডা হচ্ছে না। তবে একটু বাতাস ছেড়েছে বলে অস্বস্তি কিছু কম। সামনেই বাঁ ধারে হিমির জলা। বড় বড় ঘাসের জঙ্গলের নীচে চোরা জলের বিশাল এলাকা। না জেনে ঢুকে পড়লে খুব বিপদ। কোমর অবধি কাদায় গেঁথে যাবে। দুগ্গাকে একটু জল খাওয়ানোর ইচ্ছে ছিল, মুখের কাছে জল থাকলেও খাওয়ানোর উপায় নেই। হিমির জলায় তলিয়ে গেলে উদ্ধারের আশা ত্যাগ করতে হবে।

হঠাৎ হাতের দড়িতে একটা হ্যাচকা টান পড়ল। ঠান্ডা স্বভাবের গরুটার হল কি?

গরুটার বোধহয় বেজায় তেষ্টা পেয়েছে। জলের গন্ধ পেয়ে ভারি হন্যে হয়ে পড়ে জব্বর টান টানছে। এত জোর গরুটার তা এতক্ষণ বোঝাই যায়নি তো! নগেন টান সামলাতেই পারল না। তার দুগ্গা তাকে হিড়হিড় করে টেনে জলার দিকে নিয়ে চলল। শত চেষ্টাতেও সামাল দিতে পারল না নগেন। বড় বড় ঘাসজঙ্গলের ভিতরে ঢুকে জলার এঁটেল কাদায় হুড়ুম করে নেমে পড়ল গরুটা। সঙ্গে নগেন। চেঁচিয়ে লাভ নেই, কেউ শুনতে পাবে না। তবু নগেন চেঁচাল। কিন্তু বৃথা। প্রথমে হাঁটু অবধি, তারপর কোমর পর্যন্ত কাদায় গেঁথে গেল সে আর তার সাধের গাই।

দুগ্গার অবশ্য ভ্রুক্ষেপ নেই। প্রথমে চোঁ চোঁ করে বেশ খানিকটা জল খেল, তারপর মহানন্দে জলার ঘাস মস মস করে খেতে লাগল। নগেন তাকে টানাটানি করল বটে, কিন্তু জলে কাদায় সে নিজেই এমন বেকায়দায় পড়েছে যে, সুবিধে করতে পারল না। বেশি হুড়যুদ্ধু করলে কাদায় আরও তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

তাই নগেন প্রাণপণে ঠাকুর দেবতাদের ডাকতে লাগল। উদ্ধারের কোনও আশা দেখতে পেল না সে। অন্ধকার, মশা ভনভন করছে, পায়ে জোঁক লেগেছে, দুর্দশার একশেষ। গরুটা যে এত বেয়াদব, তা কে বুঝতে পেরেছিল! এমন অবাধ্য গরু নিয়ে তার যে বড় বিপদ হল! বোকার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরা ছাড়া আর কোনও উপায় আছে বলে মনে হচ্ছে না তার।

কতক্ষণ কাটল কে জানে! তবে এত বিপদের মধ্যেও তার একটু চটকামতো লেগে গিয়েছিল। হঠাৎ সম্বিত ফিরল দড়ির টানেই। গরু ঠাকরুণের খিদে তেষ্টা মিটেছে বোধহয়, তাই এবার গা তুলতে চাইছেন। কিন্তু চাইলেই তো হবে না।

এ পর্যন্ত এই জলায় গেঁথে গিয়ে গরু, ছাগল, মানুষ বড় কম মরেনি। তাই দুগ্গার টানাটানিতে যে কোনও কাজ হবে না সেটাই বিশ্বাস ছিল তার। কিন্তু দুনিয়ায় কত আজগুবিই যে ঘটে! দুগ্গা গরু না হাতি তাও ঠাহর পেল না সে। হঠাৎ হড়হড় করে টেনে এক ঝটকায় জলকাদা ভেঙে ডাঙায় উঠে পড়ল দুগ্গা, সঙ্গে ফাউ হিসেবে নগেনও। প্রত্যয় হতে চাইছিল না নগেনের। এই জলা থেকে যে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব এটা কেউ বিশ্বাস করে না। গরুর পিছু পিছু ফের হাঁটা ধরে নগেন হাঁ হয়ে ভাবতে লাগল। কিন্তু ভেবে লাভ হল না।

নয়া গোবিন্দপুর জায়গা ভালো। এখানে একটু জিরেন নেওয়ার ইচ্ছে ছিল তার। চকবেড়েতে যা খেয়েছিল, তা এতক্ষণে হজম হয়ে বেশ খিদে হচ্ছে। কিন্তু তার মেজাজী গরু দুগ্গার মতিগতি মোটেই সুবিধের ঠেকছে না তার। লোকনাথের মিঠাইয়ের দোকানে বসে খানকতক জিবেগজা আর মতিচুর সাঁটিয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে ফের হাঁটা ধরার ইচ্ছে ছিল তার।

কিন্তু তার এই গোঁয়ার গরুর কারবারই আলাদা। তাকে মোটে দাঁড়াতেই দিল না, লোকনাথের দোকানের কাছাকাছি হতেই যেন রোখ চাপল তার। এমন পড়ি কি মরি করে ছুট লাগাল যে, নগেন প্রায় ছেঁচড়ে যাওয়ার জোগাড়। কোনওরকমে টাল সামলে গরুর দড়িটা শক্ত করে ধরে নিজেকে বাঁচাল বটে সে, কিন্তু বেয়াক্কেলে গরুটার মতিগতি ভালো বুঝছিল না নগেন।

ওরে বাপু, তোকে তো আর বাঘে তাড়া করেনি যে অমন গুল্লির

মতো ছুটছিস! নয়া গোবিন্দপুরের রথতলার বট গাছটার কাছাকাছি

এসে মা দুগ্গা একটু হাঁপ ছাড়লেন। বটতলায় বাঁধানো চাতালে কয়েকজন বসে ছিল। তাদের মধ্যে কেনারাম। সে হেঁকে বলল, কে হে, নগেন নাকি?

নগেনই বটি হে।

কোথা থেকে আগমন হচ্ছে?

সেই চকবেড়ের গোহাটা থেকে।

বলি গরু কিনলে নাকি?

তা কিনলুম।

সঙ্গে তো তাহলে টাকা পয়সা আছে?

সামান্য।

লোকনাথের দোকানের সামনে দিয়ে এলে নাকি?

তা এলুম। কেন বলো তো?

আর বোলো না! এই একটু আগে কয়েকটা গুন্ডা বন্দুক-পিস্তল নিয়ে লোকনাথের দোকানে চড়াও হয়েছে। তারা লোকনাথের দোকান লুট করার পরেও সেখানে ঘাপটি মেরে বসে আছে। না জেনে যেই কেউ দোকানে ঢুকছে, অমনি তাকে মেরে ধরে সব কেড়ে নিচ্ছে। আমাদের বড় বিপদ যাচ্ছে ভাই। ভয়ে আমরা ওদিকে ঘেঁষতেই পারছি না। তা তুমি জোর বেঁচে গেছ হে!

বৃত্তান্ত শুনে নগেন হাঁ হয়ে গেল। এ কি কাণ্ড রে বাবা! আর একটু হলে তারও তো খবর হয়ে যেত ! গরুটা তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে না এলে ট্যাকের বিশ হাজার টাকা হাওয়া হয়ে যাওয়ার কথা এতক্ষণে।

রাত হয়ে যাচ্ছে, আর দেরি করা ঠিক হবে না। সুতরাং নগেন আর দাঁড়াল না। বলল, ভাই কেনারাম, তাহলে আমি রওনা হয়ে পড়ি। তোমরা বরং পুলিশে খবর দাও।

সে কি আর দিতে বাকি রেখেছি নাকি? তবে গাঁয়ের পুলিশ তো! তার ওপর থানা দশ মাইল দূর। বুঝতেই পারছ অবস্থা।

নগেন তেমন বীর নয়, তার সাহায্যও কেউ চায়নি। সুতরাং তার এই ঝঞ্ঝাটে জড়ানোর দরকার নেই। আর জড়িয়েই বা সে করবে কি? ডাকাত তাড়ানোর এলেম তো তার থাকার কথা নয়। গরুর দড়ি ধরে একটা টান দিয়ে সে আদুরে গলায় বলল, চল রে মা দুগ্গা, আমরা বাড়ি যাই।

কিন্তু তার ত্যাদড় গরুর মর্জি বুঝে ওঠাই মুস্কিল। কী হল কে জানে, গরু ঠাকরুণ চার পা ছড়িয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, নড়ার নামটিও নেই। নগেন তাড়া দিয়ে বলল, ওরে চল, চল, রাত হয়ে যাচ্ছে যে!

কিন্তু কে শোনে কার কথা! গরু মোটে পাত্তাই দিল না তাকে। ছোট ছোট শিংওলা মাথা ঘন ঘন নাড়া দিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। গরু নিয়ে ভারি বিপদেই পড়া গেল তো!

ঠিক এই সময়ে হঠাৎ শোনা গেল 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে জনা চারেক লোক এদিকপানেই ধেয়ে আসছে। তাদের পিছনে জনা পাঁচেক বন্দুকধারী মুশকো চেহারার লোক। কেনারাম আর তার স্যাঙাৎরা লাফিয়ে উঠে 'ওরে বাপ রে!' বলে দৌড় লাগাল। হতভম্ব নগেনও ছুট লাগানোর চেষ্টা করল বটে, কিন্তু তার বজ্জাত গরু নড়লে তো!

নগেন অবাক হয়ে দেখল, লোকনাথ আর তার দোকানের তিনজন কর্মচারি প্রাণভয়ে ছুটছে, পিছনে তাড়া করে আসছে ডাকাতরা। অবস্থাগতিক দেখে সে বুঝতে পারল আজ লোকনাথের রক্ষে নেই। খুনে ডাকাতরা তাদের নাগাল ধরে ফেলল বলে! নগেন টুক করে তার গরুর আড়ালে বসে পড়ে গা-ঢাকা দিল। আগে প্রাণটা তো বাঁচুক!

কিন্তু কার ভরসায় গা-ঢাকা দেওয়া! তার নেমকহারাম গরু কোথায় তাকে আড়াল করবে, তা না, বরং সে হঠাৎ তার ছোট ছোট শিং নাড়া দিতে দিতে নগেনকে উদোম ফেলে রেখে হরিণের মতো ধেয়ে গিয়ে

ডাকাতগুলোর ওপর চড়াও হল। ওরে বাপু, তুই কি বাঘ না সিংহি যে, গুন্ডাগুলোর সঙ্গে লড়াই দিবি! নগেনের কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে হল। তার বিশ হাজার টাকায় সদ্য কেনা গরুটা আজই বেঘোরে মরবে।

কিন্তু দুনিয়ায় কত কিই যে হয়! চোখে দেখলেও প্রত্যয় হতে চায় না। যেমন সে হাঁ করে দেখল, তার ছোটখাটো নিরীহ গরুটি এক-একটি গুঁতোয় একেকজন ডাকাতকে মাটিতে ধরাশায়ী করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, তার ওপর চাঁট মেরেও জখম করে ছাড়ছে। এ কী কাণ্ড রে বাবা! লড়াই বেশিক্ষণ চললও না। কয়েক পলকেই যেন শেষ হয়ে গেল। ডাকাতরা কুমড়োর মতো গড়াগড়ি খাচ্ছে, আর 'বাবা রে, মা রে' বলে চেঁচাচ্ছে, এই দৃশ্য দেখে লোকজন ফিরে আসতে লাগল।

ডাকাতদের দুরবস্থা দেখে সবাই বুরবক। এমন কাণ্ড তারা জন্মেও দেখেনি বা শোনেওনি। একটা নিরীহ চেহারার গরু যে পাঁচ-পাঁচটা আলিশান চেহারার ডাকাতকে এমন হেনস্থা করতে পারে তা কে বিশ্বাস করবে!

কেনারাম কাঁদো কাঁদো হয়ে জিগ্যেস করল, ভাই নগেন, এ গরু কোথা থেকে কিনলে? এ যে সাক্ষাৎ কল্কি অবতার!

নগেনও বুঝতে পারছে ব্যাপারটা বড় এলেবেলে জিনিস নয়। সে আমতা আমতা করে বলল, তাই তো দেখছি!

গাঁয়ের এক মুরুব্বি পাঁচকড়ি হাইত বলে বসল, ওহে বাপু, গরু এ গাঁয়েই রেখে যাও। এ বাবদ এক লাখ টাকা নগদ দিচ্ছি।

নগেন প্রমাদ গুনল। হাত জোড় করে বলল, ওটি পারব না মশাই, মাপ করবেন। এ আমার পয়া গরু।

গাঁয়ের মহাজন হরিহর গুণ হেঁকে বলল, আহা, তোমাকে বাপু না হয় দু-লাখই দেব। এ গরু আমার চাইই।

নগেন পালাতে পারলে বাঁচে। বলল, পয়সায় কি আর সব কিছু কেনা যায় মশাই? আমার রাত হয়ে যাচ্ছে।

লোকে অবশ্য সহজে ছাড়ল না। দরও বাড়তে লাগল। শেষে পাঁচ লাখ পর্যন্ত ঠেলে উঠে গেল গরুর দাম। নগেন অবশ্য তাতেও টলল না। তবে বাড়ির মুখো রওনা হতে আরও একটু দেরি হয়ে গেল, এই যা।

মনসাতলা অবধি দিব্যি ভালোয় ভালোয় চলে এল নগেন। গরুটার কথাই ভাবতে ভাবতে হাঁটছিল সে। গা'টা একটু ছমছমও করছে বটে। গরু যা এলেম দেখাল তাতে ব্যোমকে যাওয়ারই কথা কিনা। এ গরুর দর পয়লা রাতেই পাঁচ লাখে উঠেছে, দিনে দিনে আরও কত উঠবে কে জানে! তবে দর যাই উঠুক, এ গরু সে প্রাণ থাকতে বেচবে না। তাদের বংশে গরু বেচার রেওয়াজ নেইও। কিন্তু বুকটা দুরুদুরুও করে! হে ভগবান, দর বেশি উঠে গেলে আবার আমার লোভ বেড়ে উঠবে না তো? তখন যদি গরু বেচে দিই?

বড্ড একটানা হাঁটা হয়েছে বলে একটু জিরোতে ইচ্ছে হচ্ছিল। বটগাছের তলায় এক সাধু ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছে দেখে নগেন ভয়ে ভয়ে দুগ্গাকে জিজ্ঞেস করল, ও মা দুগ্গা, এখানে একটু জিরিয়ে নিবি?

দুগ্গা তেমন আপত্তি প্রকাশ করল না দেখে নগেন বটের ঝুরিতে গরুর দড়িটা বেঁধে এগিয়ে গিয়ে সাধুবাবাকে একটা পেন্নাম ঠুকে ঘাসের ওপর বসে পড়ল। সাধুবাবার চেহারা তেমন পেল্লায় নয়, বরং বেশ রোগা ভোগা মানুষ। তবে জটাজুট আছে, লম্বা আর পাকা দাড়ি গোঁফ আছে, পরনে নেংটি। বয়স সত্তর ছাড়িয়েছে। চোখ দুখানা ভারি সুন্দর। তাকালে ভয় করে না।

সাধুবাবা তার দিকে মিটিমিটি একটু চেয়ে দেখল। তারপর বলল, কিছু বলবে নাকি বাপু?

নগেন করজোড়ে বলল, আজ্ঞে এই একটু বিশ্রাম নিচ্ছি বাবা।

তা বিশ্রাম নেবে বৈকি। গরু নিয়ে তোমার যা ধকল গেল।

নগেন ভারি অবাক হয়ে বলে, বাবা, সে বৃত্তান্ত আপনি জানলেন কি করে?

ও জানা আর শক্ত কি! এই যে তুমি আমার কাছে আজ রাতে এসে হাজির হলে সেও তো এমনি নয়, ওসব ঠিক করাই থাকে। না এসে তোমার উপায় ছিল না।

নগেন গোল্লা গোল্লা চোখ করে চেয়ে থেকে বলল, বটে বাবা! আপনি বোধহয় অন্তর্যামীই হবেন!

সাধু বলেন, তা অন্তর্যামী বললেও বলতে পারো। গরু কিনতে গিয়েছিলে বুঝি?

যে আজ্ঞে।

ও গরু কিন্তু সুবিধের নয়। এই বলে রাখলুম তোমাকে। ও গরু যে ঘরে যাবে সেই ঘর ছারখার করে ছাড়বে।

নগেনের একগাল মাছি। বলে কি রে বাবা! এমন উপকারী গরু কি খারাপ হতে পারে! এতক্ষণ যে খেল দেখাল তাতে তো অলক্ষুণে বলে মনে হয় না! কিন্তু সাধুবাবাও হ্যাতান্যাতা সাধু নন! সাক্ষাৎ অন্তর্যামী। বড্ড দোটানায় পড়ে গিয়ে সে বলল, তাহলে কী করতে হবে বাবা!

সাধুবাবা ভাবিত হয়ে বললেন, এক কাজ করো। গরুটা আমার কাছেই রেখে যাও। শোধন করে দেখি, ওর গ্রহদোষ কাটাতে পারি কিনা। সাত দিন বাদে এসো। আর ওই সঙ্গে হাজার দুই টাকা রেখে যাও। মনে হয় গরু শোধরানো যাবে।

নগেন খানিক ভাবল। তারপর ঠিক করল, সাধুবাবাকে অমান্য

করাটা ঠিক হবে না। ট্যাক থেকে দু হাজার টাকা বের করে সাধুবাবার পায়ের কাছে রেখে বলল, একটু দেখবেন বাবা, গরুটার মতি গতি যেন ফেরে।

ফিরবে হে, ফিরবে। নিশ্চিন্তে বাড়ি যাও।

একটা পেন্নাম ঠুকে উঠে পড়ল নগেন।

তারপর জোর হাঁটা লাগাল। ডুমডুমি নদী তেমন বড় নদী নয়। হেঁটেই পেরোনো যায়। এ সময়ে কোমরসমান জল থাকে। নদীর কাছাকাছি যখন এসে পড়েছে, তখন পিছনে হঠাৎ দৌড়পায়ের আওয়াজ পেল সে। মানুষের পা নয়, গরুর চারপেয়ে আওয়াজ।

ফিরে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখল, তার দুগ্গা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে। কাছে এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে হুমমম করে আদুরে শব্দ করতে লাগল।

অবোলা জীব নিয়ে এই অসুবিধে, কী হয়েছে তা কইতে পারে না। কিন্তু ব্যাপারটা দেখতেও তো হবে। তাই দুগ্গাকে নিয়ে ফের ফিরে যেতে হল বটতলায়। গিয়ে যা দেখল, তাতে সে হাঁ। সাধুবাবা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে আর অভিসম্পাত দিচ্ছে, তোর পা খোঁড়া হবে, চোখ কানা হবে, তুই মরা বাছুর বিয়োবি, তুই ন্যাজেগোবরে হয়ে ঘুরে বেড়াবি।

নগেনকে দেখে সাধু উঠে বসল। তারপর ট্যাক থেকে দু'হাজার টাকা বের করে তার হাতে দিয়ে বলল, তোমার গরু যে এমন ত্যাদড় তা আগে বলতে হয়। এখন বিদেয় হও তো বাপু।

নগেন ব্যাপারটা যে পষ্ট বুঝতে পারল, তা নয়। শুধু এটুকু বুঝল যে, দুগ্গার দুগ্গা নাম রাখাটা বড্ড লাগসই হয়েছে।

ভগবানের সঙ্গে দেখা

মানুষের জীবনে দুঃখের নানা কারণ থাকে। গদাইবাবুরও আছে। এই যেমন কাল রাতে হরেনবাবুর গরু বাসন্তীর একটা বকনা বাছুর হয়েছে জেনে অবধি তাঁর মনে সুখ নেই। আহা, বকনা না হয়ে এঁড়ে হলেও তো পারত! হরেনবাবুর সবই যে কেন ভালো হয় তা ভেবেই পান না গদাই পাল। হরেনবাবুর যেন ভালোর আর শেষ নেই।

এই তো গত বার্ষিক পরীক্ষায় হরেনবাবুর ছেলে নব মেলা নম্বর পেয়ে ক্লাসে ফার্স্ট হল, আর গদাইবাবুর ছেলে ফটিক ওপরের ক্লাসে উঠতেই পারল না। তা না পাক, তাতে দুঃখ নেই! কারণ প্রতি ক্লাসেই ফটিকের ওপরের ক্লাসে উঠতে একটু সময় লাগে। তা বলে নবর অমন তাড়াহুড়ো করে ওপরে ওঠার দরকার কী? একটু রয়ে সয়ে উঠলে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয় রে বাবা!

সবাই জানে হরেনবাবুর টাকার লেখাজোখা নেই। তবু গেলবার ভুটান লটারির দশ লাখ টাকার প্রাইজ উঠল হরেনবাবুর নামেই। এর কোনো মানে হয়? ভূষণবাবুর যে সরেস সাড়ে তিন বিঘে জমি চার লাখে প্রায় বায়না করে ফেলেছিলেন গদাইবাবু, সেই জমি কোন মন্তরে মাত্র দু-লাখে কিনে ফেললেন হরেনবাবু তা আজ অবধি মাথায় ঢুকছে না গদাইবাবুর। ভূষণবাবুর কাছে কথাটা তুলতেই তিনি খ্যাঁক করে উঠে বললেন, আমার জমি আমি যাকে খুশি বেচব, তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে নাকি!

পরে কানাঘুঁষোয় শোনা গেল, হরেনবাবুর ভাইঝির সঙ্গে ভূষণবাবুর কোন শালির ছেলের বিয়ে ঠিক হয়েছে বলেই দু-তরফে এখন বেজায় খাতির। কপালটাই তাঁর খারাপ! নইলে কি গদাইবাবুরও বিয়ের যুগ্যি ভাইঝি ছিল না? ছিল, কিন্তু ভূষণবাবুর শালির যে একটি সরেস ছেলে আছে এখবরটাই জানা ছিল না গদাইবাবুর।

তা না হয় হল, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ব্যবহারটাই বা কীরকম! সাহেব সেদিন গাঁয়ে রোদে এসেছিলেন, তাই গদাইবাবু তাঁকে একটু সেলাম জানানোর জন্য কাঁচি ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবি পরে সেজেগুজে চণ্ডীমণ্ডপে হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নমস্কারের জবাবে সাহেব না করলেন নমস্কার, না দিলেন কুশলপ্রশ্নের কোনও জবাব। ভ্রুক্ষেপই করলেন না। অথচ হরেনবাবু লুঙ্গি আর ফতুয়া পরে হাজির হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে কত কথাই-না কইলেন। তাও আবার হেসে হেসে। এতে দুঃখ না হওয়াটাই তো অস্বাভাবিক। তা এসব দুঃখ নিয়েই বেঁচে থাকতে হলে কার না রাগ হয়!

সকালবেলায় গদাইবাবু একটু প্রাতঃভ্রমণ করে থাকেন। আজও বেরিয়েছিলেন। মনটা খিঁচড়ে থাকায় হাঁটাটা তেমন উপভোগ করছেন না। বিরক্তই লাগছে। তাই আজ ইচ্ছে করেই চেনা রাস্তা ছেড়ে গাঁয়ের সীমানা ছাড়িয়ে একটা মেঠো পথ ধরলেন। মনটা যদি একটু চনমনে হয়। তা বলতে কি অচেনা রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে মনটা বেশ একটু ভালোই লাগছে। চারদিকে ঘন গাছপালা, বেশ নির্জন, চারদিকে পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। শরৎকাল বলে বেশ মোলায়েম আবহাওয়া। চমৎকার পরিবেশ। তাই আজ একটু বেশি হাঁটবেন বলে হনহন করে আগু হলেন। কোথায় গিয়ে ঠেকবেন সেটা তেমন খেয়াল রইল না।

বেখেয়ালে অনেকটা যাওয়ার পর হঠাৎ চৈতন্য হল যে, তিনি রাস্তা গুলিয়ে ফেলেছেন। চারদিকে জঙ্গলটাও যেন বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। খেয়াল করেননি, অন্যমনস্ক ছিলেন বলে। তবে ভয়েরও তেমন কিছু নেই। দিনমানে ভয়-ভীতির ব্যাপারও তেমন থাকে না কিনা। গদাইবাবু অকুতোভয়ে এগোতে লাগলেন। কিছুদূর এগোবার পর দেখলেন, একটা বেশ ঝুপসি বটগাছ। তার তলাটা বাঁধানো এবং এই জঙ্গলের মধ্যেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখেছে কে! আর বটগাছের চাতালে বসে একজন বুড়ো মানুষ থেলো হুঁকোয় তামাক খাচ্ছেন।

অনেকটা হাঁটা হয়েছে, তাই গদাইবাবুর একটু জিরোতে ইচ্ছে করছিল। তিনি গিয়ে বুড়োমানুষটির কাছাকাছি একটু তফাত হয়ে সাবধানে বসলেন। বুড়োমানুষের মেজাজ মর্জির কোনো ঠিক নেই। বেমক্কা রেগে টেগে যায়। তাই গলাখাঁকারি দিয়ে ভারি বিনয়ের সঙ্গেই বললেন, মশাইয়েরকী এই অঞ্চলে থাকা হয়?

বুড়োমানুষটি বললেন, তাও বলতে পারো। তবে কিনা, আমার থাকার কোনওঠিক নেই, যততত্রও থাকতে হয়।

আহা, এই বয়সে যেখানে-সেখানে থাকা কি ভালো? আপনার নিজের লোকেরা সব কোথায়?

তারাও সর্বত্রই আছে। এই যে বাপু তুমি। তুমিও কি আমার আপনজন নও?

গদাইবাবু একটু ভড়কে গিয়ে বললেন, তা বটে! একদিক দিয়ে দেখতে গেলে হয়তো তাই। তবে কিনা আপনার তো একটা ঠিকানাও থাকবার কথা! যেখানে আপনার নিজের জনেরা থাকেন!

তা আর নেই! খুব আছে। কত ঠিকানা চাও? টুকে কূল করতে পারবে না। ধরো, একটা ঠিকানা হল, বিষ্টুপুর গাঁয়ে গদাধর পালের বাড়ি। ঠিকানাটা কি চেনা চেনা লাগছে?

কী যে বলেন! এ তো আমার ঠিকানা! আমার গাঁয়ের নাম আপনি জানলেন কী করে সেটাই বুঝতে পারছি না। আমি তো আপনাকে চিনিই না!

কিন্তু আমি যে বাপু তোমাকে বিলক্ষণ চিনি! তোমার তিন ছেলে, দুই মেয়ে, তোমার বউয়ের বাতব্যাধি, তোমার মা হাঁপানিতে ভোগেন, তোমার বাবার সাতাশি বছর বয়স, তোমার টগর নামের গরুটা এ বছরও এঁড়ে বাছুর বিইয়েছে! প্রতিবেশী হরেনবাবুকে তুমি মোটেই পছন্দ করো না, তোমার কুষ্ঠিতে বাহান্ন বছর বয়সে একটা জলের ফাঁড়া আছে। মহেন্দ্র ঘোষ তোমার কাছে সাতশো টাকা পায়, কিন্তু সেটা শোধ দেওয়ার তোমার মোটে ইচ্ছে নেই।

গদাইবাবুর মুখে কথা সরছিল না। বড় বড় চোখ করে পলকহীন চেয়েছিলেন। এ তো তাজ্জব ব্যাপার! এ লোকটা যে তাঁর নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখে! অন্তর্যামী নাকি রে বাবা!

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, তা অন্তর্যামী মনে করলেও করতে পারো, তাতেও ভুল হবে না।

গদাইবাবু বেজায় ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, আপনি আসলে কে বলুন তো! আমার যে একটু ভয়-ভয় করছে!

তা ভয়ের আর দোষ কী! অকাজ কুকাজ করলে ভয় ভীতি জেঁকে বসারই কথা কিনা! গত বুধবার যে বাজারের শাকউলি আধকানা বুড়ি শিবুর মাকে একখানা জালি নোট গছিয়ে শাক কিনলে, সেকথা আর কেউ না জানলেও আমি কিন্তু জানি।

গদাইবাবু এমনিতেই একটু ঘামছিলেন। একথায় ঘাম যেন ডবল হল। গলার স্বরও তেমন ফুটল না। ফিসফিসে গলায় বললেন, আজ্ঞে আমাকে ছলনা করবেন না! আপনি সামান্য মনিষ্যি নন, এটা আমি বেশ বুঝেছি।

বুঝে থাকলে ভালোই। তবে কিনা তুমি হলে জ্ঞানপাপী।

আপনি ভগবান-টগবান নন তো!

তাহলে কী বাপু তোমার কিছু সুবিধে হবে?

তা যে হয় না তা কিন্তু নয়। অনেকদিন ধরে ভাবছিলুম ভগবানকে সামনে পেলে কয়েকটা দরকারি কথা কয়ে রাখব। ডাকাডাকি কিছু কম করিনি মশাই, কিন্তু ভগবানের দোষ কী জানেন, তিনি বড্ড একচোখো। আমি ডাকাডাকি করলে না শোনার ভান করে আলগা থাকেন। কিন্তু হরেনবাবু ডাকলে পড়ি কি মরি করে ছুটে আসেন। চাইবারও দরকার হয় না, না চাইতেই ঝাঁপি উপুড় করে ঢেলে দেন। এটা অবিচার কিনা তা আপনিই বলুন।

তা বটে। এ তো অন্যায্যই হচ্ছে বলে মনে হয়। তা বাপু তোমার কথাটা কী? আমাকে বলা যায়?

তা বলা যায়, দুঃখের কথা শোনার লোকও তো বড্ড কমে গেছে মশাই।

তোমার কি বাপু খুব দুঃখ?

ঝুড়ি ভরা মশাই, ঝুড়িভরা। আমার দুঃখের কি শেষ আছে! আমার কপালেই এঁড়ে বাছুর, আমার ছেলেই ফেল মারে, কেষ্টবিষ্টুরা দূরছাই করে, লটারি লাগে না। অথচ হরেনবাবুকে দেখুন, পরেশবাবুকে দেখুন, নিতাই নাগকে দেখুন। ভগবান যে কীরকম একচোখো তা টের পাবেন।

তাই তো হে। তোমার দিকটাও তো ভাবতে হবে। তবে শুনেছিলুম যেন তুমি নাকি তোমার শ্বশুরবাড়ির প্রায় বিশ লাখ টাকার সম্পত্তি পেয়েছ, আর বীরকান্তপুরের রাজার পিসির মেলা গয়নাগাটি নাকি বিক্রি করতে নিয়ে আর ওমুখো হওনি। শুনেছিলুম সেই গয়নার দাম নাকি পঞ্চাশ লাখ টাকার ওপর।

আপনার দোষ কী জানেন, আপনি বড্ড উড়ো কথায় কান দেন। বিশ লাখ টাকার সম্পত্তি যেন ছেলের হাতের মোয়া! আর রাজার পিসির গয়না তো সব গিল্টি করা মাল। বিক্রি করে বোধহয় বিশ-ত্রিশ টাকা পাওয়া গিয়েছিল। তা দেব দেব করেছিলাম, কিন্তু পিসি টসকে গেল বলে আর দেওয়া হয়নি।

বটে! তাহলে বলছ যে লোকে খামোখা তোমার বদনাম করে বেড়াচ্ছে! এটা তো বাপু ভারী অন্যায়!

আজ্ঞে ওইজন্যই তো ভগবানের সঙ্গে একবার দেখা হওয়া খুব দরকার। এসব অন্যায়ের কি একটা বিহিত হওয়া উচিত নয়?

তা তো বটেই হে বাপু! তবে কিনা কানাঘুঁষো যেন শুনলুম রামকেষ্টপুরের নিধিরাম মারা গেলে তার বারো বিঘে জমি নাকি তুমি জাল দলিল করে গাপ করেছ। নিধিরামের নাবালক ছেলেমেয়েরা নাকি প্রায় উপোস করে মরবার জোগাড় হয়েছে। ভিক্ষেসিক্ষে করে কোনওরকমে তাদের গ্রাসাচ্ছাদন চলছে!

নিন্দুকদের কাজই তো আষাঢ়ে গল্প বানানো। বিশ্বাস করলেন নাকি ও কথা? আসলে ব্যাপারটা হল, নিধিরাম বছর পাঁচেক আগে মোটা টাকা ধার নিয়ে ফেঁসে যায়। তার বিপদের কথা শুনে আমি তাকে বাঁচানোর জন্যই চড়া দাম দিয়ে জমিটা কিনি। যাতে সে ধার শোধ দিয়ে হাজতবাস থেকে বাঁচতে পারে। পরের উপকার করতে নেই মশাই, কপালে দুর্নাম জোটে।

তাই তো হে। তোমার মতো মানুষের সঙ্গে তো এ রকম করা মোটেই উচিত নয়! কিন্তু একথাও হাটে-বাজারে কান পাতলে শোনা যায় যে, তুমি নাকি ভারি চড়া সুদে গরিবদের টাকা ধার দাও। চক্রবৃদ্ধি হারে সেই টাকার সুদ নাকি আসলের চেয়েও অনেক বেড়ে যায়। সেই টাকা শোধ দিতে না পেরে অনেকে নাকি

আত্মহত্যা করেছে, অনেকে পাগল হয়ে গেছে, কেউ কেউ বিবাগী হয়ে গেছে। আজ অবধি নাকি কেউ তোমার ধার শোধ করতে পারেনি! এও কি গুজব নাকি হে বাপু?

মোটেই ওসব নকড়া-ছকড়া কথায় কান দেবেন না। তবে একথা ঠিক যে, গরিবের দুঃখে আমার প্রাণ কাঁদে, তাই ঠকে যাওয়ার ভয় থাকলেও আমি গরিবদের সাহায্য না করে পারি না। আর ধার দিয়ে দিয়ে আমার প্রায় ফতুর হওয়ার জোগাড়। একজনও আজ অবধি ধার শোধ দেয়নি। এ সব দুঃখের কথা কওয়ার জন্যেই তো আমি ভগবানকে খুঁজছি। দেখা হলে বলব, ভগবান, লাখ পঞ্চাশেক টাকা পাইয়ে দাও, জমিয়ে সুদের কারবারটা ফের শুরু করি।

বুড়ো লোকটা গদাইবাবুর দিকে মিটিমিটি চেয়ে মুচকি একটু হাসল। তারপর বেজায় ভালোমানুষের গলায় বলল, মোটে পঞ্চাশ লাখ! তার বেশি নয়?

প্রথমেই বেশি চেয়ে বসলে ভগবান বিগড়ে যেতে পারেন তো! তাই অল্প দিয়েই শুরু তো করি, তারপর তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়াটা হয়ে গেলে মোটা দাঁও মারা যাবে। কী বলেন?

সে তো ভালো কথাই হে! ভগবান লোকটা বোধহয় তেমন চালাক চতুরও নয়, কী বলো? তাহলে ভগবানের সঙ্গে মোলাকাতটা হলেই হয়, তাই না?

যে আজ্ঞে। তা আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি বোধহয় ভগবানের সুলুক-সন্ধান জানেন।

সে তুমিও জানো। সবাই জানে। ভগবান তো ধরা দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছেন বলেই আমার মনে হয়। সপাটে ধরতে পারলেই হল।

বটে! তা ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু ভিড়িয়ে দিন না। না হয় তার জন্য কিছু খরচাপাতিও দেব'খন। কত দিতে হবে বলুন তো?

ওরে বাবা, সে মেলা টাকার ধাক্কা হে বাপু। ও রাস্তায় তেমন সুবিধে হবে না।

তাহলে উপায়?

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কাজটা কিন্তু কঠিন।

আহা, বলেই তো দেখুন।

নিধিরামের সব জমি ফিরিয়ে দাও, বুড়ো রাজামশাইয়ের কাছে গিয়ে তাঁর পিসির গয়নার দাম পুরো পঞ্চাশ লাখ টাকা মিটিয়ে দিয়ে আসতে হবে। গরিবদের যত ধার দিয়েছ, তার সবটুকু মাপ করে দিতে হবে। বলি, পারবে তো?

গদাইবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আপনি যে একজন ঘোড়েল লোক তা প্রথম থেকেই বুঝেছিলাম।

তা আছি একটু ঘোড়েল। বেশ করে ভেবে দেখো গে, যা বললুম তা পারবে কিনা।

গদাইবাবু একটু ভাবলেন, তারপর বড় একটা শ্বাস ফেলে বললেন, কী কুক্ষণে যে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কে জানে!

তাহলে বরং মানে মানে কেটে পড়ো।

গদাইবাবু খিঁচিয়ে উঠে বললেন, তাহলেই কি আপনার হাত থেকে রেহাই পাব! আপনি কি আর তত ভালোমানুষ! সারা জীবন তো দগ্ধে দগ্ধে মারবেন।

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল?

আজ্ঞে ওই যা বললেন তাই হবে। এত ভ্যানতাড়া না করেই আগে তো বলে দিতে পারতেন যে আপনিই ভগবান!

অঙ্ক

গাড়িটা আজ সকাল থেকেই গন্ডগোল করছিল। মাঝে মাসে স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায় মাঝে মাঝে ইঞ্জিনে ধাক্কা লেগে গাড়ি কেঁপে ওঠে। অধ্যাপক সারদাচরণ মুস্তফি তাঁর ড্রাইভার পাঁচুগোপালকে বললেন ওহে পাঁচু, গাড়িটার আজ হল কী? আমার যে জরুরি মিটিং।

পাঁচুগোপাল পুরোনো ড্রাইভার, এ গাড়ির নাড়ি নক্ষত্র তার জানা, বলল, চিন্তা করবেন না বাবু, তেলে ময়লা এলে এরকম হয়। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে গাড়িটা কোনও কারখানায় গিয়ে সারিয়ে নেব।

সারদাচরণ অঙ্কের খুব বড় পণ্ডিত। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তি কিংবদন্তীর মতো। দেশে-বিদেশে সুনাম। আজ কলকাতার একটি নামি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশ থেকে কয়েকজন অঙ্কবিদ আসছেন। মিটিং তাঁদের সঙ্গে তারপর তিনি যাবেন বনগাঁয়ের কাছে এক গ্রামে তাঁর মামার বাড়িতে, সেখানে তাঁর পরিবারের লোকজন আজ সকালেই চলে গেছে। আগামীকাল শনিবার সেখানে পিকনিক হবে। সুতরাং সারদাচরণের ভ্রু কুঁচকে গেল। গাড়ি যদি বিগড়োয় তবে এতখানি রাস্তা, পেরোবেন কী করে?

যাই হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ে সময় মতোই তাঁকে পৌঁছে দিয়ে পাঁচুগোপাল গাড়ি নিয়ে সারাতে গেল।

মিটিং-এ অঙ্কশাস্ত্রের আলেচনায় ডুবে গিয়ে সারদাচরণের আর গাড়ির কথা মনেই রইল না।

মিটিং-এর পর লানচ এবং গল্পগুজবের পর সারদাচরণ যখন তাঁর গাড়িতেবনগাঁ রওনা হলেন তখন শীতের বেলা ফুরিয়ে এসেছে। বনগাঁ অনেকটা রাস্তা।

কলকাতা শহর ছাড়িয়ে যশোর রোড ধরতে না ধরতেই সন্ধে হয়ে গেল। গাড়িতে বেশি স্পিডও তোলা যাচ্ছে না। আগের মতো না হলেও একটু খুটখাট করছে গাড়িটা। সারদাচরণ চিন্তায় পড়লেন। বনগাঁর কাছে এক নিকর্ষি গ্রামে তিনি বিশাল বাগানবাড়ি করছেন, সেখানে সুইমিং পুল, ব্যাডমিন্টন কোর্ট সব আছে। তাঁর চার ছেলে, দুই মেয়ে, তাঁর স্ত্রী, চার বউমা, দুই জামাই এবং বারো জন নাতি নাতনী তার জন্য অপেক্ষা করছে। খাওয়া-দাওয়ার বিরাট আয়োজন হয়েছে। মেজো জামাই ভালো ম্যাজিক দেখায় সে ম্যাজিক দেখাবে। নাতি নাতনীরা আজ শাপমোচন গীতি নাট্য করবে। কালকেও অনেক মজা টজা হবে। এই পারিবারিক আনন্দোৎসব খুবই ভালো লাগে তাঁর। তাই তাড়াতাড়ি পৌঁছোনোর জন্য একটা ব্যস্ততা ছিলই।

গাড়িটা অবশ্য অনেক পুরোনো অস্টিন, গাড়িটার বয়স হয়েছে। মায়াবশে সারদাচরণ এটাকে ছাড়তে পারেন না। তাঁর পরিবারের লোকেরা এ গাড়িতে চড়েই না। তাদের জন্য সুমো আর আর্মাডা গাড়ি আছে, একটা মারুতিও।

বনগাঁ অবধি গাড়ি পৌঁছতে রাত নটা বেজে গেল। সারদাচরণ বললেন আরও পাঁচমাইল পথ।

ভাববেন না বাবু, পৌঁছে যাবো।

বনগাঁ থেকে খামারের রাস্তাটা বিশেষ ভালো নয়। বড্ড ভাঙাচোরা আর খুবই নির্জন। চুরি-ডাকাতির বদনাম আছে। তবে তাঁর খামার বাড়িতে বিস্তর লোক চাকর বাকর দারোয়ান এবং সিকিউরিটি গার্ডের অভাব নেই। কিন্তু এ রাস্তাটা মানে মানে পার হওয়া দরকার।

বিপদের ভয় যেখানে বিপদও সেখানেই, নির্জন , জনহীন জংলা একটা জায়গায় দুবার ঘটাং শব্দ করে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল।

কী হল হে পাঁচু?

পাঁচু 'দেখছি' বলে টর্চবাতি নিয়ে নেমে বনেট খুলে খুটখাট করতে লাগল।

সারদাচরণ নেমে একটু আড়মোড়া ভাঙলেন, হঠাৎ তাকে চমকে দিয়ে তিনটে লোক সামনে এসে দাঁড়াল। সারদাচরণ চমকে গেলেও ভয় পেলেন না। এদের চেহারা ডাকাতের মতো নয়, বরং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতোই। পরনে ধুতি, গায়ে উড়ুনির মতো কিছু একটা। এই শীতের পক্ষে পোশাক খুবই যৎসামান্য। সামনের জন করজোড়ে বলল, আপনি কি বিখ্যাত অঙ্কবিশারদ শ্রীসারদাচরণ মুস্তফি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মহাশয়, আমরা বিপন্ন। আপনি আমাদের সাহায্য করিবেন কি?

বিস্মিত সারদাচরণ বললেন, আপনারা কারা?

আমরা এ স্থানের অধিবাসী নই। আগন্তুক মাত্র।

কোথা থেকে আসছেন?

সহস্র সহস্র আলোকবর্ষ দূর হইতে মহাশয়।

সারদাচরণ হাঁ হয়ে রইলেন। পাগল নাকি লোকটা?

মহাশয়, আমাদিগকে অবিশ্বাস করিবেন না। আমাদের সুবিশাল নক্ষত্রটির নাম পৌলমী, তাহাকে ঘিরিয়া সহস্রাধিক গ্রহ পাক খাইতেছে। তাদের মধ্যে প্রায় এক সহস্র গ্রহে মনুষ্য বসবাস করে। জীবজগৎ ও উদ্ভিদও আছে। তবে দুই তিন শত গ্রহে প্রাণের চিহ্ন নাই।

পাগলই বটে। সারদাচরণ বললেন, তা এলেন কী করে? মহাকাশ পাড়ি দেওয়ার অনেক ঝক্কি, সময়ও অনেক লাগে, যা কিনা এক আয়ুস্কালে সম্ভব নয়।

মহাশয় সব কথা বুঝিবেন না, তবে আপনি পণ্ডিত মানুষ, সম্ভবত জানেন মহাকাশ পাড়ি দিতে হইলে পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করিতে হয়।

জানি, কিন্তু সেটা বাস্তবে অসম্ভব।

লোকটা অমায়িক হেসে বলে, মহাশয়, ওসকল কথা আপাতত থাকুক। আপনি ঈষৎ ক্লেশ স্বীকার করিয়া একটু আসিবেন কি? অদূরেরই আমাদের যান রহিয়াছে।

ভয়ের চেয়ে কৌতূহল সর্বদাই প্রবল। সারদাচরণ পাগলের কাণ্ড দেখতে রাজি হয়ে তাদের পিছু পিছু একটা মাঠের ভিতর দিয়ে খানিক হাঁটতেই অবাক হয়ে দেখল, অন্ধকার মাঠের মধ্যে সত্যিই একটা বড় গোলাকার জিনিস রয়েছে।

বিস্ময়ের পর বিস্ময়, লোকগুলোর সঙ্গে ভিতরে ঢুকে দেখলেন, বিশাল অচেনা সব যন্ত্রপাতিতে অভ্যন্তরটা ঠাসা। বিচিত্র শব্দও হচ্ছে। তাঁর মুখ দিয়ে বাক্য সরল না। হ্যাঁ করে দেখতে লাগলেন। স্বপ্ন দেখছেন কিনা তাও বুঝতে পারছেন না।

নাদুস নুদুস লোকটা তাঁকে একটা চেয়ারের মতোই আরামদায়ক আসনে বসিয়ে সামনে টেবিলের মতোই একটা জিনিসের ওপর একটা খাতা খুলে দিয়ে বলল, মহাশয়, এই অঙ্কটি দয়া করিয়া কষিয়া দিবেন কি?

সারদাচরণ বললেন, আপনারা সাধু বাংলায় কথা বলছেন কেন?

মহাশয়, ইহাই আমাদের ভাষা, আমাদের গ্রহে ওই ভাষার নাম সুধাক্ষর।

আপনারা বাঙালি?

না মহাশয়, আমরা সুধং জাতির লোক। এখানে আসিয়া কিন্তু বিপদে পড়িয়াছি। এই অঙ্কটি না মিলিলে আমরা আমাদের মহাকাশযান সঠিক নিশানায় উৎক্ষেপন করিতে পারিব না।

কেন, অঙ্কটি কি কঠিন?

সম্ভবত নহে। কিন্তু ইহা আপনাদের গ্রহের অঙ্ক। আমাদের গ্রহে এইরূপ অঙ্ক অচল। কিন্তু এই গ্রহ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইতে হইতে এই স্থানের অঙ্কেরই সাহায্য লইতে হইবে। বুঝিয়াছেন?

বুঝেছি।

সারদাচরণ অঙ্কটি দেখলেন। বেশ কঠিন একটা ক্যালকুলেশন। গতিবেগ, আবহ, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি সংক্রান্ত। কঠিন হলেও অসাধ্য নয়। সারদাচরণ কলমের মতো জিনিসটি হাতে নিয়ে খাতার মতো জিনিসটির ওপর অঙ্কটি কষতে লাগলেন। অঙ্কে ডুবে যাওয়ায় তাঁর আর কিছু খেয়াল রইল না।

শেষ করে তিনি বললেন, এই নিন, হয়ে গেছে। আমি এ সময়ে এখানে না এলে কী করতেন?

লোকটি বিগলিত হয়ে বলল, মহাশয়, সবই হিসাব সাপেক্ষ, ভবিতব্যও বটে। আপনাকে আসিতেই হইত। কোনও ঘটনাই আকস্মিক ঘটে না। ঘটাইতে হয়।

হেঁয়ালি নাকি?

আপাতত তাহাই মনে করুন। চলুন, আপনার গাড়ি আমাদের যন্ত্রবিদরা মেরামত করিয়া দিয়াছে। উহা আর কখনও গণ্ডগোল করিবে না।

সারদাচরণ এসে দেখলেন, সত্যিই গাড়ি ঠিক হয়ে গেছে। পাঁচু বলল, বাবু, এরা সব ওস্তাদ মিস্ত্রি। পাঁচ মিনিটে সারিয়ে দিল।

সারদাচরণ একটা অদ্ভুত গোঁ-গোঁ শব্দ শুনে পিছু ফিরে দেখলেন, গোলাকার জিনিসটা হঠাৎ নক্ষত্রবেগে অন্ধকার আকাশে উঠে চোখের পলকে মিলিয়ে গেল।

পাঁচু অবাক হয়ে বলল কী বাবু ওটা?

আমিও জানি না, গাড়ি ঠিক আছে তো!

আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, ইঞ্জিনের কোনও শব্দই হচ্ছে না। মাখনের মতো চলছে।

খামারবাড়িতে পা দিতেই বড় নাতনী ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বলল, এত দেরি হল যে! কী করছিলে দাদু?

সারদাচরণ গম্ভীর মুখে বলল, একটা খুব শক্ত অঙ্ক করছিলাম।

দু'নম্বর পুরুত

নরেনবাবু পুজোর আয়োজন করে বসে আছেন, ওদিকে পুরুতের দেখা নেই।বারবার টেলিস্কোপে আকাশের সর্বত্র তল্লাস নেওয়া হচ্ছে, সব ভোঁ ভোঁ। আজ সরস্বতী পুজো, আন্তগ্রহ মহাকাশযান চালকও কম। ঘণ্টা দুই আগে খবর পাওয়া গেছে গদাই ভট্টাচার্যের পুষ্পকরথ চাঁদ হয়ে আসবে বলে পৃথিবী থেকে রওনা হয়েছে। চাঁদেও মস্ত পুজো। তাহলেও এতক্ষণ লাগবার কথা তো নয়। এদিকে নরেনবাবু বিশাল আয়োজন করে বসে আছেন। চার হাজার বর্গমাইল বসতি এলাকা থেকে অন্তত হাজার তিনেক মানুষ বৌ-বাচ্চা নিয়ে সাবওয়ে ধরে এখানে হাজির হয়েছে। বিশাল কমিউনিটি হলে জড়ো হয়ে সবাই অপেক্ষা করছে। প্রতিমা সাজ-সজ্জা সব শেষ। ফুল, বেলপাতা, ধূপ, ধুনো সবই রেডি। মহিলারা লালপেড়ে শাড়ি পরে শাখ নিয়ে তৈরি, বাচ্চারা হল্লাগোল্লা করে বেড়াচ্ছে। প্রকাণ্ড রান্নাঘরে বড় বড় সৌর-চুল্লিতে খিচুরি, লাবড়া, পাপর ভাজা, আলুর দম, বেগুনি, চাটনি, পায়েস সব রান্না হচ্ছে। অঞ্জলি দিয়ে সবাই খেতে বসবে। এখন গদাই ভট্টাচার্য এলেই হয়।

আশু ঘোষ মস্ত ইঞ্জিনিয়ার, নরেনবাবুর কাঁধে একটা থাবড়া দিয়ে বললেন কি হে তোমার পুরুত কোথায়? সকাল থেকে উপোস করে আছি। পেটে যে দাবানল জ্বলছে হে!

উদ্বিগ্ন নরেনবাবু বললেন, এসে যাবেন এখুনি।

চাঁদ থেকে মঙ্গলে আসতে কত সময় লাগে বাবা! এ তো একটুখানি পথ। টেলিফোন করছ না কেন?

একটু আগেই করেছি। চাঁদের পুজো হয়ে গেছে। ঠাকুরমশাই রওনা হলেন বলে।

আশুবাবুর আট বছরের ছেলে কনিষ্ক আরও গোটা কুড়ি বন্ধু-বান্ধবসহ দৌড়ে এসে বলল, বাবা, আমরা একটু বাইরে খেলি গে?

আশুবাবু একটু উদ্বিগ্ন হলেন মঙ্গলগ্রহে পৃথিবী থেকে আসা কোনও মানুষই খোলা জায়গায় থাকতে পারে না। কারণ, মঙ্গলে আবহমন্ডল বলতে কিছু নেই। অক্সিজেন ও বাতাসের অভাবে কয়েক মিনিটেই মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু এইসব বাচ্চা-কাচ্চারা মঙ্গলগ্রহেই জন্মেছে। আশ্চর্যের বিষয় এরা মঙ্গলে খোলা জায়গায় এক-দেড় ঘণ্টা মতন দিব্যি খেলা করে বেড়াতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এইসব বাচ্চাদের ফুসফুসের ক্ষমতা অনেক বেশি। শরীরের ভেতরকার গঠনও অন্যরকম। আশুবাবু একটু দোনামনা করে

বললেন যাও কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে এসো, অঞ্জলি দিতে হবে, মনে রেখো। বাচ্চারা দৌড়ে বেরিয়ে গেল। নরেনবাবুর সেল ফোন বেজে উঠল। নরেনবাবু বললেন, হ্যালো, চাঁদ থেকে অভিরাম বলছি।

অভিরামঃ আরে কি খবর? গদাই ভট্টাচার্য রওনা হয়েছে?

আজ্ঞে একটু মুশকিল হয়েছে দাদা।

কি মুশকিল?

ঠাকুরমশাই পায়েসটা একটু বেশি খেয়ে ফেলেছেন। বড্ড আইঢাই হচ্ছে।

বলো কী আমার পুজো কে করবে?

তার জন্য ভাবনা নেই আমরা নয়ন ভট্টাচার্যকে পাঠিয়ে দিয়েছি আর দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে।

নয়ন ভট্টাচার্য। সে আবার কে?

ভালো পুরুত দেখুন না পরীক্ষা করে।

দশ মিনিটের মধ্যেই নয়ন ভট্টাচার্যের মহাকাশযান এসে নামল। নয়ন ভট্টাচার্যের চেহারাখানা বেশ তাগড়াই। মস্ত শিখা, গায়ে নামাবলী, পরনে ধুতি, পায়ে খড়ম, মহাকাশচারীর পোষাক ছাড়াই নয়ন ভট্টাচার্য তার গাড়ি থেকে নেমে প্রায় বিশ গজ রাস্তা খট-খট করে হেঁটে এসে কমিউনিটি হলে ঢুকল। সবাই অবাক। পৃথিবী থেকে আসা মানুষ হলে এতক্ষণে মঙ্গলের খোলা জায়গায় অক্কা পাওয়ার কথা।

ভট্টাচার্য কারোর সঙ্গে বিশেষ কথা-টথা কইল না। গম্ভীর মুখে গিয়ে পুজোয় বসল এবং বিশুদ্ধ সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ করে বেশ ভক্তিভরে পুজো সেরে সবাইকে অঞ্জলি দেওয়ালো তারপর চাল-কলার পুটুঁলি নিয়ে উঠে পড়ে বলল, আমার তাড়া আছে আমি যাচ্ছি। নরেনবাবু তাঁকে দক্ষিণা ধরিয়ে দিয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে চাপা স্বরে বললেন আপনি আসলে কে?

নয়ন ভট্টাচার্য তাছাড়া কে?

উঁহু টিকিটা লক্ষ করেছি।

তাই নাকি? তাহলে চেপে যান।

যাচ্ছি কিন্তু সকলের চোখকে ফাঁকি দিলেও আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সোজা নয় হে বাপু। তুমি হলে রোবট। গদাই ভট্টাচার্য এখন তোমাকে দিয়ে কাজ সারছেন।

নয়ন মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেল।

অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্চ হল না। সকলেরই প্রচণ্ড খিদে। আর খিচুড়িটাও হয়েছে দারুণ। হইহট্টগোলে পুরুতের প্রসঙ্গটা কারও মনে উদয় হল না। পুরুতকে আর কে মনে রাখে?

'সাতপুরার হাট'

ভারু ভারী ভালো মানুষ, সাতপুরার হাটে সে সব্জী বিক্রি করে কোনও রকমে সংসার চালায়। তার জোত জমি বেশি নেই, মাত্র বিঘে তিনেক জমি। সে নিজেই লাঙল দেয়। জমিটুকুতে সব্জী ফলায়, তবে সে কেমিক্যাল সার বা পোকা মারার ওষুধ ব্যবহার করে না। সামান্য গোবর বা পচাই সার তার সম্বল। কেমিক্যাল সার দিলে সব্জীর স্বাদ ভালো হয় না। আর পোকা মারার ওষুধ দিলে যারা কিনবে তাদের অসুখ বিসুখ বা বিষক্রিয়া হওয়ার ভয় থাকে। ভারু ধর্মভীরু মানুষ, সে ওসব পন্থা নেয় না, ফলে তার মূলো বেগুন পালং কপি বা ধনেপাতা কোনওটাই তেমন ফসফস করে বেড়ে ওঠে না। পোকাও লাগে, ফলে তার সব্জীর চেহারা ভালো নয়। কেমন যেন খেঁুয়রে মরকুটে, ফয়লাটে চেহারা, তা সেসবই নিজের পুরোনো ভ্যানগাড়িটায় চাপিয়ে সে সাতপুরার হাটে বেচতে আসে। বলতে নেই, তার খদ্দেরও তেমন হয় না। দু-চারটে গরিব খদ্দের কম পয়সায় কিছু কিনে নিয়ে যায় বটে, কিন্তু বেশির ভাগ সব্জীই পড়ে থাকে, অনেকেই বলে, ওহে ভারু, আদ্দিকালের ধারণা নিয়ে বসে থাকলে তো কিছু হবে না, ভালো সার, ভালো পোকার ওষুধ দিয়ে দেখ সব্জীর যেমন ফলন হবে, বাজারে পড়তে পারবে না, কিন্তু ভারু তাতে রাজি নয়।

গত তিন চার সপ্তাহ মোটেই বিক্রিবাটা ভালো হয়নি। গেল হপ্তায় তো সাকুল্যে বিক্রি হয়েছিল বাইশ টাকার সব্জী, এরকম ধারা চললে ভারুকে এরপর বউ বাচ্চা নিয়ে উপোস করতে হবে।

আজও ভারু সকাল সকালই এসে তার সব্জীর পসরা সাজিয়ে বসেছে। চারদিকে মেলা দোকানপাট, বিক্রিও হচ্ছে রমরম করে, শুধু তার কাছেই খদ্দেরের আনাগোনা নেই, তবে শীতের মিঠে রোদে বসে থাকতে ভারুর কিন্তু খারাপ লাগছে না। হাটের দৃশ্য দেখতেও ভারী ভালো।

একজন দাড়িওয়ালা মাঝবয়সী লোক দুটো বড় বড় থলি হাতে সব্জীর দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াচ্ছে আরও অনেকের মতো, লোকটা বেশ ঢ্যাঙা, চেহারাটা রোগা আর চোঁয়াড়ে মতো, মনে হয় রাগী লোক, পোশাকটাও একটু কেমন যেন আউল বাউলদের মতো জোব্বা পরা, দেখে মনে হয় গাঁইয়া লোক নয়।

ভারু দেখলে লোকটার কারও সব্জীই পছন্দ হচ্ছে না, মহেশতলার গণেশ অ্যাই বড় বড় দুধ সাদা ফুলকপি নিয়ে বসেছে, সঙ্গে এক হাত লম্বা রাঙা পুরুষ্টু মূলো, লসলসে পালং, সবুজ ফুটবলের মতো বাঁধা কপি। লোকটা সবই হাতে নিয়ে একটু দেখল তারপর মাথা নেড়ে রেখে দিল, অন্যরা থাবাথাবি করে কিনছে, কিন্তু লোকটার ভালো লাগল না।

পায়ে পায়ে লোকটা তার সামনে এসে দাঁড়াতেই সরু একটু জড়োসড়ো হয়ে গেল। গনেশের সব্জীই যখন পছন্দ হয়নি তখন তার তো কোনও আশাই নেই। লোকটা তার একখানা খেঁকুড়ে কপি তুলে ভ্রু কুঁচকে খুব

ভালো করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল, তারপর পকেট থেকে একখানা ছোট দেশলাই বাক্সর মতো যন্ত্র বের করে কপিটার গায়ে লাগিয়ে কী যেন পরীক্ষা করল, তারপর বেশ ভারিক্কী গলায় বলল, কত দাম হে?

ভারু দাম কখনও বেশি নেয় না। সে লোভী লোক নয়, সে বিনয়ের সঙ্গে বলল, আজ্ঞে তিন টাকা।

লোকটা তার মুলো পালং বাঁধা কপি লঙ্কা সবই একে একে দেখল, তারপর বলল, তোমার সব সব্জীই আমি কিনে নিচ্ছি, হিসেব করে দাম বলো।

অ্যাঁ! বলে ভারু হাঁ করে রইল, বলে কী লোকটা? মাথা খারাপ নয় তো! যাই হোক সে তাড়াতাড়ি হিসেব করে বলল, আজ্ঞে দেড়শো টাকা, সব নিচ্ছেন বলে পাইকারী করে দিচ্ছি।

লোকটা দরাদরি না করে দাম দিয়ে বলল, একটু কষ্ট করে আমার গাড়িতে তুলে দাও, আর পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি।

ভারু জিব কেটে বলে, ছিঃ ছিঃ মাল গাড়িতে তুলে দেব তাতে পয়সা কীসের? ও লাগবে না।

লোকটা গম্ভীর মুখে বলল, তা হয় না, পরিশ্রম করবে আর পারিশ্রমিক নেবে না কেন? এই নাও পঞ্চাশ টাকা।

ভারী লাজুক মুখে ভারু নিল, সব্জী সব বস্তায় ভরে হাটের গা ঘেঁষে দাঁড় করানো একটা ভ্যানগাড়ির মতো গাড়ির পাটাতনে তুলে দিল। দেখল, গাড়িটা আর পাঁচটা ভ্যানগাড়ির মতো নয়। নীচে চাকা দেখা যাচ্ছে না, পুরোটাই ঢাকা, তারপর একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল, বাবুটি গাড়ির সামনে একটা গদিওয়ালা সিটে উঠে বসে একটা হাতলে চাপ দিতেই ভুস করে একটা শব্দ হল আর গাড়িটা হঠাৎ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

হাঁ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ভারু। ভুতুড়ে কাণ্ড নাকি রে বাবা! তবে ভারু চেঁচামেচি করল না, মেলা টাকা এসেছে হাতে। সে তাই হাট থেকে দরকারি জিনিসপত্র কিনে আজ বেলাবেলি বাড়ি ফিরে গেল।

পরের হাটবারে ভারু একটু বেশি জিনিসপত্র নিয়েই হাটে এল, একটু ভয়ে ভয়েই এল। বাবুটি ভূত না মানুষ তা সে বুঝতে পারছে না, তাই একটু ভয় ভাবনাও হচ্ছে।

দোকান সাজিয়ে বসবার কিছুক্ষণ পরেই সেই বাবুটি এসে হাজির, আবার সেই যন্ত্র দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা, দর জিগ্যেস করা।

ভারু এক ফাঁকে জিগ্যেস করল, বাবু যদি অভয় দেয় তো একটা কথা জিগ্যেস করব।

কী কথা?

আজ্ঞে আপনি আগের দিন ওরকম বাতাসে মিলিয়ে গেলেন কেমন করে? আমার খুব ভয় করেছে।

বাবুটি মৃদু হেসে বলল, ভয় নেই, আমার গাড়িটা বাতাসে মিলিয়ে যায় না, আসলে ওটা অন্য একটা সময়ে চলে যায়।

আজ্ঞে, কথাটা ঠিক মাথায় সেঁধোলো না।

না বুঝলেও ভয় পেও না, ভূতুড়ে ব্যাপার নয় হে।

আর একটা কথা বাবু, আপনি আমার অপুরুষ্টু সব্জী সব কিনে নেন, আর কেউ তো নেয় না।

তোমার সব্জীর ফলন তেমন ভালো নয় বটে, তবে সব্জীগুলোয় কোনও বিষাক্ত জিনিস নেই, আর স্বাদও ভালো।

সব্জীর দাম দাঁড়াল আড়াইশো টাকা। সেই সঙ্গে ফের পঞ্চাশ টাকা মজুরি।

না। কপালটা বোধ হয় ফিরছে ভারুর।

সপ্তাহে দুটো হাটবার, রবি আর বৃহস্পতিবার, ভারুর সব্জীর খেতের প্রায় সব সব্জীই মোট পাঁচটা হাটবারে বিক্রি হয়ে গেল।

পরের হাটবারে লোকটা যখন ফের এসে ভারুর সব সব্জী কিনে নিল তখন ভারু বলল, বাবু আমার বাগানে আর যা সব্জী আছে তাতে তার চারটে হাটবার চলবে, তারপর শেষ হয়ে যাবে।

লোকটা একটু হেসে বলল, ভেবো না, তোমাকে একটা গাছের চারা দিয়ে যাচ্ছি। এ গাছটা তোমার চেনা গাছ নয়, বাগানের এক কোণে পুঁতে দিও। দেখবে ফলন কম হবে না।

বলেন কী বাবু? এটা কি যাদু গাছ নাকি?

না হে। অনেক মাথা খাটিয়ে এটা আবিষ্কার করতে হয়েছে, এতে পোকামাকড়ও দূরে থাকবে, মাটিও উর্ব্বর হবে।

তা আপনি কোথায় থাকেন বাবু? কোন গাঁ?

কাছাকাছিই থাকি, তবে অন্য সময়ে। ও তুমি ঠিক বুঝবে না।

ভারু বুঝল না ঠিকই, তবে গাছটা জমির এক কোণে পুঁতে দেওয়ার তিন দিনের মধ্যে সে গাছের মহিমা বুঝতে লাগল। সে এক অলৌকিক কাণ্ড, প্রতি সকালে উঠেই সে দেখতে পায় তার তিন বিঘা জমি ফসলে একেবারে টই টম্বুর হয়ে আছে। সব্জীতে সব্জীতে ছয়লাপ। আর সব্জীর সেই খেঁকুড়ে চেহারাও নেই, ফুলকপির আকার বেড়েছে, বাঁধাকপি, বেগুন, মূলো, পালং সবই যেন একেবারে রসে ভরপুর।

পরের হাটবারে সে বাবুটিকে জিগ্যেস করল, তা বাবু, গাছটার যখন এতই মহিমা তাহলে আপনি আপনার বাগানে লাগান না কেন? তাহলে তো আর আপনাকে সব্জী কিনতে হয় না।

বাবুটি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সে উপায় নেই হে। আমি দুশো বছর পরের পৃথিবীতে থাকি, তখন মাটি মরে গেছে। এই যারা এখন কেমিক্যাল সার দিয়ে চাষ বাস করে তাদের বোকামিতে মাটির উর্ব্বরাশক্তি শেষ হয়ে ফলন আর হয় না। ওই মাটিতে এখন আবার প্রাণ সঞ্চার করতে চাষবাস বন্ধ রেখে নানারকম চিকিৎসা করতে হচ্ছে।

বড় বড় চোখ করে শুনছিল ভারু, তাহলে সে তো ভালো কাজই করছে, মাটিতে কেমিক্যাল সার দেয়নি।

বাবু, ওই গাছের চারা অন্য কাদেরও দেন না কেন?

লোকটা ম্লান হেসে বলল, তুমি ভালো লোক বলেই কথাটা বললে, তবে কি জানো, ওদের কেমিক্যাল দেওয়া মাটিতে এ গাছ কোনও ক্রিয়া করতে পারে না। গাছ মরে যাবে। অন্তত পাঁচ সাত বছর মাটিকে বিশ্রাম দিয়ে তবে ওই গাছ লাগালে কাজ হবে। কিন্তু ততদিন ধৈর্য ধরবে এমন মানুষ কই?

ভারু বলল, তা বটে।

ভদ্রলোক তেমনি তার গাড়িতে উঠে গায়েব হয়ে গেলেন।

তবে ভারুর আর দুঃখ নেই, তার তিন বিঘা জমি থেকে এখন যা আয় হচ্ছে তাতে তার সব দুঃখ ঘুচে গেছে। সব্জী নিয়ে আর বাজার অবধি যেতে হয় না। দুশো বছর পরেকার ভদ্রলোক এখন তার বাড়ি থেকেই সব সব্জী নিয়ে যায়। দরও বাড়িয়ে দিয়েছে তিন গুণ।

দুঃখ শুধু একটাই, তার মতো আর সবাই তেমন সুখে নেই।

গোকুলবাবু

আজকাল রোজই গোকুলবাবু বাজারে যাবার সময় টের পান, একটা লোক তাঁর পিছু নেয়। কেন নেয়, তা বুঝতে পারেন না। পিছন ফিরে তাকালে লোকটা উলটোদিকে মুখ ঘুরিয়ে হাঁটতে থাকে। চেহারা রোগা প্যাংলামতো, পরনে একটা আধময়লা সবুজ চেক লুঙ্গি, গায়ে একখানা ঢলঢলে জামা, ভদ্রলোকের মতো পোশাক নয়। মাথায় একটা গামছা জড়ানো থাকায় মুখের ছিরিখানাও বোঝার উপায় নেই। কারণ গামছার একটা দিক দিয়ে মুখখানা আড়াল করে রাখে। ব্যাপারটা বেশ অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

তবে গোকুলবাবু ভারি নিরীহ সজ্জন লোক, কারও সাতে-পাঁচে থাকেন না, ঝগড়া-বিবাদ করেন না, টপ করে রেগে যান না। নিরীহ বলেই বোধহয় বাড়ির লোকও তাকে বিশেষ মানে-টানে না, তাঁর বউ ভারি খাণ্ডার মানুষ। গোকুলবাবুকে উঠতে-বসতে উস্তম-মুস্তম করে বকাঝকা করেন। তাঁর দুই ছেলে আর এক মেয়েও তাঁকে বিশেষ গ্রাহ্য করে না। এই নিয়ে গোকুলবাবু ভারি দুঃখেই আছেন। রোজ সকালে তিনি ঠাকুরঘরে বসে ভগবানের কাছে অনুযোগ করেন, আমাকে একটু মানুষের মতো মানুষও তো করতে পারতে?

অবশ্য মানুষ হওয়ার বয়স তাঁর আর নেই। ষাট পেরিয়েছেন। জীবনে আর-কোনও পরিবর্তন তিনি আশা করেন না। এ-ভাবেই জীবনটা কেটে গেলেই হয়।

গোকুলবাবুর মাথাজোড়া টাক, কাঁচা-পাকা ভুড়ো গোঁফ, ভারি নাদুস-নুদুস চেহারা। তাঁর চেহারাটাও তেমন দেখনসই নয়, বরং তাঁকে দেখলেই অনেকের নাকি হাসি পায়। পাড়া-পড়শি, চেনা-পরিচিত লোকেরাও তাঁকে কোনও ব্যাপারেই গুরুত্ব দেয় না। রিক্সাওলা, দোকানদার, মাছওলা, বাড়ির কাজের লোক, পোস্ট অফিসের কেরানি, ছেলের বন্ধুরা, পাড়ার ক্লাবের মেম্বার—কেউ-ই তাঁকে আমলও দেয় না, গুরুত্বও না।

এ রকম একজন নগন্য লোককে ওই প্যাংলামতো লোকটা কেন ফলো করছে, সেটাই বুঝতে পারছেন না গোকুলবাবু। আজও বাজারে বেরিয়ে লোকটাকে দেখতে পেলেন। হাত বিশেক পিছনে লোকটা তাঁর পিছু নিয়ে আসছে। লোকটার মতলব বুঝতে পারছেন না তিনি। সাহায্যপ্রার্থী, না পকেটমার, নাকি খুনী, কিছুই বুঝতে পারছেন না। বেশ উদ্বেগ-বোধ করছেন তিনি। উদ্বেগটা হজমও করতে পারছেন না।

তিনি যে বুদ্ধিমান লোক নন, তা তিনি জানেন। মাথা খাটিয়ে যে একটা মতলব বার করবেন, তেমন মাথাই তাঁর নয়। অথচ ঘটনাটার একটা মীমাংসা হওয়াও দরকার।

তিনি ফিরে তাকালেন। লোকটা বেশ থতমত খেয়ে আকাশ দেখতে লাগল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে কয়েক পা হেঁটে গিয়ে ফের আচমকা ফিরে চাইতেই, যেন ভূত দেখে চমকে উঠলেন তিনি। লোকটা এখন তাঁর

গজখানেকের মধ্যেই এসে পড়েছে যে!

গোকুলবাবু বেজায় ভয় খেয়ে হঠাৎ তাড়াতাড়ি একটা ছুট লাগাতে গেলেন। কিন্তু অভ্যাস নেই, ধুতিতে পা জড়িয়ে ধড়াস করে পড়ে গেলেন রাস্তায়। ভাগ্যিস আজ রাস্তায় লোকজন ছিল না।

আশ্চর্যের বিষয়, ওই প্যাংলামতো লোকটাই এসে তাঁকে ধরে তুলল।

গামছাটা মুখের ওপর থেকে সরে যাওয়ায় গোকুলবাবু লোকটার মুখ এবার কাছ থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। মুখখানা কিন্তু খারাপ নয়, বেশ টানা চোখ, সৌন্দর্যও ভালো, এলেবেলে চেহারা নয়।

তিনি বললেন, 'বাপু হে, তুমি কী চাও? রোজ আমার পিছু নাও কেন?'

'আপনার ভালোর জন্যই।'

'তা ভালোটা কি হয়েছে?'

'হয়েছে মশাই, হয়েছে। আপনার ভালো করার জন্য ক'দিন একটু আপনাকে স্টাডি করা দরকার ছিল। সেটা আজ শেষ হয়েছে।'

'তা বাপু, স্টাডি করে কী বুঝলে?

'বুঝতে আরও সময় লাগবে। ডাটাগুলো অ্যানালাইস না করলে বোঝা যাবে না। সে কাজটা ল্যাবরেটরিতে হয়।'

'ও বাবা! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না! তুমি কে?'

'সেন্ট্রাল ডাটাব্যাঙ্কের একজন এক্সটারনাল অপারেটর।'

'এ-সব তো শক্ত শক্ত কথা। সরল করে না বললে বুঝব কী করে?'

'সরল করে বোঝানোর জন্যই আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'কোথায় নিয়ে যাবে বাপু?'

'বেশি দূর নয়, ওই-যে খেলার মাঠটা রয়েছে, ওখানে। আসুন আমার সঙ্গে।'

গোকুলবাবু খুবই অবাক হয়েছেন। তবে এখন তেমন একটা উদ্বেগ বোধ করছেন না। বললেন, 'ফাঁকা মাঠে গিয়ে কী হবে।'

'ওখানেই আমাদের ভ্রাম্যমাণ ল্যাবরেটরি।'

'সে কী? ওখানে তো কোনও বাড়িঘর নেই!'

'আছে বইকী। কাছে গেলেই বুঝতে পারবেন।'

লোকটার পিছু পিছু মাঠের মাঝ-মধ্যিখানে গিয়ে বোকার মতো দাঁড়ালেন গোকুলবাবু। পাগলের পাল্লায় পড়লেন কিনা বুঝতে পারছেন না। কিন্তু তাঁকে একেবারে হতবাক করে দিয়ে শূন্য মাঠের মাঝখানে হঠাৎ যেন বেশ বড় একটা কাচের বাড়ি প্রথমে আবছাভাবে, তারপর স্পষ্ট ফুটে উঠল। চোখের ভুল নয়।

'আসুন—' বলে লোকটা একটা কাচের পাল্লা খুলে তাঁকে ভেতরে নিয়ে গেল। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, সেটা একটা ল্যাবরেটরির মতোই ব্যাপার বটে। চারদিকে অনেক যন্ত্রপাতি, সাদা পোশাক-পরা মুখ-ঢাকা কয়েকজন লোক সেখানে খুব ব্যস্ত হয়ে নানা যন্ত্রপাতির সামনে বসে বা দাঁড়িয়ে কী সব যেন করছে। একটা লোক এসে তাঁর সামনে একটা উত্তল আয়নার মতো কিছু দাঁড় করিয়ে বলল, 'দেখুন তো, আপনাকে কেমন দেখাচ্ছে।'

গোকুলবাবু দেখলেন, আয়নায় তাঁকে খুবই ছোট, কড়ে আঙুলের সাইজের একরত্তি একটা মানুষের মতো দেখাচ্ছে।

সম্বিত ফিরে পেয়ে হঠাৎ তিনি সচেতন হয়ে দেখলেন—বাস্তবেও তাই ঘটেছে। ল্যাবরেটরিটা যেন আকাশের মতো উঁচু আর তেপান্তরের মাঠের মতো, আর লোকজন সব যেন বিশাল বিশাল দৈত্য-দানো। ভয়ে তিনি চিৎকার করে উঠলেন।

একটা লোক দু'আঙুলে—যেমন লোকে নস্যির টিপ করে—তেমনিভাবে তাঁকে তুলে নিয়ে একটা টেস্ট-টিউবে ভরে ফেলল। তারপর তাতে ফেলে দিল খানিকটা তরল জিনিস।

গোকুলবাবু বিস্তর হাত-পা ছুড়লেন, চেঁচামেচিও করলেন, কিন্তু সে-সব ওরা কেউ শুনতেও পেল না, গ্রাহ্যও করল না। তিনি তরল জিনিসটার মধ্যে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। তবে বুঝতে পারছিলেন, তরল জিনিসটা তাঁর উপরে এসে পড়ার পর তাঁর গা জ্বালা-জ্বালা করছে, চোখে ঝাপসা দেখছেন। লোকটা তাঁকে আর-একটা টেস্ট-টিউবের মধ্যে আরও একটা সবুজ রঙের জিনিসের মধ্যে ফেলে দিল। তারপর একটা যন্ত্রের মধ্যে টেস্ট-টিউবটা ঢুকিয়ে, যন্ত্র চালু করে দিল। তিনি টের পেলেন টেস্ট-টিউবটা থরথর করে কাঁপছে আর তরল পদার্থটা হঠাৎ রং পালটে হলুদ হয়ে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে কাঁপুনিটাও বেড়ে ঢেউ তুলে উঠে গেল। ভয়ে, উদ্বেগে, কাঁপুনিতে গোকুলবাবু দিশেহারা হয়ে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

জ্ঞান ফিরে এলে দেখেন, তিনি একটা বেশ নরম গদির উপর শুয়ে আছেন। তাঁর চারপাশে কয়েকজন লোক কৌতূহলের চোখে তাঁকে দেখছে।

'কেমন লাগছে গোকুলবাবু?'

গোকুলবাবুর বেশ ভালোই লাগছিল, শরীরটা হালকা, মাথাটা পরিষ্কার, বুকে ভয় বা উদ্বেগটাও নেই, মাথায় হাত দিয়ে দেখেন টাকের বদলে তাঁর মাথায় বেশ ঘন চুল, শরীরের মেদও ঝরে গেছে। তিনি যেন অন্য মানুষ।

গোকুলবাবু বললেন, 'ভালোই লাগছে। আপনারা কারা?'

'বাইরের লোক। পৃথিবীর বাইরের।'

'বুঝেছি। অ্যালিয়েন নন তো?'

'হ্যাঁ।'

'আমার উপর একটা এক্সপেরিমেন্ট করলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ। আপনাকে আমরা খানিকটা পালটে দিয়েছি। পনেরো বছর বয়স কমানো হয়েছে। শরীরটা ছিপছিপে করা হয়েছে। মগজেও কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে।'

'কিন্তু লোকে কি আমাকে গোকুল বলে চিনতে পারবে?'

'পারবে। তবে এখন থেকে অন্য দৃষ্টিতে দেখবে। আগের মতো তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না। আপনার বয়স মাত্র পনেরো বছর কমানো হয়েছে। আই কিউ বাড়ানো হয়েছে শতকরা ৪৫ ভাগ। সাহস বাড়ানো হয়েছে শতকরা ৩০ ভাগ। ভয় কমানো হয়েছে ৫০ ভাগ। আত্মবিশ্বাস বাড়ানো হয়েছে ৬০ ভাগ আর স্মার্টনেস ২৫ ভাগ। তাতে আপনি আগের গোকুলবাবুই থাকবেন বটে, কিন্তু নবীকৃত।'

'আপনারা কারা? কেন আমার জন্য এতটা করলেন?'

'আমরা বাইরের লোক। আর আপনাকে আমরা গবেষণার গিনিপিগ হিসেবেই বেছে নিয়েছিলাম। এখন আপনি নিজের জীবনযাপন করুন। বিদায়।'

গোকুলবাবু হঠাৎ দেখলেন, তিনি মাঠের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে আছেন, ল্যাবরেটরি হাওয়া হয়ে গেছে।

গোকুলবাবু সদর্পে হেঁটে বাজারে গিয়ে ঢুকলেন। তিনি যে আর আগের সেই ভিতু দুর্বল প্রকৃতির বোকা গোকুলবাবু নেই, সেটা কী-করে যেন বাজারের লোকও টের পেয়ে গেল। খুবই খাতিরটাতির পেতে লাগলেন। চারদিক থেকে সপ্রশংস দৃষ্টি এসে পড়তে লাগল তাঁর উপর। অনেকে যেচে এসে একটু-আধটু তোষামোদও করে গেল।

বাড়িতে ফিরতেই তাঁর খিটখিটে বউ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কী বুঝলেন কে জানে, তাড়াতাড়ি একটা হাতপাখা এনে বাতাস করতে করতে বললেন, 'বড্ড ঘেমে গেছ গো!'

সহজ সরকার

সহজ সরকার একজন গোলমেলে লোক। বুঝলেন তো!

আজ্ঞে, বুঝলাম বললে ভুল বলা হবে। আসলে সহজ সরকার কে সেটাই আমার জানা নেই কিনা।

সেটা জানা আর তেমন শক্ত কি? জানতে চাইলেই জানা যায়।

তারপরেও একটা কথা আছে। সহজ সরকার সম্পর্কে আমাকে জানতে হবেই বা কেন? আমার তো মশাই, এই তেত্রিশ বছর বয়স অবধি সহজ সরকারকে না জেনেই কেটে গেল, তাতে তো কোনো অসুবিধে হচ্ছে না! আমি তো দিব্যি আছি। এমন কী আমি তো আপনাকেও জানিনা বা চিনিনা। এই তো মাত্র মিনিট দশেক আগে জীবনে আপনাকে প্রথম দেখলুম। নিরিবিলিতে বসে একটু স্মৃতিচারণ করব বলে গঙ্গার ধারটায় এসে একটু বসেছি, আপনি ফস করে উদয় হয়ে পাশে এসে বসলেন! তারপরই সহজ সরকারের কথা ফেঁদে বসলেন।

তা অবিশ্যি ঠিক। আমিও আপনাকে চিনিনা। শুধু জানি আপনার নাম হল গে তপন ঘোষ, আপনি বাগবাজারে থাকেন, আপনার বাড়িতে বুড়ো মা আর বাবা আছেন, আপনার বউয়ের নাম উষারানি, আপনার দুটো পাঁচ আর তিন বছরের খোকা আছে, আপনার নিচের তলায় যে ভাড়াটে আছে তার নাম গোপেন মিত্র, ভারী গুন্ডাপ্রকৃতির লোক। আর তার সঙ্গে আপনাদের মামলা চলছে, আর গোপেন মিত্রর জন্যই আপনার মনে শান্তি নেই! কারণ সে প্রায়ই আপনাকে লাশ ফেলে দেওয়ার হুমকিধামকি দেয়। না না, এ ছাড়া আপনার সম্পর্কে আমার আর কিছুই জানা নেই। তাই আমি আপনাকে চিনি বললে খুব ভুল বলা হবে।

আপনি তো সব্বোনেশে লোক মশাই! গোয়েন্দা নন তো? আমি তো আপনাকে জীবনে কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না। অথচ আপনি আমার সম্পর্কে এত কথা জেনে বসে আছেন!

না মশাই, না। আমি মোটেই গোয়েন্দা নই। তবে কিনা চারদিকে কী ঘটছে না ঘটছে, তার দিকে নজর রাখি। আর কেন রাখি জানেন? যা ঘটছে, তা থেকে কী ঘটতে চলেছে তা অনুমান করে আগেভাগেই সাবধান হওয়ার জন্য।

আপনি তো খুব হুঁশিয়ার লোক মশাই! যা দিনকাল পড়েছে তাতে এখন আপনার মতো লোকই দরকার। কিন্তু আপনার কথা শুনে আমার একটু ভয় ভয় করতে লেগেছে। আপনি গোপেন মিত্রর লোক নন তো?

হাসালেন তপনবাবু! গোপেন মিত্রকে আমি কস্মিনকালেও চিনিনা। শুধু এটুকু জানি, সে একজন লম্বা চওড়া চেহারার লোক। মেজাজ যেমন টং তেমনি মারমুখো। পাড়ার গুন্ডা মস্তানরাও তাকে সমঝে চলে। সে

হাওড়ায় একটা নাট বল্টুর কারখানা চালায়। মাসে নাহোক লাখ টাকা কামায়। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে, সে কিছুতেই আপনাদের বাড়ি ছেড়ে উঠে যেতে রাজি নয়। তার বউয়ের নাম নন্দরানি, গোপেনের তিন ছেলে, তাদের বয়স যথাক্রমে দশ, আট এবং চার। তার বাবা রমেশ মিত্র কামারহাটিতে পৈতৃক বাড়িতে বাস করেন। তাঁরও মেলা পয়সা। গোপেনের জীবনের একটা অ্যাম্বিশন হল, আপনাদের হটিয়ে আপনাদের গোটা বাড়িটা দখল করা। না মশাই, এই সামান্য তথ্য শুনে আবার ভেবে বসবেন না যেন যে, আমি গোপেন মিত্রকে চিনি।

আমার মাথা যে ঘুরছে মশাই! আপনি তো ডেনজারাস লোক! এরপরও বলবেন যে আপনি গোপেন মিত্রকে চেনেন না?

শুধু গোপেন মিত্র কেন, তার ভায়রাভাই অ্যাডভোকেট সুখেন পোদ্দার, বড় শালা বড়তলা থানার এস আই গদাধর বোস, ছোটো শালা কাউন্সিলার বেণুধর বোস, শ্বশুর এম এল এ সাত্যকী বোস...কাউকেই আমি চিনি না মশাই! এমনকী তার বন্ধু ম্যাজিস্ট্রেট যোগেন হালদার, আপ্যায়ন রেস্টুরেন্টের মালিক বরেন মল্লিক, ফুটবল প্লেয়ার সুনু ধর, কাউকেই আমি কস্মিনকালেও চিনতাম না। এবার বিশ্বাস হল তো আমার কথা? খামোখা আপনি আমাকে গোয়েন্দা বলে ভয় পাচ্ছিলেন!

আজ্ঞে, ভয়টা যে আমাকে আরও একটু চেপে ধরেছে মশাই! একটু দমসম লাগছে। কী মনে হচ্ছে জানেন? মনে হচ্ছে, আপনাকে দেখতে যতটা সাদামাটা আপনি আসলে ততটা সোজা লোক নন। আপনার ভিতরে একটা প্যাচ আছে। ভয় হচ্ছে আপনি বোধহয় আমাকে কিছু একটা বার্তা দিতেই এসেছেন, যাকে বলে প্রচ্ছন্ন হুমকি।

আরে না মশাই, না। আমাকে দেখতে যেমন সরল সোজা, আমি আদতেও তাই। কোনো প্যাচঘোঁচ আমার মধ্যে পাবেন না। আমার মন মুখ একাকার। লোকে বলে, ওহে, তুমি এ যুগের পক্ষে বড্ড বেমানান। অত সোজা সরল হলে কি চলে! এই তো সেদিন একটা লোক একটা বেশ কাজ করা বাহারি পুরোনো আমলের কাঠের বাক্স নিয়ে আমার বাড়িতে এসে বলল, এই বাক্সতে যা রাখবেন তা চোখের পলকে ডবল বা দুনো হয়ে যাবে। শুনে আমার মোটেই বিশ্বাস হল না। কত ঠগ জোচ্চোর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে! তা পরীক্ষা করার জন্য আমি বাক্সতে একটি টাকা রাখলুম। তারপর লোকটার কথামতো দশ সেকেন্ড চোখ বন্ধ করে রইলুম। তারপর লোকটা বাক্সের ডালা খুলে দেখাল, সত্যিই টাকাটা ডবল হয়ে গেছে। লোভে পড়ে ক্রমে টাকা বাড়াতে লাগলুম। যা রাখি, তাই দেখলুম সত্যিই ডবল হয়ে যাচ্ছে। আর থাকতে না পেরে একেবারে পঞ্চাশ হাজার টাকা রাখলুম। লোকটা বাক্সের ডালা বন্ধ করার পর যেই না চোখ বুজেছি, লোকটা ফস করে কী একটা যেন আমার নাকে স্প্রে করল মশাই! সেই ঘুম ভাঙতে ঘণ্টাখানেক লেগেছিল। ততক্ষণে লোকটা বাক্স আর টাকা সমেত হাওয়া! এরপরও কি আমাকে আপনার প্যাচালো লোক বলে ভাবতে ইচ্ছে করবে?

আপনি অত কাঁচা লোক বলেও ভাবতে ইচ্ছে যাচ্ছেনা, বুঝলেন মশাই! আপনি বোধহয় আমার সঙ্গে ছলনাই করছেন। তবে আপনাকে আগেই জানিয়ে রাখি যে, আমি কিন্তু আসলে একজন বোকাসোকা মানুষ। আপনার মতো ক্ষুরধার মাথাওয়ালা মানুষের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার এলেম আমার নেই।

এই ভুলটাই সবাই করে! নিজেকে বোকা ভাবা যে কত বড় বোকামি, তা আমি হাড়ে হাড়ে জানি। আমি নিজেও তাই কিনা। তা বলে সহজ সরকারের কথাটা আবার ভুলে যাবেন না যেন! মনে রাখবেন সে একজন গোলমেলে লোক।

তা তিনি কে তা যদি একটু বলতেন তবে ভালো হত।

এই তো মুশকিলে ফেললেন! সহজ সরকার কে তা কি আর আমার জানার কথা? আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে সহজ বড় সোজাপাত্তর নয়। যতদূর শুনেছি, তাকে দেখে মনে হবে, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। কিন্তু ঘটনা হল, তিনি ভাজা মাছ না উল্টেও খেয়ে ফেলতে পারেন। অর্থাৎ ভাজা মাছ নিজেই তাঁর সুবিধে করে দিতে উল্টে যায়।

একটু বুঝিয়ে বলবেন কী?

বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা পড়া আছে?

তা আর নেই? বঙ্কিম আমার খুব পছন্দের লিখিয়ে।

সেই যে নবকুমার সোঁদরবনে কাঠ আনতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিল, মনে আছে তো! তা তার দেরি দেখে নৌকোর অন্য সবাই বলাবলি করেছিল, তোমার নবকুমার কি আর আছে? তাহাকে বাঘে খাইয়াছে! তা আমাদের সহজ সরকারও একবার সোঁদরবনে বেড়াতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। তারপর হল কী জানেন? বললে হয়তো বিশ্বাস হবে না, শেষে বিশাল কেঁদো একটা বাঘই তাকে দেখতে পেয়ে ভারি বিনয়ের সঙ্গে পথ দেখিয়ে এনে তার নৌকোর ঘাটে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। তারপর ধরুন, লোকের অসুখবিসুখ হলে ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে ধর্ণা দিয়ে বসে থাকে। আমাদের সহজ সরকারের ঠিক উল্টো। তার অসুখবিসুখ হলে ডাক্তাররাই ভিড় করে এসে তার বৈঠকখানায় জড়ো হয়ে যায়! যদি সহজ সরকার দয়া করে কাউকে ডাকে। উকিল ব্যারিস্টার বলুন, মন্ত্রী বা আমলা বলুন, সহজ সরকারকে কারও কাছে যেতে হয় না, সবাই তার কাছে এসে হেঁ হেঁ করে আর হাত কচলায়। বুঝতে পারছেন তো? তা ভাজা মাছের আর দোষ কী বলুন? তার ঘাড়েও তো আর দুটো মাথা নেই!

এবার মনে হয় একটু একটু বুঝতে পারছি।

পারবেনই তো। নিজেকে আপনি যত বোকা ভাবেন সত্যিই তো আর আপনি তত বোকা নন! কেউ কেউ তো সহজ সরকারকে কল্কি অবতারও বলে থাকে।

বলে নাকি?

তা বলবে না কেন বলুন? সহজ সরকার যে দুহাতে গরীব দুঃখীকে বিলোয়। শীতে কম্বল, বর্ষায় ছাতা, গ্রীষ্মে হাতপাখা, তার অন্নসত্রে রোজ দশ হাজার গরীব খায়।

এত টাকা?

তা টাকার কথা যদি বলেন, তাহলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কও লজ্জা পাবে। লোকে ব্যাঙ্কে, আলমারিতে, সিন্দুকে টাকা রাখে। আর সহজ সরকারকে টাকা রাখতে গোডাউন বানাতে হয়। হাওড়ায় তার সাতখানা টাকার গুদাম বানাতে হয়েছে।

বাপ রে!

হেঃ হেঃ! সবাই একথা শুনে হাঁ হয়ে যায়, আপনার আর দোষ কি!

তা আমার মতো মনিষ্যিকে তার কী দরকার? আমাকে সহজ সরকারকে দিয়ে হুঁশিয়ার করছেন কেন বলুন তো?

আহা! এই সহজ কথাটা বুঝলেন না! যেখানে সমস্যা সেখানেই যে সহজ সরকার! তার নামের পাশেই দেখবেন পর পর পাঁচটা এস থাকে। এস এস এস এস এস।

অতগুলো এস! এর মানে কী?

খুব সোজা। সকল সমস্যার সমাধানে সহজ সরকার। আর তাই

তো আজ আপনার কাছে আসা। গোপেন মিত্রকে নিয়ে আপনি যে মনোকষ্টে আছেন সেটা সহজ সরকারের কানে গেছে। আর তাই আপনার জন্য প্রাণ কেঁদে ওঠায় সে সমাধানও বার করে ফেলেছে। সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। বুঝলেন কিনা।

কীরকম মশাই?

খুব সোজা। গোপেনকে ডেকে সহজ সরকার খুব কড়কে দিয়েছে। বলেছে, একজন নিরীহ ভালোমানুষকে এইভাবে ভয় দেখানো চলবে না। অবিলম্বে যেন সামান্য পাঁচ লাখ টাকার বিনিময়ে সে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। নইলে বিপদে পড়বে। তা গোপেন গুন্ডা এই প্রস্তাব মুখ বুজে মেনে নিয়েছে।